স্বপ্নের ভালবাসা

এক

এলটন'স কাফে-র সামনে একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকটা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ক্যাব থেকে নামল গ্যারি চেস্টার, নুড়ি বিছানো উঠানের উপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে কাফের দিকে এগোল।

কাফের ভিতর বেশ ভিড়, সিগারেটের ধোঁয়া ঘন কুয়াশার মত ঝুলে আছে বাতাসে।

'হাই, চেস্টার!' ওকে একটা টেবিলে বসতে দেখে এগিয়ে এল কাফের মালিক বর্ষীয়ান এলটন। 'আবার দেখা পেয়ে ভাল লাগছে। ড্রাইভাররা আজ কেউ আর এই দুর্যোগ মাথায় করে বেরুবে না বলছে। যদি চাও, তোমাকেও একটা রুম দিতে পারব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু থামার কোনও উপায় নেই আমার,' বলল চেস্টার। অবসাদে আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর চেহারা। চোখের পাতা এত নেমে এসেছে, যেন এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। 'গরম এক কাপ কফি দাও, জলদি! কাল সকালের মধ্যে আমাকে ফ্রেযনো-য় পৌঁছাতে হবে।'

'এ লোক তো আচ্ছা পাগল দেখছি!' বলে চলে গেল বুড়ো এলটন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল কফি নিয়ে। 'তোমরা ট্রাক ড্রাইভাররা সবাই পাগল। একটু ঘুমিয়ে নিলে কী এমন ক্ষতি হয়, অ্যাঁ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অন্তত তিনদিনের আঘুমা।'

'তোমার কি ধারণা, গাধার এই খাটনিটা খেটে আমরা মজা

পাই? জানোই তো, ট্রেনলাইন বসায় ট্রাক ভাড়া কমে গেছে, ওভারটাইম না খাটলে বউ-বাচ্চা নিয়ে টিকে থাকা যায় না।'

'সাবধানে থেকো, বাছা। তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না। ওই ভারী ট্রাক নিয়ে পাহাড়ি পথ পাড়ি দেয়ার অবস্থা নেই তোমার।'

'ধ্যাৎ, থামো তো তুমি!' বিরক্ত হয়ে বলল চেস্টার। 'বলছি না গিয়ে উপায় নেই আমার!' চুমুক দিল কফিতে। 'ট্রাকে পাঁচশ' বাক্স পাকা আঙুর আছে, বুঝলে, ডেলিভারি দেয়ার আগে পচন ধরলে রাস্তার ফকির হয়ে যাব।'

'হুম।' মাথা ঝাঁকাল এলটন। 'বুঝতে পারছি। যাও, মা মেরি তোমার সহায় হবেন।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'বৃষ্টিটা আজ রাতে আর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

'নাহ্।' টেবিলে কফির দাম রাখল চেস্টার।

'পাহাড়ে ওঠার সময় সাবধান কিন্তু, ঘুমিয়ে পোড়ো না,' কয়েনগুলো তুলে নিল কাফেমালিক। 'গুডনাইট, বাছা।'

কাফের চেয়ে ক্যাবটা বেশি ঠাণ্ডা, নিজেকে আগের চেয়ে সজাগ লাগছে চেস্টারের। স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল, উঠে এল রাস্তায়, তারপর চোখদুটো জ্বেলে নিয়ে বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটল।

ডানদিকে, হাইওয়ে থেকে বেশ খানিক দূরে, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের উপরতলার কিছু আলোকিত জানালা দেখতে পাচ্ছে চেস্টার। ভোঁতা নাকটা কোঁচকাল ও। যখনই ওটাকে পাশ কাটায়, প্রতিবার বিষাদে ছেয়ে যায় মন। ওর ধারণা, সম্ভাব্য সবরকম দুর্ঘটনা থেকে যদি ও প্রাণে বেঁচে যায়, ওর শেষ আশ্রয় হবে কোনও পাগলাগারদ। তবে না, ওখানে ভর্তি হতে পারবে না ও, হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম শুধু বড়লোকদের জন্য।

দমকা বাতাসের সঙ্গে হাজার হাজার বর্শার মত ছুটে এসে উইন্ডশিল্ডের গায়ে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। রাস্তাটা খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না, হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরে সাবধানে

এগোচ্ছে চেস্টার।

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল, ঝাপসা উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। হাইওয়ের পাশে দাঁড়ানো একটা মেয়ের গায়ে হেডলাইটের আলো পড়েছে। তুমল বৃষ্টি হচ্ছে, অথচ সেদিকে মেয়েটির যেন কোনও খেয়াল নেই। ট্রাকটাকে আসতে দেখে কোনও সংকেতও দিচ্ছে না।

কিছু না ভেবেই ব্রেক কষল চেস্টার, রাস্তায় ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলল পিছনের চাকা। মেয়েটির পাশে থামাল ট্রাক, ক্যাব থেকে বৃষ্টির মধ্যে মাথা বের করে দিল ও। হেডলাইটের আলো এখন সরাসরি মেয়েটির গায়ে না পড়ায় ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তবে মাথায় যে হ্যাট নেই, চুলগুলো মাথার সঙ্গে লেপ্টে আছে, এটুকু ওর চোখে ধরা পড়ল।

বিমূঢ় বোধ করছে চেস্টার, খানিকটা ঘাবড়েও গেছে।

'লিফট দরকার?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ও, ঝড় বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে যেন শোনা যায়। ক্যাবের দরজাটাও খুলে ফেলল।

মেয়েটি একচুল নড়ছে না। চেস্টার ওর মুখের সাদা আকৃতি দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করছে অদৃশ্য চোখ দুটো ওকে দেখছে। 'বলছি, তোমার কি লিফট দরকার?' বিরক্ত হয়ে গলা আরেকটু চড়াল ও। 'তা ছাড়া, ওখানে কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছ তুমি? এই বৃষ্টির মধ্যে?'

'হ্যাঁ, লিফট দরকার,' বলল মেয়েটি। চেস্টারের কানে শান্ত আর ঠাণ্ডা লাগল ওর কণ্ঠস্বর।

হাত বাড়াল ও, মেয়েটির কবজি ধরল, তারপর টান দিয়ে ক্যাবের ভিতর নিজের পাশে তুলে আনল। 'উফ্, কী বৃষ্টি রে বাবা! এমন ভেজা রাত খুব কমই দেখেছি।' মেয়েটির গায়ের উপর ঝুঁকে ক্যাবের দরজা বন্ধ করল। ড্যাশবোর্ডের ম্লান আলোয় দেখল পুরুষদের ট্রেঞ্চকোট পরে আছে মেয়েটি।

'হ্যাঁ, খুব বিচ্ছিরি বৃষ্টিটা,' বলল ও।

'বিচ্ছিরি বলে বিচ্ছিরি!' বিমূঢ় ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না চেস্টার। ভাবছে, কে ও? রাস্তায় একা কেন দাঁড়িয়ে ছিল? ওর ট্রাক দেখে হাতই বা তোলেনি কেন?

হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করে ট্রাক ছেড়ে দিল চেস্টার। অন্ধকার চিরে আবার ছুটে চলল সেটা।

হঠাৎ দূরে কোথাও ঝন ঝন করে কী যেন বেজে উঠল।

'কী ব্যাপার!' বলল চেস্টার। 'যেন কোথাও অ্যালার্ম বাজছে!'

'ওটা পাগলাগারদের ঘণ্টি,' বলল মেয়েটি। 'ওই অ্যালার্মের মানে হলো ভাগ্যগুণে ওখান থেকে কেউ পালাতে পেরেছে।' মৃদু শব্দে হেসে উঠল ও।

চেস্টারের কানে হাসির আওয়াজটা কেমন যেন ধাতব লাগল, গা শিরশির করে উঠল ওর। অ্যালার্মের করুণ সুর বাতাসে ভেসে এসে এখনও ওদের কানে আঘাত করছে। 'সত্যি কোনও পাগল পালিয়েছে নাকি?' সামনের দিকে ঝুঁকে রাস্তার দু'পাশের ঝোপে চোখ বুলাচ্ছে ও, ভয় পাচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে কোনও উন্মাদ না আবার ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে। 'তা হলে তো আমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছ তুমি। কোথায় যাচ্ছিলে?'

'কোথাও না,' বলল মেয়েটি। সামনের দিকে ঝুঁকে ভেজা উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

ড্যাশবোর্ডের আলো পড়ল ওর লম্বা আর সরু হাতে। চেস্টার লক্ষ করল ওর বাম হাতে শুকনো একটা ক্ষত রয়েছে। 'কোথাও না?' প্রশ্ন করে হেসে উঠল ও। 'ওরে বাপ্‌রে, সে তো বহুত দূর!'

'কোথাও থেকে আসিনি আমি, কোথাও যাচ্ছি না, আমার কোনও পরিচয়ও নেই,' বলল মেয়েটি, আশ্চর্য একটা তিক্ততা রয়েছে কথার সুরে। 'আমি পরিত্যক্ত। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে...সবাই! ব্যস!'

'ভেবো না ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে চেয়েছি,' বলল

চেস্টার। 'আমি ফ্রেযনো পর্যন্ত যাব, কোথায় নামবে জানিয়ো।'

'ঠিক আছে,' নির্লিপ্ত সুরে বলল মেয়েটি।

ট্রাক এখন চড়াই বেয়ে উঠছে, আগুন হয়ে উঠেছে ইঞ্জিন, ক্যাবের ভিতর গরম লাগছে ওদের। ঘুম পাচ্ছে চেস্টারের, চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, অসাড় হয়ে আসছে মাথার ভিতরটা। ওর গাড়ি চালানোর মধ্যে যান্ত্রিক একটা ভাব চলে এসেছে, ভুলে গেছে পাশে বসা মেয়েটির কথা, ট্রাকের ঝাঁকির সঙ্গে কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত দুলছে।

চারদিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে চেস্টার, ক্লান্তি এখন ওকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে। হঠাৎ করেই নিজের উপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকল না ওর, ঘুমিয়ে পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকল, স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল চেস্টার, সিধে করল শিরদাঁড়া, নিচুগলায় অভিশাপ দিল নিজেকে। দেখল রাস্তার কিনারার দিকে ছুটছে ট্রাক—হেডলাইটের আলোয় উঁচু জমিনের উপর অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সবুজ ঘাস।

ঘাস ঢাকা উঁচু একটু জমিন সামনে, তারপরেই গভীর খাদ। দ্রুত হুইল ঘোরাল চেস্টার, কর্কশ আওয়াজ তুলে রাস্তার মাঝখানে ফিরে আসছে সামনের দুই চাকা, পিছনের চাকাগুলো কিনারার উঁচু জমিনের গায়ে চড়ল, তবে চূড়ায় না উঠে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে ফিরে এল নীচে।

ট্রাকের পিছনে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে আঙুর ভরা বাক্স। রশি দিয়ে বাঁধা ওগুলো, তারপুলিনে ঢাকা, তা সত্ত্বেও মারাত্মক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক কাত হলো। এক মুহূর্তের জন্য চেস্টারের মনে হলো, আর রক্ষে নেই, ট্রাকটা এবার উল্টে যাচ্ছে। তবে না, নিজেকে সিধে করে নিল যন্ত্রদানব, আঁকাবাঁকা পথ ধরে আবার ছুটল স্বাভাবিক গতিতে।

'উ-উফ্! দুঃখিত।' হাঁপাচ্ছে চেস্টার, পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে

হৃৎপিণ্ডটা। 'আমার বোধহয় তন্দ্রা চলে এসেছিল।' ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল, ভাবছে দেখতে পাবে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

কিন্তু কীসের ভয়, উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি—সম্পূর্ণ শান্ত, চুপচাপ, যেন কিছুই ঘটেনি।

'তোমার ভয় লাগেনি?' জিজ্ঞেস করল চেস্টার, ওর শান্ত ভাব দেখে অস্বস্তি বোধ করছে। 'আরেকটু হলে তো খাদে পড়ে যেতাম আমরা।'

'আমরা মারা যেতাম, তাই না?' নরম সুরে বলল মেয়েটি, বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে কোনও রকমে শুনতে পেল চেস্টার। 'আপনি বুঝি মরতে খুব ভয় পান?'

ভোঁতা নাকটা কোঁচকাল চেস্টার। 'ট্রাকে বসে এভাবে কথা বললে অমঙ্গল হয়,' বলল চেস্টার। 'রোজই মানুষ ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে।' তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘোরার জন্য স্পিড কমাল ও, সামনের রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। 'একটা কিছু ধরে শক্ত হয়ে বসো—রাস্তাটা ভাঙাচোরা।'

বাঁক ঘোরার পর দু'পাশে এখন ঘন ঝোপ দেখতে পাচ্ছে ওরা। ঝোপের পর একদিকে গভীর পাহাড়ি খাদ, আরেকদিকে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। নড়েচড়ে বসে গিয়ার বদলাল চেস্টার, বুকে হেঁটে এগোচ্ছে যেন ট্রাক, মাত্রা ছাড়া খাটনি হওয়ায় আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে ইঞ্জিন।

'বাতাস ঝামেলা করবে আরও খানিক ওপরে উঠলে,' গলা চড়িয়ে মেয়েটিকে বলল চেস্টার। এরইমধ্যে বাতাসের হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা। ইঞ্জিন আর বাতাসের গর্জনের সঙ্গে আরও একটা একটানা আওয়াজ কানে ঢুকল, সন্দেহ নেই সামনে কোথাও পাথরধস শুরু হয়েছে। 'ফাঁকা উপত্যকা ধরে ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে এই ঝড়। গেল বছর এরকম

একটা ট্রিপে বাতাসের কারণে আটকা পড়েছিলাম আমি, আরেকটু ওপরে।'

মেয়েটি কিছু বলছে না, এমনকী ওর দিকে একবার তাকাচ্ছেও না। চেস্টার ভাবল, কি যেন বলল তখন ও? *কোথাও থেকে আসিনি আমি, কোথাও যাচ্ছি না, আমার কোনও পরিচয়ও নেই। আমি পরিত্যক্ত। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে...সবাই!* মনে হয় কারও উপর অভিমান হয়েছে ওর। কে জানে, বাড়ি থেকে পালিয়েও আসতে পারে।

মাথা নাড়ল চেস্টার, মেয়েটির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

তবে পরবর্তী তীক্ষ্ণ বাঁকটা ঘোরার সময় ট্রাক চালানো ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে গেল অভিজ্ঞ ড্রাইভার। হঠাৎ করে বন্য প্রাণীর হিংস্রতা নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতাস। থর থর করে কেঁপে উঠে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক—ওরা যেন কোনও নিরেট পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে কেবল উইন্ডশিল্ড-ওয়াইপার, পানি সরাতে পারছে না। বৃষ্টির পরদা এত গাঢ়, কিছুই দেখা যাচ্ছে না সামনে।

একটা গালি দিল চেস্টার, দাঁতে দাঁত চেপে এক্সিলারেটর পেডাল দাবাল। ঝাঁকি খেয়ে এগোতে চেষ্টা করল ট্রাক, এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে এগোচ্ছে, কিন্তু বাতাসের সঙ্গে পেরে উঠছে না, এমনি সময়ে রাস্তার উপর আঙুরভর্তি বাক্সগুলো খসে পড়বার আওয়াজ পেল ও; রশির বাঁধন ছিঁড়ে, তারপুলিন একপাশে সরিয়ে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে নিয়েছে ওগুলো।

'হায় যিশু!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল চেস্টার। 'মারা পড়েছি, মা মেরি! সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আমার!'

রিভার্স গিয়ার দিয়ে ট্রাকটাকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ও। ধপাধপ আরও বাক্স খসে পড়ছে রাস্তার উপর। পাহাড় ঘেঁষে পিছু হটছে ওরা, পিছনে ফেলে আসা বাঁকে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

হঠাৎ চেস্টার অনুভব করল খাদের দিকের চাকাগুলো পিছলাচ্ছে। 'খসে পড়ব আমরা,' ভাবল ও, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলো ক্যাবের দরজা খুলে লাফ দেয় নীচে, নিজেকে বাঁচায়, কিন্তু ট্রাক আর কার্গোর মায়া কোনওমতে ত্যাগ করতে পারছে না।

খাদের দিকে পিছলাতে শুরু করেছিল ট্রাক, কী মনে করে নিজে থেকেই সিধে হলো আবার। পিছনের চাকা কিনারা ছাড়িয়ে প্রায় ঝুলে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছে, বাঁকটা ঘুরে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারল ওরা।

ব্রেক কষল চেস্টার, ইঞ্জিন বন্ধ করল, তারপর হ্যান্ডব্রেক টেনে দিয়ে হেলান দিল সিটে—প্রতিটি পেশি কাঁপছে থরথর করে, মুখের ভিতরটা শুকনো খসখসে শিরিশ। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি,' বলল ও, ক্যাপটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল, ঘামে ভেজা কপালটা মুছল আস্তিন দিয়ে। 'সত্যি, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!'

'এখন কি হবে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, আগের মতই ঠাণ্ডা আর শান্ত।

কিছু বলবার ধৈর্য হলো না, তবে কতটা কী ক্ষতি হয়েছে দেখবার জন্য বাতিটা জ্বেলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল চেস্টার। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল রাস্তার উপর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা বাক্স। কিছু ভেঙে গেছে, আলো লাগায় চকচক করছে থেঁতলানো আঙুরের হলদেটে থোকা।

চেস্টার ভাবছে, আর উপায় নেই, এখন তাকে বাধ্য হয়ে সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গত বছরের মতই মাল-সামান খুইয়ে পাহাড়ের উপর আটকা পড়ে গেছে সে।

ঘুমাতে হবে ওকে, তা না হলে মারা যাবে। ক্লান্ত, ভেজা শরীর নিয়ে ক্যাবে ফিরে এল চেস্টার। উপরে ওঠার সময় দেখল, মেয়েটি সরে এসে ওর সিটে বসেছে, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে। এত বেশি পরিশ্রান্ত যে ওকে সরতে বলবারও ইচ্ছে হলো না,

ক্যাবের এক কোণে কাত হয়ে চোখ বুজল।

কাল সকালে কী কী কাজ, কতটুকু লোকসান হয়েছে, এ-সব কিছুই ভাববার সুযোগ হলো না চেস্টারের, চোখ বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল সে গভীর ঘুমে।

দুই

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না চেস্টার। ঘুম ভাঙল জোরালো ঝাঁকি আর তীক্ষ্ণ আওয়াজে। চোখ মেলে দেখল রকেটের বেগে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ট্রাক, অন্ধকারের ভিতর হেডলাইটের আলো যেন জ্বলন্ত বল্লম। ঘুম আর বিহ্বলতায় অসাড়, তারই মধ্যে টের পেল ট্রাকটা ও নয়, চালাচ্ছে মেয়েটি। এই সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজটার তাৎপর্যও বুঝতে পারল—ওটা সাইরেনের শব্দ। হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ ওদের পিছু নিয়েছে।

চেস্টার এখন সম্পূর্ণ সজাগ। 'কী করছ তুমি?' মেয়েটির উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'এক্ষুনি থামো! আমার মাল ফেলে...পিছনে পুলিশ লেগেছে...তুমি শুনতে পাচ্ছ না? থামো বলছি!'

ওর কথা যেন শুনতে পায়নি মেয়েটি, হুইলের পিছনে পাথুরে স্ট্যাচুর মত বসে আছে, পা দিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে গ্যাস পেডালে। স্পিড দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, একসময় মারাত্মকভাবে এদিক-ওদিক কাত হতে শুরু করল ট্রাক। পিছনে, তারপুলিনের ভিতর, পরস্পরের সঙ্গে অনবরত বাড়ি খাচ্ছে বাক্সগুলো।

'তুমি পাগল নাকি?' ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে, এই ভয়ে মেয়েটিকে ধরতে গিয়েও হাত টেনে নিল, সাহস পাচ্ছে

না চেস্টার। 'এখনই পাহাড় থেকে পড়ে যাব আমরা! ট্রাক থামাও, বোকা মেয়ে!'

কিন্তু নিষ্প্রাণ মূর্তির কানে কিছুই ঢুকছে না। অন্ধকার, বৃষ্টি আর প্রচণ্ড বাতাসের ভিতর দিয়ে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলেছে ওরা।

পিছনে ওদেরকে হুমকি দেওয়ার সুরে বেজে চলেছে সাইরেন। ক্যাবের জানালা দিয়ে মাথা বের করে ট্রাকের পিছনদিকে তাকাল চেস্টার। ওর মুখ আর মাথা সঙ্গে সঙ্গে ভিজে গেল। নিঃসঙ্গ একটা হেডলাইট মিটমিট করছে ওদের পিছনে। ধারণা করল, হাই-স্পিড মোটর-সাইকেল নিয়ে কোনও স্টেট পুলিশ ওদের পিছু নিয়েছে।

সিধে হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল ও, চিৎকার করে বলল, 'পেছনে পুলিশ! ট্রাকের সামনে চলে আসছে! ওর কাছ থেকে কিছুতেই পালানো যাবে না! রাস্তার ধারে ট্রাক থামাও!'

হেসে উঠে মেয়েটি বলল, 'দেখতেই পাবেন পালানো যাবে কি যাবে না!' বাতাস আর ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর, ধাতব সুরটা কানে বাজায় আবার শিরশির করে উঠল চেস্টারের গা।

'তুমি আমার সর্বনাশ করছ! দোহাই লাগে, বোকামি কোরো না!' সাহস করে মেয়েটির দিকে খানিক সরে এল চেস্টার। 'যে-কোনও মুহূর্তে একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাবে ট্রাক। এই রাস্তায় কোনও মোটর-সাইকেলকে খসানো অসম্ভব। লক্ষ্মী মেয়ে, প্লিজ, গাড়ি থামাও!' অনুনয় করছে ও।

সামনে হঠাৎ চওড়া হতে শুরু করল রাস্তা। যা হওয়ার এখনই হবে, ভাবল চেস্টার। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে পুলিশ, তারপর মোটর-সাইকেলটা ঘুরিয়ে নেবে ওদের দিকে, সামনের পথ আগলে রেখে ট্রাকটাকে বাধ্য করবে থামতে। তবে, বিপদে পড়বে মেয়েটা। আমার বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও অভিযোগ তুলতে

পারবে না। বদ্ধ পাগল, দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা মেয়ের পাল্লায় পড়েছি!

চেস্টার যা ভেবেছে ঠিক তা-ই হলো। হঠাৎ একটা ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে এল, হেডল্যাম্পের চোখ-ধাঁধানো আলো দেখা গেল, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল স্টেট পুলিশ। লম্বা-চওড়া কাঠামো, পরনে কালো রেইনকোট, হ্যান্ডেলবারের উপর ঝুঁকে রয়েছে মাথাটা।

হাইওয়ে পেট্রল পুলিশের সার্জেন্ট মাত্র কয়েক মিনিট হলো শিফটিং ডিউটি শুরু করেছে, ওর উপর নির্দেশ আছে প্রতিটি যানবাহন সার্চ করে দেখতে হবে।

'এবার তোমাকে থামতেই হবে,' গলার রগ ফুলিয়ে বলল চেস্টার। 'রাস্তার মাঝখানে থাকবে মোটর-সাইকেল, ধীরে ধীরে স্পিড কমে আসবে। তুমি না থামলে ট্রাকের নীচে চাপা পড়বে অফিসার।'

'সেক্ষেত্রে ওকে চাপাই দেব আমি,' শান্ত গলায় বলল মেয়েটি।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল চেস্টার। হঠাৎ উপলব্ধি করল, এই মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব, এ সব পারে! 'সত্যি তুমি পাগল?' চিৎকারটা নিজের কানেই বিকৃত শোনাল। পরমুহূর্তে একটা লাফ দিল ওর হৃৎপিণ্ড। বুঝেছে এবার! হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম! অ্যালার্ম বেল! '*ওই অ্যালার্মের মানে হলো, ভাগ্যগুণে ওখান থেকে কেউ পালাতে পেরেছে।*' গলার আওয়াজে ধাতব সুর!... '*কোথাও থেকে আসিনি আমি, কোথাও যাচ্ছি না, আমার কোনও পরিচয়ও নেই। আমি পরিত্যক্ত। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে...সবাই!*'

'*সেক্ষেত্রে ওকে চাপাই দেব আমি।*'

মেয়েটা পাগল! হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে ও-ই তা হলে পালিয়েছে! পুলিশ ওর পিছু নিয়েছে, আবার ও-ই

পাগলাগারদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ওকে!

ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল চেস্টার, কোটর থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ভয়ে অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ওর। নিজেকে বোঝাল, ভয় পেলে চলবে না। কিছু একটা করতে হবে। তা না হলে পুলিশ অফিসারকে খুন করবে মেয়েটা, তাকে খুন করবে, মারা যাবে নিজেও। পাগল যে, কার কী হবে না হবে গ্রাহ্য করবে না।

চেস্টার ভাবল কোনওভাবে যদি ইগনিশন সুইচের নাগাল পেত ও! তবে ভাবছে সাহস করে কাজটা করা কি উচিত হবে? তাতে যদি আপসেট হয়ে পড়ে পাগলী? ট্রাকটা তখন হয়তো রাস্তা ছেড়ে অন্যকোনও দিকে ছুটবে।

চেস্টারের বুকের ভিতর যেন একটা ঘোড়া ছুটছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো ওর। ক্যাবের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও।

এখন আবার ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। ওদের বাম দিকে সাদা রঙ করা কাঠের বেড়া, শুরু হয়েছে কয়েক মাইল পিছনে, আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশের দীর্ঘ খাদটাকে ঘিরে রেখেছে। মেয়েটি যদি বাম দিকে স্টিয়ারিং ঘোরায়, তা হলে ওরা শেষ। তবে রাস্ত া ছেড়ে ডান দিকে গেলে বাঁচার একটা সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে—ক্ষীণ, তবে গ্যাস ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হওয়ার আগে ট্রাক থেকে হয়তো বেরুতে পারবে ওরা।

হঠাৎ চোখে পড়ল, পুলিশ অফিসার ওদেরকে থামবার সংকেত দিচ্ছে। ওর ক্যারিয়ারের পিছনের সাইন ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে: *পুলিশ। স্টপ!*

'দয়া করে এবার থামো, বাছা!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল চেস্টার। 'তোমাকে নয়, আমাকে ধরতে এসেছে অফিসার। তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই...'

আপনমনে হেসে উঠল মেয়েটি। সামনের দিকে ঝুঁকে ঝাপসা, মিটমিটে সাইনটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। ওর

ভাব দেখে চেস্টারের মনে হলো, ট্রাকটাকে ওটার দিকে তাক করতে চাইছে সে।

চেস্টার দেখল, পুলিশ অফিসার স্পিড কমাচ্ছে। বাইক আর ট্রাকের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। হেডলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো স্থির হয়ে আছে লোকটার পিঠে।

'এ-ও একটা গাধা!' ভাবল চেস্টার। 'মেয়েটা যে পাগল, নিশ্চয়ই ওর জানা আছে। বোঝা উচিত ওকে চাপা দেবে।' জানালা দিয়ে মাথা বের করল ও, তারপর বাইকের উপর ঝুঁকে থাকা আকৃতির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল: 'সরে যান! পাগলীটা আপনার ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দেবে! আরে, আপনি গাধা নাকি? এক পাশে সরে যান! ও আপনাকে চাপা দিতে যাচ্ছে!'

ওর মুখের শব্দ ছিনিয়ে নিল ঝড়ো বাতাস, কোনও কাজে না লেগে কোথায় মিলিয়ে গেল সব। বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না পুলিশ অফিসার। এখনও রাস্তার মাঝখানে অটল, ধীরে ধীরে স্পিড কমিয়ে আনছে। হেডলাইটের আলো আছড়ে পড়ছে পিঠে। ট্রাকের সামনের বাম্পার ওর বাইকের পিছনের চাকা থেকে বিশ ফুট দূরেও নয় এখন।

অকস্মাৎ ঝট করে ঘুরেই ইগনিশন কী লক্ষ্য করে ছোঁ মারল চেস্টার। ক্ষিপ্রবেগে বাধা দিল মেয়েটি, যেন তৈরি হয়েই ছিল—আঙুলগুলো বাঁকিয়ে আঙটার মত করে ওর মুখে খামচি দিল। চামড়া কেটে মাংসে গেঁথে গেল ধারাল নখগুলো। দিক বদলাচ্ছে ট্রাক, ঘাস ঢাকা উঁচু জমিনে উঠে পড়ছে, তারপর আবার রাস্তায় ফিরে এসে সিধে হলো।

মুখে হাত বুলাচ্ছে চেস্টার, হু হু করে জ্বালা করছে ক্ষত, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে। ব্যথা আর আতঙ্কে ওর মুখের চামড়া কুঁচকে রয়েছে।

তারপর, মুখ তুলে তাকাতেই, দেখতে পেল ব্যাপারটা। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকাল পুলিশ অফিসার, চমকে উঠে নিজের বিপদটা টের পেল। এক পলকের জন্য কাদা মাখা, গগলস্ পরা মুখটা দেখতে পেল চেস্টার—খুলে যাচ্ছে মুখ, শব্দহীন চিৎকার বেরুচ্ছে।

খিল খিল করে হেসে উঠে গ্যাস পেডালে আরও জোরে চাপ দিল মেয়েটি। দুটো বাহন যেন শূন্যে ঝুলে আছে; পালাবার চেষ্টা করছে বনের হরিণ, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর হিংস্র বাঘ, নাগালের মধ্যে পেলেই টুঁটি কামড়ে ধরবে। কিন্তু অবশ হয়ে গেছে লোকটার সমস্ত পেশি। আতঙ্কিত অফিসার কিছু করে ওঠার আগেই প্রকাণ্ড যন্ত্রদানব প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট্ট বাইকটার উপর।

এক ধাক্কায় শূন্যে উঠে পড়ল বাইক। বাতাসের গর্জন সত্ত্বেও অফিসারের আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পেল চেস্টার। সংঘর্ষের আওয়াজটাও ভেসে এল। ধাক্কা খেয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়েছে তার বাইক। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো কমলা শিখা।

'লোকটাকে মেরে ফেললে!' চিৎকার করছে চেস্টার। 'তুমি উন্মাদ! তুমি ভয়ঙ্কর একটা পিশাচিনী!'

কিছু চিন্তা না করেই সামনের দিকে ঝুঁকল চেস্টার, ইগনিশনের চাবি লক্ষ্য করে আবার ছোঁ মারল—এবার তৈরি ছিল, মাথাটা নিচু করে নিয়ে বাঁকা আঙুলের হামলা থেকে রক্ষা করল নিজেকে। চাবিটাকে ঘোরাতে পেরেছে ও, হুইলটাও হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ওটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে পাহাড়ের গায়ে ট্রাক তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে চেস্টার, কিন্তু মেয়েটির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, ধস্তাধস্তি করে ওর সঙ্গে পারা যাচ্ছে না। রাস্তার উপর মাতালের মত আচরণ করছে ট্রাক, আর ক্যাবের ভিতর চলছে হুইলের দখল

নিয়ে যুদ্ধ।

দুটো মুখ একেবারে কাছে চলে এল। সবুজ কাঁচের পিছনে এক জোড়া ল্যাম্প যেন মেয়েটির চোখ দুটো। ওকে অভিশাপ দিচ্ছে চেস্টার, চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল। কাত হয়ে পড়ল ট্রাক, মেয়েটির গালের পাশে লেগে পিছলে গেল ঘুসিটা।

এবার হুইলের পিছন থেকে সরে এসে চেস্টারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি, দু'হাত বাড়িয়ে ওর গলাটা টিপে ধরেছে, লম্বা আঙুলগুলো ডেবে যাচ্ছে মাংসের ভিতর।

রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাক। সাদা কাঠের বেড়া ভেঙে ফেলল। হেডলাইটের আলো বন করে ঘুরে গেল অতল গহ্বরের দিকে। কিনারায় পৌঁছে গেল ট্রাক, মাডগার্ডের ভিতর বাড়ি খাচ্ছে নুড়ি পাথর। ভাঙচুরের কর্কশ ধাতব আওয়াজ হলো, শূন্যে এক মুহূর্ত ঝুলে থাকল ট্রাকটা, তারপর খসে পড়ল নীচের উপত্যকায়।

কাকে লিফট দিয়েছিল ও? কে এই অদ্ভুত মেয়ে? কিছুই আর জানা হলো না চেষ্টারের।

তিন

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভয় ভয় লাগছে। চোখ খুলছে না, বোঝার চেষ্টা করছে ও কে, কোথায় রয়েছে, কী কারণে ঘুমটা ভাঙল। দিন কয়েক হলো নতুন এই উপসর্গটা দেখা দিয়েছে—ঘুম ভাঙার পর সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়ে না, বেশ কিছুটা সময় লাগে নিজেকে চিনতে।

ও হ্যাঁ, ওর নাম লিয়ন কারমেন। স্প্যানিশ-আমেরিকান, পদার্থ বিজ্ঞানে পিএইচডি, আমেরিকার ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার

অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির প্রজেক্ট ডিরেক্টর। বয়স ঊনত্রিশ, অবিবাহিত, মা-বাবা বেঁচে নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে; দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকে ওরা—বত্রিশ তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বাইশতলার একটা ফ্ল্যাটে। ওরা মানে, ও আর ওর ছোট বোন।

পুরানো সেই চিনচিনে মাথাব্যথাটা ঘুমাতে যাওয়ার আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে; বরং একটু যেন বেড়েছে। ঘুমটা কি তা হলে সেজন্যই ভাঙল?

কয়েক সেকেন্ড কান পেতে থাকল লিয়ন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। তারপরেও খুঁতখুঁত করছে মন, অন্য কোনও কারণে ঘুম ভাঙেনি তো?

রাত এখন কত হতে পারে? বেডসাইড টেবিলে রাখা হাতঘড়ির নাগাল পাওয়ার জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল লিয়ন। খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। ওর বেডরুমে নয়, পাশের বেডরুমে। খুক করে কাশল ও।

'ভাইয়া, তুমি এখনও জেগে?' অন্ধকারে নরম গলা ভেসে এলো অলিভার, নিজের কামরা থেকে এই ঘরে চলে আসছে।

'হ্যাঁ...'

'সেই মাথাব্যথাটা?'

'হ্যাঁ। তুই ঘুমাসনি?'

জবাব না দিয়ে অলিভা বলল, 'মাথাটা টিপে দেব?'

'না, ব্যথা আরও বেড়ে যাবে,' বলল লিয়ন, অনুভব করল ওর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অলিভা। 'তোরও বুঝি সেই ইনসোমনিয়া?'

'হ্যাঁ, আজ নিয়ে তিন রাত ঘুমাইনি,' ম্লান সুরে বিড়বিড় করল অলিভা। 'খোলা ছাদে চারঘণ্টা হেঁটে ঠাণ্ডায় শরীর বরফ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই ক্লান্ত হতে পারছি না।'

'কেন, লক্ষ্মীটি, ঘুমের ওষুধ খেলেই তো পারতি!'

'না,' বলল অলিভা।

'কালই আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব,' নরম সুরে বলল লিয়ন।

'না।'

'কিন্তু দিনের পর দিন কেন ঘুম আসছে না সেটা জানতে হলে তো...'

'তুমি চাইছ আবার আমি ছাদে হাঁটতে যাই?' হঠাৎ বলল অলিভা। 'তুমি জানো ডাক্তার, হাসপাতাল, চিকিৎসা, ওষুধ, —এগুলো সব আমার চরম শত্রু, আমার প্রতিপক্ষ। ওদের সিস্টেমের একটাই লক্ষ্য, আমাকে রোগী বানানো। অথচ আমি জানি আমার কোনও অসুখ নেই।'

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল লিয়ন। 'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে ঘুমটা যাতে আসে, জানতে হবে কেন আসছে না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বিড়বিড় করে জবাব দিল অলিভা। 'আমার মন খারাপ।'

'কেন মন খারাপ?'

'তা জানি না।'

'কেউ তোকে বকেছে?' জানতে চাইল লিয়ন।

'তুমি ছাড়া আমার আর আছে কে যে বকবে!'

'আমার তো মনে পড়ে না তোকে কখনও বকেছি।'

'একটু যদি বকাঝকা করতে,' ধীরে ধীরে বলল অলিভা, 'হয়তো অন্যরকম হতাম। কিছুটা যে নষ্ট হয়েছি, সে তো তোমার আদর আর লাই পেয়েই।'

'মন খারাপ... আর কী হয়?'

'কেউ আমাকে ডাকে। একা শুধু আমি শুনতে পাই। তার সেই ডাকে আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে করে।'

'তুই চলে গেলে আমার কী হবে?' জানতে চাইল লিয়ন। 'তা ছাড়া, আমাকে ফেলে চলে যেতে তোর খারাপ লাগবে না?'

'তুমি আমার মনটা ভাল করে দাও। তা হলেই আমার ঘুম চলে আসবে। ঘুমাতে পারলে তোমাকে ছেড়ে কোথাও আমার যেতে ইচ্ছে করবে না।'

'মন খারাপ... কাউকে ভালবাসিস?'

'না...হ্যাঁ... আসলে ব্যাখ্যা করাটা খুব কঠিন। সত্যিই ভাল একজনকে বাসি...কতটুকু গভীর তা নিজেরই জানা নেই।'

'আমাকে ওর নামটা বলবি, প্লিজ?'

'না, ভদ্রলোককে আলোচ্য বিষয় করে তোলাটা উচিত হবে না,' মৃদুকণ্ঠে বলল অলিভা। 'বিশেষ করে আমি নিজে যেখানে দ্বিধায় ভুগছি।'

'ভদ্রলোক? কোনও ছেলে নয়?'

'তু-তুমি এত বেশি কৌতূহল দে-দেখাচ্ছ যে আমার কাছে রী-রীতিমত আপত্তিকর...' ক্লান্ত পায়ে নিজের বেডরুমে ফিরে যাচ্ছে অলিভা।

'এই শোন, যাবি না!' হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বলল লিয়ন। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে রিস্টওয়াচ নিয়ে কবজিতে পরছে। ভোর পাঁচটা। সকাল হতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। 'যে খবরটা সব সময় তুই আমাকে দিস, আজ আমি সেটা তোকে দিতে পারি।'

দরজার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল অলিভা। 'বুঝলাম না। কী খবর দিই তোমাকে আমি?'

'তোর মাসুদ ভাই এখন এখানে—আমেরিকায়।'

এক নিমেষে আনন্দে নেচে উঠল অলিভার সমগ্র অস্তিত্ব। অতি কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঠিক কোথায় এখন মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল অলিভা। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছে?' উত্তরটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ও।

রানার নাম শুনলে ওর বোনের মধ্যে কী হয়, বুঝতে পারে না তা নয়, কিন্তু এ যে অসম্ভব একটা ব্যাপার... ধীরে-সুস্থে জবাব দিল লিয়ন, 'তা এখনও আমি জানি না রে।'

আজ আর অফিসে যাওয়া হবে না ওর। কথা ছিল সাগরে নোঙর ফেলা নুমার রিসার্চ শিপ স্টার ওয়ান-এর ল্যাব দেখতে যাবে আজ, সেটাও বাতিল করতে হবে। 'তবে এক কাজ করলে পারি...ওদের অফিসে গিয়ে জেনে নেয়া যায়। তুই কী বলিস?'

হাসি ফুটল অলিভার মুখে। বোনকে নিয়ে আজ বেড়াতে বেরুবে লিয়ন, ওর মনটা যাতে ভাল হয়। মন ভাল থাকলে খুব সহজেই ঘুম চলে আসে।

ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে সকাল ন'টায় বেরিয়ে এসে সারাটা দিন শহরময় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। প্রথমেই অলিভাকে নিয়ে হলিউডে ঢুকল লিয়ন, দু'একটা সিনেমার শুটিং দেখল, লাঞ্চ খেল বিখ্যাত গোল্ডেন ইন রেস্টুরেন্টে।

বেড়াতে বেরিয়ে শুরু থেকেই বাংলাদেশকে নিয়ে গল্প করছে ওরা। এ-বিষয়ে অলিভার আগ্রহই বেশি। খানিক পর প্রসঙ্গটা 'এল' টার্ন নিয়ে মাসুদ রানায় গিয়ে স্থির হলো।

'প্রায় সমবয়েসী বন্ধু তোমরা,' বলল অলিভা। 'তার মানে মাসুদ ভাই আমার চেয়ে অন্তত বারো বছরের বড়।'

'বয়সে আমার চেয়ে দুই-এক বছরের ছোটই হবে রানা, তবে অভিজ্ঞতার দিক থেকে কমকরেও একশো বছর পিছিয়ে আছি আমি ওর থেকে,' বলল লিয়ন।

ওর কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল অলিভা, তারপর বলল, 'নুমার অনেক এক্সপিডিশনে একসঙ্গে ছিলে তোমরা। তোমাদের বন্ধুত্ব পরীক্ষিত, তুমিই বলেছ, পরস্পরের জন্যে করতে পার না এমন কোনও কাজ নেই।'

'তা ঠিক।'

‘তা হলে আজ তুমি আমাকে এমন একটা অভিযানের কথা শোনাও, যেটায় মাসুদ ভাই নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে।’

বিকেলের দিকে অলিভাকে নিয়ে প্রিয় বন্ধুর ইনভেস্টিগেশন ফার্ম রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখায় চলে এল লিয়ন। অফিসের সবাই খুব ভালভাবে চেনে ওদেরকে, পছন্দও করে, বিশেষ করে অলিভাকে। মন ভাল থাকলে যে-কোনও মানুষের মধ্যে ওর শিল্পীসুলভ আনন্দময় উচ্ছ্বাস সংক্রমণে অলিভার কোনও জুড়ি নেই। তবে ওদের কারও জানা নেই যে এখানে যেদিন আসে সেদিনই শুধু ভাল থাকে ওর মনটা, বাকি দিনগুলো নরকযন্ত্রণার মধ্যে কাটে মেয়েটির।

বহুবার বলেছে, তবু ওর প্রশ্নের জবাবে শাখাপ্রধান নাহিদ নিয়াজ ধৈর্য ধরে আবার একবার ব্যাখ্যা করল রানা এজেন্সির এজেন্ট হতে হলে একটা মেয়ের কী ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার।

তারপর কথায় কথায় জানা গেল রানা এখন নিউ ইয়র্কে; তিন-চারদিনের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসে একবার আসতে পারে।

দশ মিনিট পর বিদায় নিয়ে আবার পথে বেরুল ওরা। কান পেতে অপেক্ষা করছে লিয়ন। এখন কী শুনবে জানা আছে ওর।

গাড়িতে চড়ার আগেই ওর কাঁধে হাত রাখল অলিভা, তারপর কানের কাছে ঠোঁট তুলে ফিসফিস করে বলল: ‘ভাইয়া, আমাদের ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটা পার্টি দেবে তুমি। দেবে তো? মাসুদ ভাইকে দাওয়াত দিতে ভুলো না যেন!’

লিয়নের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। রানা স্টেটস-এ এসেছে জানতে পারলে এই আবদারটা করবেই অলিভা, আর ওকে সেটা রক্ষাও করতে হবে। কারণ, পরের কয়েকটা দিন খুব ভাল কাটবে বোনটির।

চার

পাঁচ মাস পর। লস অ্যাঞ্জেলেস।

আজকের পার্টিটা এইমাত্র ভাঙল। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মাত্র কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছিল লিয়ন। তারা চলে গেছে, শুধু রানা যেতে পারেনি এখনও। জোর-জবরদস্তি করে ওকে ধরে রেখেছে অলিভা।

লিভিং রুমের একপ্রান্তে, খোলা জানালার সামনে একা দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে লিয়ন। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা।

রানা জানে, শান্ত ও বিষণ্ন প্রকৃতির মানুষ লিয়ন, তবে এ-ও জানে, শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে রাখাটা ওর স্বভাব নয়। নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলে কেউ আছে কি না জিজ্ঞেস করলে, সন্দেহ নেই, নুমার লোকজন ওর নামটাই প্রথমে উচ্চারণ করবে। চেনা হোক বা অচেনা, যে-কোনও মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা নেশা আছে ওর মধ্যে, কারও কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে বলতে হয় না, সবার আগে এগিয়ে যাবে লিয়ন।

কী কারণে বলা মুশকিল, নুমার অনারারি স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানাকে খুব পছন্দ করে লিয়ন। বেশ কয়েক বছর আগেই সেটা প্রকাশ পেয়েছে।

সে-সময় ডিটেকশন সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছিল লিয়নের মধ্যে। সময় পেলে রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখায় আসা-যাওয়া করত, শখের বশে জটিল কিছু কেস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। বেশ কয়েকটা কেসের সমাধানও করে দিয়েছে

লিয়ন।

রানার হিসাবে, ওর সাকসেস রেট অ্যাভারেজের চেয়ে অনেক উপরে। কিন্তু এই কাজের বিনিময়ে কোনও সম্মানী নিতে রাজি করানো যায়নি ওকে। বলেছে, তোমার অফিস মানে আমারও অফিস, এখানে দেনা-পাওনার কোনও ব্যাপার নেই।

তারপর দেখা গেছে, সাগরতলে বা মেরু অঞ্চলে যে-কোনও এক্সপিডিশনে পদার্থবিদ দরকার হলে নিজের নামটা তালিকায় রাখতে বলেছে লিয়ন—তার আগে অবশ্যই জেনে নিয়েছে সেখানে মাসুদ রানা থাকছে কি না।

প্রথমদিকে ওদের মধ্যে কথাবার্তা বা ভাব বিনিময় খুব কমই হয়েছে। তবে আচরণ আর ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে, রানা সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল আছে ওর, রানার সঙ্গ পছন্দ করে, কোনও সাহায্যে লাগতে পারলে খুশি হয়। এ-সব দেখে রানাও খুশিমনে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তারপর অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে ওরা, সেজন্য প্রাণের উপর ঝুঁকি নিতে হলে নির্দ্বিধায় তা-ও নিয়েছে, ধীরে ধীরে আরও গাঢ় আর অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে ওদের বন্ধুত্ব।

বন্ধু বিষণ্ন আর চুপচাপ, ব্যাপারটা লক্ষ করে সোফা ছাড়ল রানা, ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'কী রে, কিছু হয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল। 'এমন মনমরা হয়ে আছিস যে?'

'না, কী আর হবে... আগের সেই মাথাব্যথাটা... বড় ভোগাচ্ছে রে!' একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল লিয়ন।

সঙ্গে সঙ্গে নয়, একটু পর জানতে চাইল রানা, 'তুই তা হলে সেই আগের পণেই অটল থাকবি, ডাক্তার দেখাবি না?'

'তুই তো জানিস, ডাক্তার দেখাতে আমার ভয় করে,' বলল লিয়ন। 'তবে কী জানিস, আমার বাবারও এরকম মাথাব্যথা ছিল। কতদিন বেঁচে ছিল ধারণা কর দেখি।'

'ধারণা করতে হবে কেন, আমি জানি, অলিভা আমাকে বলেছে—পঁচাশি বছর বেঁচে ছিলেন তিনি।'

'কাজেই চিন্তা করিস না, সামান্য এই মাথাব্যথা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না,' বলে হেসে উঠল লিয়ন, রানার কানে পরিষ্কার ধরা পড়ল বেদনার একটা অস্পষ্ট সুর রয়েছে হাসিটার মধ্যে। এবার ওর পালা দীর্ঘশ্বাস গোপন করবার।

এই সময় দুই বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে দমকা বাতাসের মত ওদের দিকে ছুটে এল অলিভা। ফ্ল্যাটে রানার পা পড়তে যা দেরি, সেই থেকে হাসি আর আনন্দে বিভোর হয়ে আছে মেয়েটা। 'মাসুদ ভাই!' হাত ধরে টান দিল, একরকম টেনে-হিঁচড়েই জানালা আর লিয়নের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল রানাকে।

রানাকে নিয়ে মুখোমুখি সোফায় বসল অলিভা, বলল, 'রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি, মাসুদ ভাই। বলছি, শুনে বলো ঠিক হলো কি না।'

'শুনি।'

শুরু করল অলিভা: 'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে—কে তুমি? মেলেনি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল। দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল, পশ্চিম সাগর তীরে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি? পেল না উত্তর।'

'বাহ, একদম নিখুঁত উচ্চারণ!' রানার প্রশংসায় অতিরঞ্জন নেই এতটুকু।

খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল লিয়ন। হাসি-আনন্দ-গানে নিজে তো মেতে আছেই, সেই সঙ্গে রানাকেও মাতিয়ে রেখেছে অলিভা। কে বলবে ওর বিষণ্ন বিবর্ণ বোনটার মন বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনই খারাপ থাকে!

অলিভার শৈশব থেকে দেখছে, পৃথিবীর কোনও কিছুই ওকে খুশি করতে পারে না। কোনওদিন পারবে বলে আশাও করেনি

লিয়ন। তবে বছর দুয়েক হলো ওকে বিস্মিত করে দিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটছে।

ওদের বাড়িতে রানা এলেই সীমাহীন হাসি-আনন্দে পাহাড়ি ঝরনার মত উচ্ছল ও আত্মহারা হয়ে ওঠে অলিভা। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী আর পরিতৃপ্ত ষোড়শী বলে মনে হয় তখন ওকে। ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে জলতরঙ্গের মত স্বর্গীয় সুর ধ্বনিত হয়। সুগন্ধী গোলাপকুঁড়ির সমষ্টি হয়ে ওঠে ওর কোমল কাঠামো, সব যেন একযোগে বিকশিত হতে শুরু করে, ওর আঁকা ছবিগুলো হয়ে ওঠে মাস্টারপিস।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার ওদের দিকে তাকাল লিয়ন। সোফায় হেলান দিয়ে রয়েছে রানা, সেটার হাতলে বসে ওর দিকে ঝুঁকে কী যেন একটা আবদার জানাচ্ছে অলিভা। কথা শেষ করে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকল রানার মুখের দিকে।

'তুমি এখন ছেলেমানুষ, অলিভা,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা। আর্ট কলেজে সবে থার্ড ইয়ারে উঠেছে অলিভা। 'বড় হও, লেখাপড়া শেষ করো, তারপরেও যদি তোমার আগ্রহ থাকে, নিয়ে নেব তোমাকে রানা এজেন্সিতে; দেখা যাবে, কত রহস্য উদ্ঘাটন করতে পার তুমি।'

'আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি, আগামী মাসে আঠারোয় পড়ব,' প্রবলবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদের সুরে বলল অলিভা, 'কাজেই আমাকে ছেলেমানুষ বলার মানে হলো—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তবে না, আজ এত সহজে পার পাবে না—তোমার এজেন্সিতে একটা চাকরি এবার আমাকে দিতেই হবে।'

আরও ক'মিনিট পর উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ করল লিয়ন, অলিভার আবদার ধীরে ধীরে জেদে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওর ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, কেমন যেন একটু খেপাটে হয়ে উঠছে চেহারা। একপা-দু'পা করে ওদের দিকে এগোল ও, রানার মুখোমুখি একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল, অপেক্ষা করছে

কখন রানার সঙ্গে চোখাচোখি হবে।

রানাও বুঝতে পারছে, ক্রমেই সিরিয়াস হয়ে উঠছে অলিভা। অগত্যা বাধ্য হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। তার আগে জানা দরকার লিয়নের এতে অনুমতি আছে কি না। কী রে, তুই চাস অলিভা আমার এজেন্সিতে চাকরি করুক?'

'হ্যাঁ, মন্দ কী,' সঙ্গে সঙ্গে জানাল লিয়ন। 'পার্ট-টাইম একটা জব তো ও করতেই পারে।'

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর প্রতিবাদের সুরে শুরু করল, 'কী বলছিস, লিয়ন, ওর লেখাপড়া তো তা হলে গোল্লায়...'

বন্ধুর উদ্দেশে একটা চোখ টিপল লিয়ন।

'আচ্ছাহ, বেশ, তুই যখন বলছিস,' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রানা, 'ঠিক আছে তা হলে...'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাসুদ ভাই, থ্যাঙ্ক ইউ!' লাফ দিয়ে সোফার হাতল ছাড়ল অলিভা, বন করে ঘুরে ছুটে গেল ভাইয়ের দিকে। ঝুঁকে আলিঙ্গন করল ওকে, তারপর নাচের ছন্দে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল লিভিং রুম থেকে।

একটু পর ওর বেডরুমের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল অলিভার মিষ্টি গলার অস্পষ্ট গান।

'হঠাৎ চাকরির আবদার... কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা, কিছুই বুঝতে পারছে না ও।

'প্রেম,' বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল লিয়ন।

প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়লেও, পরমুহূর্তে রেগে গেল রানা। 'এই শালা, এটা কি ঠাট্টা করার মত কোনও বিষয়?'

নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে ধীরে ধীরে সোফা ছাড়ল লিয়ন। এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে বলল, 'আয়, তোকে একটা জিনিস দেখাই!'

রানাকে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল লিয়ন। কয়েক পা হেঁটে

একটা কামরার সামনে থামল। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলছে, ঘাড় ফিরিয়ে চট করে একবার দেখে নিল অলিভার কামরার দিকটা। তারপর দরজার কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রানা জানে, এটা অলিভার স্টুডিয়ো—দিন রাত পাগলের মত ছবি আঁকে ও এখানে। লিয়নের পিছু নিয়ে ঢুকল রানাও।

ঘরের আলো জ্বেলে দরজায় তালা লাগাল লিয়ন। কিছুই বলতে হলো না, যা দেখবার রানা নিজেই দেখতে পাচ্ছে। কামরার ভিতর যেখানেই ওর চোখ পড়ছে, সব দেয়ালে অসংখ্য ক্যানভাস। প্রতিটি ক্যানভাসে তেলরঙে আঁকা শুধু রানা আর রানা। শিল্পী অলিভা।

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ডায়েরি বের করে প্রথম পাতা উল্টে রানার হাতে ধরিয়ে দিল লিয়ন। কারও ডায়েরি তার অজান্তে পড়া অত্যন্ত অনৈতিক কাজ, তবু বন্ধুর মাত্রাছাড়া আগ্রহ দেখে খোলা পাতায় চোখ বুলাল রানা। অলিভা লিখেছে: 'মাসুদ ভাই আমার প্রথম ও শেষ প্রেম। মাসুদ ভাইকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমি ওকে ভালবাসি।' ভুরু কোঁচকাল রানা।

আরেক জায়গায় লিখেছে: 'স্বপ্নের মধ্যে আমি মাসুদ ভাইয়ের ডাক শুনতে পাই। ওর সেই ডাকে আমি সাড়া দিই। কিন্তু বাস্তব জীবনে ওর ডাক পাবার অপেক্ষায় বসে থাকাটা খুব বোকামি হবে। এখানে আমিই ওকে ডাকব, বাধ্য করব সাড়া দিতে। যেমন করে হোক, ওকে আমার পেতেই হবে... পেতেই হবে।'

হতচকিত বন্ধুর হাত ধরে টান দিল লিয়ন। 'আয়, সব কথা বলছি তোকে।' রানাকে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল, ডায়েরিটা আগের জায়গাতে রেখে এসেছে।

হুইস্কির আধ খালি একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে মুখোমুখি সোফায় বসল ওরা।

দশ মিনিট পর শুরু করল লিয়ন—

ছোটবেলা থেকে অলিভার মাথায় খানিকটা প্রবলেম আছে,

তোকে বলেছি। তুইও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিস, মানসিক দিক থেকে ও পুরোপুরি সুস্থ নয়। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে রোগটা। ডাক্তাররা বলছেন, যা করতে চায় তা-ই করতে দিতে হবে, তা না হলে রোগটা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। ভাল চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা একান্ত দরকার, কিন্তু কোনওভাবেই ওকে রাজি করানো যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু নয়, স্রেফ সাময়িক একটা মানসিক অসুস্থতা, এটা উপলব্ধি করে হালকা বোধ করল রানা। সেই মুহূর্তেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল বন্ধুকে: বেশ তো, অলিভা যা চাইছে তাই হবে—আমাদের লস অ্যাঞ্জেলেস শাখায় কাল থেকে বসুক ও। কখন কতক্ষণ বসতে হবে, অ্যাপ্রেনটিস হিসাবে কত বেতন পাবে ইত্যাদি সব জানিয়ে দেবে নাহিদ নিয়াজ।

হাত বাড়িয়ে বন্ধুর কাঁধটা ধরে মৃদু চাপ দিল লিয়ন। 'বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম, রে। অসংখ্য ধন্যবাদ, তুই আমাকে বাঁচালি।'

'আরে, ব্যাটা, এর মধ্যে ধন্যবাদ দেয়ার কী পেলি?' বলল রানা। 'অলিভা আমারও তো বোন—ওর জন্যে এটুকু যদি করতে না পারি... কী যে বলিস না!'

পাঁচ

রানা এজেন্সিতে যোগ দিয়েছে দুই হপ্তাও হয়নি, অলিভার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে। মাত্র দু'দিনের মধ্যে এজেন্সির কাজের ধারা বুঝে নিল ও। জটিল যে-কোন সমস্যা চট করে সমাধান করে দিতে পারে, লাইন অভ অ্যাকশন স্থির করতে সময় নেয় মাত্র কয়েক মিনিট। ফলে অচিরেই শাখার সবাই ওর ভক্ত

হয়ে পড়ল। খবরটা অন্যান্য ব্রাঞ্চেও পৌঁছে গেল দ্রুত।

ক্যালিফোর্নিয়া বিরাট রাজ্য, এই রাজ্যে বড় বড় শহরও কম নয়, অনেক শহরেই রানা এজেন্সির একটা করে শাখা আছে। ডাক পেলেই আশপাশের এরকম শাখায় আসা-যাওয়া শুরু করল অলিভা। দূরের ব্রাঞ্চ থেকেও প্রায়ই ওর সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। আর সেটার সুযোগও নিচ্ছে অলিভা। পড়াশোনা গোল্লায় গেল।

ধীরে ধীরে টের পেতে শুরু করল রানা, ওর ঘাড়ে কী এসে চেপেছে। মাত্র চার মাসেই অলিভার পাগলামি অস্থির করে তুলল ওকে।

রানা আমেরিকায় এলে হয়, কোথায় আছে জেনে নিয়ে ঠিক সেখানে হাজির হয়ে যাবে অলিভা। হয়তো আবদার করে বলবে, দামি কোনও রেস্তোরাঁর টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছে, ওর সঙ্গে ডিনার খেতেই হবে। কিংবা আজ ওর জন্মদিন, ওকে সঙ্গে নিয়ে কনসার্ট শুনতে যেতে হবে। রানার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অজুহাতের অভাব কখনওই হয় না ওর। এবং সরল নিরীহ ভঙ্গিতে এমন আবদার ধরে, রানা না পারে রাগ করতে, না পারে প্রত্যাখ্যান করতে।

নিজেকে বোঝায় ও, ওর নিজের একটা ছোট বোন থাকলে সে-ও তো এরকম আবদার করতে পারত, তাই না? তারপর নিজেকে তিরস্কার করেছে—বোন থাকলে আবার কী, অলিভাই তো সে-ই বোন আমার।

তবে শান্তভাবে তাকে বুঝিয়েছে রানা—নানান ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় ওকে, সে-সব খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যে-কোনও সময় তাদের টার্গেট হয়ে যেতে পারে অলিভা, সেটা ওদের দুজনের জন্যই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ওসব কথায় কোনও কাজ হয়নি। চুপচাপ শোনে, কিন্তু মানে না।

এরপর অভিনয় শুরু করল রানা, এমন ভাব দেখাল অলিভার আচরণে ও যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাতেও কাজ না হওয়ায়

এমনকী কঠিন ভাষায় ধমক দিয়ে বারণ করেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে অলিভা যেন ওর সঙ্গে দেখা করতে না আসে, যদিও মেয়েটির প্রতি এত বেশি স্নেহ এসে গেছে যে পর পর কয়েকদিন দেখা না হলে নিজেরই খারাপ লাগে ওর।

এবার কিছুটা কাজ হলো। সরাসরি রানার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ হলো অলিভার। তার বদলে শুরু হলো চুপিসারে অনুসরণ। যেখানেই যায় রানা, পিছু নিয়ে সেখানেই ওর যাওয়া চাই।

রানার চোখে সবই ধরা পড়ে। একদিকে প্রশ্রয়ের হাসি, আরেকদিকে পাগলী মেয়েটার নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কা। ওকে ডেকে আবার বুঝিয়েছে ও, কাজটা ভাল করছে না অলিভা—ওর শত্রু ও মিত্র, দু'পক্ষই তাকে টার্গেট করতে পারে।

বোঝালে বোঝে অলিভা; তবে রানার সঙ্গ পাওয়ার জন্য দিন কয়েক পর নতুন কৌশল অবলম্বন করে। সত্যি বলতে কি, প্রায় সময় ব্যাপারটা উপভোগই করে রানা। একটা সময় তো কেটেই যাবে এই পাগলামি।

কিন্তু এরপর পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। কোনও রকম রাখ-ঢাক নয়, একদিন ওর হোটেল স্যুইটে ঢুকে পরিষ্কার ভাষায় রানাকে সরাসরি বলল অলিভা: 'তোমাকে আমি ভালবাসি। স্বীকার করো, তুমিও আমাকে ভালবাসো।'

'কানটা টেনে ছিঁড়ে দেব, বুঝলে?' ধমকে উঠে চোখ রাঙাল রানা। 'তুমি দেখছি সত্যি সত্যি বখে গেছ, ফাজিল মেয়ে!'

'আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই, মাসুদ ভাই,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল অলিভা। 'তোমাকে যে ভালবেসেছি, তার একটা চিহ্ন থাকা দরকার। ভালবাসার মধ্যে কী এমন অন্যায় দেখলে যে কান টেনে ছিঁড়তে হবে?'

অলিভার দুঃসাহস দেখে আর ভাষা শুনে এক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি না...'

মাথা নাড়ল অলিভা, তারপর সবজান্তার ভঙ্গিতে হেসে উঠে বলল, 'বাসো, আমি জানি। তুমি আমাকে ভালবাস জেনেই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। তুমি রোজ স্বপ্নে আমাকে ডাকো। লিয়ন ভাই কী মনে করবে ভেবে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছ তুমি।'

রানা বুঝল, এই মেয়ের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এ-ও উপলব্ধি করল যে অলিভার মানসিক রোগটা কমা তো দূরের কথা, দিনে দিনে আরও বাড়ছে। 'এ-সব তোমার ভুল ধারণা,' শুরু করল ও, কিন্তু অকস্মাৎ অলিভার চেহারা বদলে যাচ্ছে দেখে থেমে গেল। এরকম আগেও কয়েকবার হতে দেখেছে ও।

হঠাৎ করেই লাল হয়ে উঠেছে অলিভার চোখ দুটো, দৃষ্টিতে রোমহর্ষক কী যেন রয়েছে। গালের একপাশে থরথর করে কাঁপছে পেশিগুলো, যেন ওগুলোর উপর ওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। 'এ-সব আমার ভুল ধারণা, না?' ফিসফিস করে বলল ও। 'তুমি আমাকে ভালবাস না, না?' হাঁপাতে শুরু করেছে। 'আমি আত্মহত্যা করলে তখন বাসবে?'

সাবধান হয়ে গেল রানা, নরম করল গলা। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করার জন্যে কটা দিন সময় দাও আমাকে,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও। 'চলো, আজ আমরা ব্যালে দেখতে যাই, তারপর ভাল কোনও রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়া যাবে, কি বলো? তুমি রাজি, প্লিজ?'

বেশ খানিক সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল অলিভা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'রাজি।'

রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে ও নিজে কথা বলবে, জিজ্ঞেস করবে এরকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত ওর।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' লক্ষ্মী মেয়ের মত ওর প্রস্তাবটা মেনে নিল অলিভা। 'কটা দিন কেন, আমি তোমার জন্যে জনম-জনম অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

এর দু'দিন পরেই হঠাৎ জরুরি একটা কাজে দেশে ফিরতে হলো রানাকে। কাজের মধ্যে থাকলেও, এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে নিয়মিত রিপোর্ট পায় কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে পাগলী বোনটা। দিনের বড় একটা অংশ কাটে ওকে নিয়ে কী করা যায় তা-ই ভেবে।

রানা যখন আমেরিকায় থাকে না, ওর গন্ধ শুঁকে বেড়ায় অলিভা। রানা এজেন্সির শাখা আছে এমন সব শহরে চলে যায় ও, অফিসে ঢুকে শাখাপ্রধানকে বলে: 'আমাকে তো চেনেনই, আমি অলিভা, মাসুদ রানার ফিয়াঁসে। প্লিজ, রানার চেম্বারটা খুলে দিন; ওখানে বসে দরকারী কয়েকটা কাজ সারব আমি।'

চেম্বারে ঢোকার পর রানাকে ফোন করে অলিভা। হঠাৎ কোনওদিন হয়তো পেয়েও যায় ওকে। 'মাসুদ ভাই, তোমার চেম্বার থেকে বলছি। তুমি এখানে নেই, কিন্তু এ-ঘরের বাতাসে তোমার গন্ধ ভেসে আছে...'

'তুমি ভাল আছ, লক্ষ্মী বোন আমার?'

ওর সম্বোধন শুনে ধমক দিয়েছে অলিভা, 'অ্যাই, কে তোমার বোন, অ্যাঁ? সব বুঝি আমি, এ-সব তোমার এড়িয়ে যাবার কৌশল। কিন্তু সে সুযোগ তুমি পাচ্ছ না...'

এবারও ফোন করল অলিভা, তবে কোনও শাখা অফিস থেকে নয়, এমনকী আমেরিকা থেকেও নয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, রানার পিছু নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে মেয়েটা। সোনার গাঁ হোটেলে উঠেছে, রাত দুপুরে রানার ফ্ল্যাটের নম্বরে ফোন করে বলছে: 'আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, রানা। কোনও দূরত্ব বা বাধা আমি গ্রাহ্য করি না—দেখো, কেমন চলে এসেছি।'

'চলে এসেছ... তুমি কোথায়?' আকাশ থেকে পড়তে যাচ্ছে রানা।

'কটা দিন সময় চেয়েছিলে, মনে আছে?' বলল অলিভা।

'তারপর দুই হপ্তা পার হয়ে গেছে। তোমার উত্তরটা জানতে এসেছি। আমি ঢাকায়, এইমাত্র সোনার গাঁয়ে উঠেছি।'

'ঠিক আছে,' নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল রানা। 'তোমার স্যুইট নম্বর বলো, আমি আসছি।' নামকরা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট্রের সঙ্গে আলাপ করেছে ও, সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর পরামর্শ অনুসারেই এগোবে।

রাত একটা। নক করতে স্যুইটের দরজা খুলে দিল অলিভা।

ভিতরে ঢুকল রানা, দরজাটা বন্ধ করছে, আবেগের আতিশয্যে ওর গলা ধরে ঝুলে পড়বার চেষ্টা করল অলিভা।

'ছাড়ো, অলিভা,' শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। হাসি নেই মুখে। 'এটা ছেলেমানুষি করার সময় নয়, আমরা এখন অত্যন্ত সিরিয়াস একটা ব্যাপারে আলোচনা করব।'

'গুলি মারো সিরিয়াস আলোচনা,' অকারণে হেসে উঠে বলল অলিভা। 'আমি পষ্টাপষ্টি জানতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাসো কি না।'

'আগে শান্ত হয়ে বসো ওখানে।' লিভিংরুমে ঢুকে অলিভাকে একটা সোফা দেখাল রানা, ওটার মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল নিজে। অলিভা বসবার পর জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন বলছিলে?'

'আমি জানতে চাই তুমি আমাকে ভালবাসো কি না।'

'বাসি,' বলল রানা। 'অনেক চিন্তা করে দেখলাম, তোমার কথাই সত্যি। আমিও তোমাকে ভালবাসি।'

'ওহ্ গড, মাসুদ ভাই!' আনন্দে আর অবিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভা। 'সত্যি? সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো?'

'সত্যি, অলিভা, সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি,' ভরাট গলায় আশ্বস্ত করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আর তুমি?

তুমিও সত্যি আমাকে ভালবাসো?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট!' জোর দিয়ে বলল অলিভা।

'বেশ। এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে, আমাদের ভালবাসার যৌক্তিক পরিণতিটা কী হওয়া উচিত। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে পরস্পরকে ভালবাসে বিয়ে করে সুখী হবার জন্যে। বুঝতে পারছ আমি কি বলছি, অলিভা?'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, অনেক আগে থেকেই জানি আমি।' মাথা ঝাঁকাল অলিভা। 'আমরাও বিয়ে করে সুখী হব।'

'হ্যাঁ। আর সুখী হবার জন্যে কী দরকার তা-ও নিশ্চয়ই জানো তুমি? স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই সুস্থ হতে হয়। তা না হলে দাম্পত্যজীবন সুখের হতে পারে না। ঠিক কি না?'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অলিভা।

'এবার একটা সত্যি কথা বলো, তুমি কি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করো?' জানতে চাইল রানা।

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকবার পর মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল অলিভা—দু'চোখে ভয়। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও, তারপর বলল, 'মাসুদ ভাই, প্রায়ই ভাবি এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচন করব, কিন্তু তারপর ভুলে যাই। আচ্ছা, আমার যে মাঝে-মধ্যে নিজেকে পাগল মনে হয়, এটা কি খুব খারাপ লক্ষণ? এই চিন্তাটা কি আমাকে এক সময় বদ্ধ উন্মাদ করে দিতে পারে?'

'দূর বোকা!' হেসে উড়িয়ে দিল রানা অলিভার আশঙ্কা। 'তোমার সমস্যা হলো, তুমি অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ, সেজন্যেই মাঝে মধ্যে উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা ঢোকে তোমার মাথায়।'

'ও, তা হলে এটা কোনও সমস্যা নয়! কিন্তু আমার তা হলে নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হয় কেন?'

'সমস্যা নয় বলা ঠিক হবে না। তুমি অসুস্থ ঠিকই, তবে সেটা তেমন গুরুতর কিছু নয়। লিয়নের মত আমিও ডাক্তারের সঙ্গে

কথা বলেছি, তাঁরা বলছেন দিনকয়েক কোনও একটা স্যানাটোরিয়ামে থেকে চিকিৎসা নিলে তোমার অসুখটা চিরকালের জন্যে ভাল হয়ে যাবে—তখন আমাদের বিয়েতে আর কোনও বাধা থাকবে না। অবশ্য তুমি যা বলবে তা-ই হবে...'

'তা হলে আর দেরি কোরো না,' তাগাদা দেওয়ার সুরে বলল অলিভা। 'যত তাড়াতাড়ি পার সেরে ফেলো কাজটা।'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না। 'কোন্ কাজটা?'

'কোনও স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করে দাও আমাকে! সুস্থ হতে যত দেরি করব ততই তো পিছিয়ে যাবে আমাদের বিয়েটা, তাই না?'

তিনমাস হলো ক্যালিফোর্নিয়ার মডেস্টো শহরে, হিলসাইড নামে বিখ্যাত একটা স্যানাটোরিয়ামে রয়েছে অলিভা।

প্রতি মাসে প্রচুর টাকা খরচ করে সম্ভাব্য সবচেয়ে সেরা চিকিৎসা, সেই সঙ্গে যথাসম্ভব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওর জন্য। কেবিনের লাগোয়া একটা স্টুডিও আছে, মন চাইলে সেখানে বসে অলিভা যাতে ছবি আঁকতে পারে।

অলিভাকে দেখতে গিয়ে ওই স্টুডিওতে একবার উঁকি দিয়েছে রানা। অনেক যত্নে ওর একটা ছবি এঁকেছে অলিভা। বিষণ্ন চেহারা, কাঁদছে রানা।

তবে ডাক্তাররা জানিয়েছেন, অলিভার রিপোর্ট খুব একটা ভাল নয়। ওর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, রানা ওকে ভুল বুঝিয়ে আটকে রেখে গেছে এখানে। ফলে ডাক্তারদের সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করছে না ও, ঠিকমত ওষুধ খাচ্ছে না। এমনকী মাঝে-মধ্যে ভায়োলেন্টও হয়ে উঠছে।

ওর ধারণা রানা ও লিয়ন, দুজনেই ওরা হৃদয়হীন পাষাণ, তা না হলে প্রায় দেড় মাস হতে চলল কেউ ওরা ওকে একবার দেখতে পর্যন্ত আসে না!

*

দেড় মাস আগের কথা। প্রিয় বন্ধুর জরুরি তলব পেয়ে লন্ডন থেকে সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় উড়ে আসতে হয়েছে রানাকে। মডেস্টো এয়ারপোর্টে ওকে রিসিভ করতে এসেছে লিয়ন।

আগেও ওকে দেখে ম্লান, অসুস্থ বলে মনে হয়েছে রানার, এবারও হলো। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করে, কিছু হয়েছে কি না। উত্তর পেয়েছে—মাথাব্যথা; ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় করে।

'কী রে, তোকে তো এবার আরও কাহিল লাগছে। কিছু হয়েছে?'

আজ আর মাথাব্যথার কথাটা বলল না লিয়ন। বলল, 'বলব বলেই ডেকেছি। আগে আমার স্যুইটে চল।'

অলিভাকে স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করবার পর মডেস্টোর একটা ফাইভ স্টার হোটেলে উঠেছে লিয়ন।

স্যুইটে পৌঁছেই মদ নিয়ে বসল ও।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এই দুপুরবেলা, খালি পেটে?'

নিঃশব্দে হাসল লিয়ন। 'আমার আর সকাল-দুপুর বলে কিচ্ছু নেই, দোস্ত। আমি চলে যাচ্ছি।'

ওর বলবার ভঙ্গিটা এমনই, রানার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অথচ খুব ভালভাবেই জানে ও প্রাণপ্রিয় বন্ধুর কী হয়েছে, জানে কী বলবে বলে ডেকেছে ওকে। 'খুলে বল। কী বাধিয়েছিস?'

'এতদিন তোদের কাউকে বলিনি,' ধীরে ধীরে বলল লিয়ন। 'অনেক আগেই ধরা পড়েছে অসুখটা।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। 'না, এর কোনও চিকিৎসা নেই।' দেরাজ থেকে একটা বড় এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'রিপোর্টগুলো দেখ্।'

এনভেলাপটা খুলে রিপোর্টগুলোয় চোখ বুলাল রানা, আসলে চোখ বুলাবার ভান করল, তারপর রেখে দিল টেবিলে। ও জানে কী লেখা আছে রিপোর্টে—ব্রেন ক্যান্সার।

অনেকদিন আগেই নুমার একজন ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল রানা, 'আমার বন্ধু লিয়ন সব সময় ক্লান্তি বোধ করে। চিনচিনে মাথাব্যথাটাও সারছে না। কত করে বলি, কিন্তু কোনওমতে ডাক্তার দেখাবে না। কী হতে পারে বলুন তো?'

ডাক্তার জবাব দিয়েছেন, 'আপনি জানেন না? ওর তো ব্রেন ক্যান্সার। আমিই প্রথম ধরি। এখন অন্য ডাক্তার দেখছেন ওকে, আমার সিনিয়র—না, ভাল হবে না।'

সন্দেহ নেই অনেক দেরি করে ফেলেছে লিয়ন। ক্যান্সারটা এমনভাবে ছড়িয়েছে, অপারেশন করতে হলে প্রায় পুরো ব্রেনটাই কেটে ফেলে দিতে হয়।

কিছু না বলে রানা শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

'রানা, দোস্ত, তোকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে,' হঠাৎ জরুরি আবেদনের সুরে বলল লিয়ন। 'নিবি তো?'

'মারব এক চড়,' কর্কশ সুরে বলল রানা, গলায় উঠে আসা কান্নাটাকে কোনও রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। 'কী করতে হবে তা-ই বল।'

প্রথমে দেরাজ থেকে একগাদা দলিল-দস্তাবেজ বের করে রানার সামনে রাখল লিয়ন, বলল, 'তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নে। অলিভার নামে একটা ট্রাস্টি বোর্ড হচ্ছে, তুইও ওটার সদস্য।'

দলিলটা রানার পড়া না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল।

ওদের দূর-সম্পর্কের আংকেল মারা যাওয়ার আগে তাঁর সব টাকা আর সম্পত্তি লিয়নের নামে লিখে দিয়ে গেছেন। টাকার অংকটা পাঁচ মিলিয়ন ডলার। সম্পত্তির দাম হবে কমপক্ষে পঞ্চাশ মিলিয়ন।

লিয়নের ইচ্ছে ওই টাকা থেকেই অলিভার চিকিৎসা চলবে। সে যখন সুস্থ হয়ে উঠবে, টাকা ও সম্পত্তি সবই তার হাতে তুলে

দেওয়া হবে।

তিনজনকে নিয়ে একটা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে দুজন লস অ্যাঞ্জেলেসের নামকরা সলিসিটর, হাওয়ার্ড ব্লেচার আর মাইকেল গুডউইল, দুজনেরই শাখা অফিস আছে মডেস্টো শহরে; বাকি একজন রানা।

নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক ডক্টর পেরি প্রেসটন এবং ওই একই স্যানাটোরিয়ামের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. লেভি শেলডন সাক্ষী হিসাবে সই করবেন চুক্তিপত্রে।

সলিসিটরদের মধ্যে মাইকেল গুডউইলকে খুব ভালভাবে চেনে রানা, কোনও রকম গোলমাল করবার মানুষ নন তিনি। উকিল পাড়ায় আদর্শবান সৎ মানুষ বলে খ্যাতি আছে ওঁর। তবে হাওয়ার্ড ব্লেচারকে চেনে না ও।

স্যানাটোরিয়ামের মালিক পেরি প্রেসটন বা পরিচালক লেভি শেলডন, দুজনেই এত ব্যস্ত মানুষ যে এখানে আসবার জন্য সময় বের করতে পারবেন না, তাই ঠিক হয়েছে সম্ভাব্য সদস্যদের নিয়ে ওখানে যাবে লিয়ন। সেটা আজই, আর দশ মিনিট পর। সাক্ষীদের সামনে চুক্তিপত্রে সই করে সদস্য হতে হবে ওদের তিনজনকে।

টেলিফোন করে জেনে নিল লিয়ন, সলিসিটররা ইতিমধ্যে হিলসাইডে পৌঁছে গেছেন। এরপর স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ওরা।

চুক্তিপত্রে নানা বিধি-বিধানের কথা বলা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অলিভার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রাখা হয়েছে তা তুলতে হলে চেক-এ ট্রাস্টি বোর্ডের অন্তত দুজন সদস্যের সই লাগবে, একা কেউ টাকা তুলতে পারবে না। ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রেজারার করা হয়েছে সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচারকে, চেক বইটা ওঁর কাছেই থাকবে।

তবে অলিভার সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করার প্রয়োজন হলে

তিন সদস্য এবং দুই সাক্ষীর উপস্থিতি ও সই দরকার হবে।

অলিভা সুস্থ না হলে, কিংবা মারা গেলে, কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সব টাকা আর সম্পত্তি দান করে দিতে হবে।

গাড়িতে ওঠার পর লিয়ন জানাল, রানাকে যেহেতু প্রতি মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাওয়া যাবে না, অলিভার ব্যক্তিগত খরচ আর চিকিৎসার ব্যয় মেটানোর জন্য দুই সলিসিটর চেক-এ সই করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবেন, তবে খরচপাতি সবই হবে ট্রেজারারের হাত দিয়ে।

সবশেষে লিয়ন বলল, 'অলিভাকে তুই বিয়ে করলে ভাল হত, নিশ্চিন্তে মরতে পারতাম। কিন্তু জানি বয়সে ছোট হয়ে যায় মনে করে রাজি হবি না তুই। তবে এ-ও জানি, আমি না থাকলেও ওকে তুই দেখে-শুনে রাখবি। ওর বিয়েটাও তোকেই দিতে হবে।'

বিশ মিনিটের মধ্যে স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে গেল ওরা।

একে একে সবার সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল লিয়ন। স্যানাটোরিয়ামের মালিক ডক্টর প্রেসটন ছোটখাট মানুষ, মাথায় চকচকে টাক, বয়স হবে ষাট কি বাষট্টি, দুই চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।

ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর শেলডন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, কথা বলেন কম, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

সলিসিটরদের মধ্যে হাওয়ার্ড ব্লেচার রানার দৃষ্টি কেড়ে নিলেন। দীর্ঘ কাঠামো, উন্নত ললাট, চওড়া চোয়াল, বড় বড় চোখ—সব মিলিয়ে আভিজাত্য আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে চেহারায়; রানা ভাবল, এই ভদ্রলোককে ট্রাস্টির ট্রেজারার বানিয়ে ভুল করেনি লিয়ন, দেখেই বোঝা যায় যোগ্য মানুষ।

ব্লেচারের তুলনায় দ্বিতীয় সলিসিটর মাইকেল গুডউইলকে মান্ধাতা আমলের মানুষ বলে মনে হলো রানার। সত্তর বছর বয়েস, কিন্তু দেখায় আরও অনেক বেশি—প্রায় কুঁজো হয়ে পড়েছেন। তবে এই অঞ্চলে নীতিবান বলে অত্যন্ত সুনাম আছে

ভদ্রলোকের।

দুই সাক্ষীর সামনে রানা আর দুই সলিসিটর একে একে চুক্তিপত্রে সই করে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হলেন। এরপর সাক্ষীরাও সই করলেন। দাতা হিসাবে সবার আগে সই করছে লিয়ন।

সেদিনই লিয়নকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল রানা। রোগ সারানোর কোনও চিকিৎসা নেই, শুধু তীব্র ব্যথাটা যতটা পারা যায় কমানোর চেষ্টা করলেন ডাক্তাররা।

একমাস পর মারা গেল লিয়ন। রানা খবর পেল ঠিকই, তবে কঠিন একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আফ্রিকায় রয়েছে ও তখন। বন্ধুকে কবর দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি।

এরপর আরও পাঁচ-ছয় মাস পার হয়ে গেছে। প্রতি মাসে একবার, কোনও কোনও মাসে দু'বার স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে অলিভাকে দেখে আসছে রানা। কিন্তু অলিভাকে দেখলেই মনটা ওর বিষণ্ন হয়ে ওঠে। দিনে দিনে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে ওর অবস্থা, ভাল হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

প্রতিবার আগের চেয়ে উদ্বিগ্ন আর শঙ্কিত দেখে আসছে অলিভাকে রানা। 'কবে আমি ভাল হব, মাসুদ ভাই? কবে আমাদের বিয়ে হবে?' দেখা হলেই ব্যাকুল সুরে জানতে চায় ও।

হেসে উঠে আরেকটু ধৈর্য ধরতে বলে রানা।

'তুমি জোর করে হাসছ!' বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিক ধরে ফেলে। 'তার মানে কি সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাব? আমার কি তা হলে তোমাকে আর পাওয়া হবে না?'

বুকে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে হয় রানাকে, মিথ্যে অভয় দিয়ে বলতে হয়, 'ডাক্তার বলেছেন আর কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। ওষুধের কোর্সটা শেষ হোক...'

কথাটা সত্যি নয়, ডাক্তাররা আসলে ওকে কোনও আশার

কথা শোনাতে পারেননি। বরং ওকে আতঙ্কিত করে দিয়ে বলেছেন, অলিভার মধ্যে ধীরে ধীরে 'হোমিসাইডাল টেনডেন্সি' গ্রো করছে। অনেক সময় ডাক্তার বা নার্সরাও ওর নাগালের মধ্যে নিরাপদ বোধ করে না।

রানার মিথ্যে আশ্বাস শুনতে শুনতে ক্রমে হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে অলিভা। চিৎকার শুরু করে: 'তুমিও জানো, কেন আমি ভাল হচ্ছি না! ডাক্তাররা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, ওরা চাইছে না তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক! ওদের নামে কোর্টে নালিশ করব আমি...'

এক পর্যায়ে মেইল নার্স ও ডাক্তারদের ডাকতে হয়, রানা একা ওকে সামলাতে পারে না।

রানার উপর অলিভার কোনও রাগ নেই—সব রাগ ডাক্তার, চিকিৎসা পদ্ধতি, লিয়ন আর নিজের নিয়তির উপর। লিয়ন যে মারা গেছে ওকে তা জানানো হয়নি।

রানা দেখছে চোখের সামনে তাজা একটা গোলাপ কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, অথচ কারুরই কিছু করবার নেই। অসহায় রানা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে শুধু। প্রায় সময়ই অলিভার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না ও।

ছয়

মডেস্টো শহরটা ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেন্টো থেকে একশ' কিলোমিটার দক্ষিণে। ওই শহরে, পাহাড়ি ঢালের মাথায়, খোলা সবুজ মাঠ আর সুদৃশ্য বাগানের মাঝখানে, ধবধবে সাদা রঙের বিশাল একটা উঁচু দালান বহুদূর থেকে পর্যটকদের দৃষ্টি

কাড়ে। ওটাই হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম। স্যাক্রামেনটো নদী থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা করা হয় এখানে। এই মুহূর্তে ঝোড়ো বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দকে ছাপিয়ে নারীকণ্ঠের একটা ভোঁতা চিৎকার বেরিয়ে আসছে প্যাড লাগানো চার দেয়ালের ভিতর থেকে। ভয় বা ব্যথা পেলে এভাবে কেউ কাঁদে না, আওয়াজটার মধ্যে ভৌতিক আর অশুভ একটা ভাব আছে, যেন কোনও পাপী আত্মা কী এক আক্রোশে ফুঁসছে বা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তুঙ্গে ওঠার পর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে বুকফাটা কান্না, তারপর বেশ কিছুক্ষণ শুধু ফোঁপানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাগল মেয়েটা এই মুহূর্তে বোধহয় নিজেই নিজের করুণার পাত্রী।

কিছুক্ষণ পর থেমে গেল মেয়েটা, হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু না! একটু পরেই আবার শুরু হলো। এবার কাঁদছে না, হাসছে। তবে ওর এই হাসির শেষেও ফোঁপানোর ভেজা ভেজা আওয়াজটা থাকল। হাসি-কান্নার এই পালা আজ বোধহয় সারারাত ধরেই চলবে।

তরুণী নার্স, আকর্ষণীয় ফিগার, চাকা লাগানো ট্রলিতে সাপার-ট্রে নিয়ে চওড়া করিডর ধরে সাবধানে হেঁটে আসছে। করিডরের তেমাথায় পৌঁছে ট্রলিটা কারুকাজ করা একটা দরজার পাশে থামাল। সাদা ইউনিফর্মের পকেট থেকে চাবি বের করে কবাটের কী হোলে ঢোকাতে যাবে, এই সময় চোখে পড়ল বাঁক নিয়ে এদিকেই হেঁটে আসছে শক্ত-সবল এক যুবক।

ওকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দ হাসছে লোকটা—ফ্লোরেসেন্ট বাতির আলো লেগে ঝিক করে উঠল সোনা দিয়ে বাঁধানো নকল দাঁত দুটো। তবে উপরতলা থেকে ভেসে আসা আরেক প্রস্থ ভৌতিক কান্না প্রথমে ম্লান, তারপর বিকৃত করে দিল ওর হাসিটাকে।

'উফ্, আমার দাঁতকপাটি লাগার অবস্থা হয়েছে, মিলা,' নার্সের সামনে থেমে দু'হাত দিয়ে নিজের কান চেপে ধরে বলল লোকটা। 'ওহ্, খোদা, কী ভয়ঙ্কর!'

'জানি, বাষট্টি নম্বরের কথা বলছ।' কাঁধ ঝাঁকাল মিলা। ওর চুলের রং শুকনো খড়ের মত, সাদা ক্যাপের চারধারে ছোট ছোট বৃত্ত-অর্ধবৃত্তের গোছা হয়ে ঝুলছে। 'ঝড়-বৃষ্টি হলেই এরকম করবে ও। ওয়ার্ড সুপারিনটেনডেন্টকে বলতে হবে এবার ওকে সাউন্ডপ্রুফ কেবিনে পাঠানো দরকার।'

দুজন নার্স আর একজন ডাক্তার পাশ কাটাল ওদেরকে, তিনজনই বিশেষভাবে লক্ষ করল মিলার সঙ্গীকে।

'ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে না কেন?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল যুবক। 'এরকম জানলে কিন্তু এখানে আমি চাকরি করতে আসতাম না।'

'কী বলছ, ডেল?' হেসে উঠল মিলা। 'মেন্টাল হসপিটালে এরকমই তো হবার কথা।'

'সন্দেহ হচ্ছে আমার সমস্ত নার্ভ না ছিঁড়ে যায়,' বলল ডেল, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'এই, তুমি শোনোনি? আজ সকালে আটত্রিশ নম্বরের ছুঁড়িটা নখ ঢুকিয়ে আমার চোখ দুটো বের করে নিচ্ছিল। মা মেরির অশেষ কৃপায় একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।'

'এক থেকে দশতলা, কারও আর শুনতে বাকি নেই। কে যেন বলছিল, জ্বর আসা ভালুকের মত কাঁপছিলে তুমি।'

'ভেবে দেখো,' নিঃশব্দে হাসছে ডেল, আবার ঝিক করে উঠল ওর সোনার দাঁত দুটো, 'তা না হলে কি ওয়ার্ড সুপারকে দিয়ে ব্র্যান্ডির বোতলটা খোলাতে পারতাম?'

মিলা কিছু বলবার আগেই বাষট্টি নম্বর কেবিনের মেয়েটা কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করল। হঠাৎ ভ্রূ কোঁচকাল ও, ডেলের কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেছে—ট্রলির ট্রেতে রাখা একটা প্লেটের ঢাকনি তুলে একমুঠো কালো পিচ ফল নিল সে, মুখে পুরে পরম

তৃপ্তির সঙ্গে চিবাচ্ছে।

'ছি-ছি, আমার পেশেন্টের খাবারে তুমি হাত দিলে যে?' মিলার গলায় তিরস্কার। 'ঢাকনি লাগাও, সরো ওখান থেকে। কার খাবারে হাত দিয়েছ তা যদি জানতে...' মাঝপথে থেমে গেল ও।

'দুঃখিত, ভুল হয়ে গেছে,' বলল ডেল। 'কার খাবার, হিলারি ক্লিনটনের? বারাক ওবামার কাছে হেরে যাবার ভয়ে পাগল হয়ে গেছেন?'

ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা জোড়ায় জোড়ায় এক করিডর থেকে আরেক করিডরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; দু'তলা থেকে দুজনকে নামতে দেখল মিলা। 'আরে না,' বলল ও। 'এখনও বিয়ে হয়নি মেয়েটার, অথচ শুধু নগদ টাকাই পাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার। সম্পত্তি পাবে আরও ধরো পঞ্চাশ মিলিয়ন!'

মৃদু শব্দে শিস বাজাল ডেল। 'তা-ই নাকি? তুমি জানলে কীভাবে?'

'ওর ভাই একটা ট্রাস্টি বোর্ডকে টাকা আর সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে মারা গেছে,' বলল মিলা। 'বোন সুস্থ হলে পাবে সব। আমাদের স্যানাটোরিয়ামের মালিক ওই ট্রাস্টিদের একজন সাক্ষী। মাস কয়েক আগে যখন চুক্তিপত্রে সই হয়, আমি তখন একটা কাজে ডক্টর প্রেসটনের চেম্বারেই ছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'যাই বলো, একেই বলে কপাল!'

'প্রহসনও বলতে পারো—অগাধ আছে ওর, অথচ ব্যবহার করতে পারছে না; আর আমি খরচ করতে জানি, কিন্তু পকেট খালি। এই, মেয়েটা দেখতে কেমন?'

হেসে উঠল মিলা। 'তা জেনে তোমার কী লাভ?'

ডেলও হাসছে। 'বিশ্বাস করো, অত টাকা পেলে পেত্নীকেও বিয়ে করতে রাজি আমি... পাগল হোক আর ছাগল... '

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল মিলার হাসি। 'ঠাট্টা নয়, ডেল।

মেয়েটাকে না, আমার খুব ভয় করে। হোমিসাইডাল টেনডেন্সি আছে ওর।'

'বলো কী! থাক বাবা, দরকার নেই অমন টাকায়। আমার জন্যে তোমার মত মেয়েই ভাল—টাকা দিতে না পারলেও, সুখ দিতে জানে।'

'এই,' খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল মিলা, 'তোমার ডিউটি শেষ নাকি?'

'আজ রাতেও দাওয়াত পাব মনে হচ্ছে?'

হেসে উঠল মিলা, শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকা করে বলল, 'না হে, আমার ছুটি হবে আরও এক ঘণ্টা পর।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ডেল। 'তাতে কী, তোমার ডাক পেলে আমি সারারাত অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

নার্সদের একটা দলকে এদিকে আসতে দেখে ফিসফিস করে জানতে চাইল মিলা, 'ডিরেক্টর সারের প্রাইভেট গ্যারেজে?'

মাথা চুলকে ডেল বলল, 'সারের ড্রাইভার জেরাল্ড ছাড়াও ওয়াগন ড্রাইভার হ্যাকাবি থাকবে ওখানে...ঠিক আছে, বিয়ার খাওয়ার পয়সা দিলে প্রাইভেসির ব্যবস্থা করে দেবে ওরা। গেলাম তা হলে। আমাকে কিন্তু সত্যি সত্যি সারারাত অপেক্ষা করিয়ে রেখো না—ঠিক আটটায়, কেমন?'

যতক্ষণ না বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো ততক্ষণ ডেলের দিকে তাকিয়ে থাকল মিলা, তারপর দরজার দিকে ফিরে হাতের চাবি ঢোকাল কী হোলে। তিনতলার মেয়েটা আবার কাঁদতে শুরু করেছে, এবার আগের চেয়েও জোরে—তা-ই হওয়ার কথা, ভাবল ও, বাইরে ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপও খুব বেড়েছে। দালানের কোথাও একটা দরজার কপাট দড়াম করে বন্ধ হলো।

দরজা খোলার পর ট্রে নিয়ে কেবিনের ভিতর ঢুকল মিলা। কামরাটা বেশ বড়। দেয়ালগুলো সাদা রঙ করা। মেঝেতে সোনালি কার্পেট। ফার্নিচার বলতে একটা বেড, দুটো চেয়ার-

টেবিল, ওয়ার্ড্রোব, টিভি, ফোন আর দেয়াল আলমারি। সিলিঙের অদৃশ্য কোনও উৎস থেকে সাদা কোমল আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

কামরায় আরও তিনটে দরজা আছে—বাথরুম, পেইন্টিং-স্টুডিও আর টেরেসে যাওয়ার জন্য। টেরেসটা গ্রিল দিয়ে ঘেরা।

টেরেসে বেরুবার দরজার ঠিক পাশেই বেড। তাতে পড়ে থাকা আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে চাদরমুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে মেয়েটি।

একটু অন্যমনস্ক মিলা, ডেলের কথা ভাবছে। টেবিলের উপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করল, তারপর বিছানার দিকে এগোল। 'উঠুন,' বলল ও, নরম গলায় অনুরোধের সুর। 'এই অসময়ে কেউ ঘুমায় নাকি! প্লিজ, আমাকে দেরি করিয়ে দেবেন না, আপনার জন্যে সাপার এনেছি।'

চাদরের তলায় কেউ নড়ছে না। মিলার কপালে চিন্তার রেখা। কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ খুব অস্বস্তি বোধ করছে ও।

'কী হলো, উঠুন!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল মিলা, ঘুমন্ত মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল একটু। অনুভব করল আঙুলের চাপে নরম তুলো ডেবে যাচ্ছে। আতঙ্কে শিউরে উঠে উপলব্ধি করল, চাদরের তলায় কোনও মেয়ে নয়, সম্ভবত বালিশ রয়েছে।

টান দিয়ে চাদরটা সরাল মিলা। সত্যিই তা-ই, গুটানো কম্বলের ভিতর বালিশ ভরে নারীমূর্তির আকৃতি দেওয়া হয়েছে। হতচকিত ভাবটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এই সময় ওর পিছনে ধীরে ধীরে ফাঁক হলো টেরেসের দরজা। শিকারি বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ঝুঁকল অলিভা, দু'হাত বাড়িয়ে মিলার পা দুটো পেঁচাল, তারপর নিজের দিকে টান দিল সজোরে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আছাড় খেল মিলা। কার্পেটে নয়, ওর কপালটা প্রথমে বাড়ি খেল পাশের শক্ত দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল ও। খুলি ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

সেদিকে একবারও না তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকল অলিভা। নিজের কয়েকটা ড্রেস ফালি ফালি করে ছিঁড়ে একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগিয়েছে আগেই, রশির মত ঝুলিয়েও দিয়েছে জানালা দিয়ে।

জানালার গোবরাটে চড়ল, তারপর নিজের বানানো রশি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল নীচে। কোমরে একটা ভারি টর্চ গোঁজা আছে, পাঁচিল টপকাবার সময় কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করলে তার মাথায় ভাঙবে ওটা।

সাত

একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে আজই সকালে মডেস্টো শহরে ফিরেছে রানা। দুই রাত ঘুম হয়নি, অসম্ভব ক্লান্ত ও। গোসল সেরে দাড়ি কামাবে, হালকা কিছু খাবে, তারপর লম্বা একটা ঘুম দিয়ে সন্ধ্যায় কোনও এক সময় হিলসাইডে দেখতে যাবে অলিভাকে।

দুঃসংবাদটা শুনল রানা হিলটন হোটেলের স্যুইটে ঘুম ভাঙার পর সন্ধে ঠিক আটটায়। সোয়া সাতটার দিকে একজন নার্স আর একজন গার্ডকে আহত করে হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়েছে অলিভা। গার্ডের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, বাঁচবে কি না সন্দেহ।

ইতিমধ্যে স্যানাটোরিয়ামের চারদিক আর আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো শুরু হয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত ওর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। এত তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত হবে কি না ভেবে দ্বিধায় ভুগছে কর্তৃপক্ষ। শেষ

পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ট্রাস্টি বোর্ডের তিন সদস্যকে আগে জানানো হোক, ওঁরা কে কী বলেন শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে ফোন করে ওর এজেন্সির মডেস্টো শাখাকে খবরটা দেওয়া হয়েছে। শাখা-প্রধান নঈম মাহমুদ রানাকে জানাল, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক ডক্টর পেরি প্রেসটন নিজেই ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোক অনুরোধ করেছেন, রানা যেন ট্রাস্টি বোর্ডের অপর দুই সদস্য সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার আর মাইকেল গুডউইলকে বিষয়টা অবহিত করেন।

ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় নিল রানা।

ইতিকর্তব্য স্থির করতে লাগল আরও বিশ সেকেন্ড: সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অলিভাকে খুঁজে বের করতে হবে। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে তল্লাশিতে অংশ নেবে ও, তবে মাসুদ রানা হিসাবে নয়।

নার্স ও গার্ডকে আহত করেছে অলিভা, তার মানে রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওকে দেখে চিনতে পারলে কী করে বসবে বলা যায় না। এখনই নিজের চেহারা আর পরিচয় বদলে ফেলতে হবে ওকে। প্রিয়জনের সামনে আত্মহত্যা করবার একটা প্রবণতা থাকে এ-ধরনের মানসিক রোগীদের।

রানা এজেন্সির মডেস্টো শাখা থেকে রানার হোটেল মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। শাখা-প্রধান নঈম মাহমুদকে নির্দেশ দিল: 'আমার চেম্বারের দেরাজে রডরিক ফেদেরা নামে একটা পরিচয়-পত্র পাবে—মেক্সিকান-আমেরিকান, পেশায় ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট। তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও ওটা, ফটো দেখে চেহারাটা বদলে নিই। ভাল একটা ক্যামেরাও পাঠাও।'

'মাসুদ ভাই,' জানতে চাইল মাহমুদ, 'আমরা কি সার্চ শুরু করব?'

'না,' বারণ কলল রানা। কারণ জানে, আশপাশের প্রতিটি এজেন্সির সব কজন এজেন্টকে চেনে অলিভা। 'তবে সবাই তোমরা অ্যালার্ট থাকো। আমার কাছে ব্লিপার আছে, নিজেদের রিসিভারে আমার সিগনাল পেলে যত তাড়াতাড়ি পারো হোমিং ডিভাইসের সাহায্যে পৌঁছে যাবে ওখানে।'

'জী, ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর মোবাইল ফোনের মেমোরি থেকে সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচারের নম্বর নিয়ে চাপ দিল বোতামে। লস অ্যাঞ্জেলেস, দূর পাল্লার কল, নেটওঅর্ক পেতে অসুবিধে হতেই পারে।

কয়েকবার রিঙ হলো, কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে ধরছে না কেউ। এরপর রানা দ্বিতীয় সলিসিটর মাইকেল গুডউইলের নম্বরে যোগাযোগ করল। এটাও লস অ্যাঞ্জেলেসে।

দু'বার রিঙ হওয়ার পর অপরপ্রান্ত থেকে এক ভদ্রমহিলার গলা ভেসে এল। 'কাকে চাইছেন, প্লিজ?'

'মিস্টার গুডউইলকে দরকার আমার...'

রানার কথা শেষ হলো না, ভদ্রমহিলা বললেন, 'তিনি তো এক মাস হলো মারা গেছেন। আপনি কে বলছেন, প্লিজ? আমি মিসেস গুডউইল।'

মৃদু হলেও, ধাক্কা খেল রানা। 'সত্যি দুঃখিত, মিসেস গুডউইল...'

'ধন্যবাদ। আপনি কে বলছেন, প্লিজ?' আবার জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। 'ওঁকে আপনার কী কারণে দরকার ছিল জানতে পারলে আমি হয়তো...'

'আমি মাসুদ রানা। অলিভা কারমেন নামে একটা মেয়ের সয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্যে তিনজনকে নিয়ে একটা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, আমিও ওটার সদস্য,' বলল রানা। 'বাকি দুজন মিস্টার গুডউইল আর মিস্টার হাওয়ার্ড

ব্লেচার।’

‘ও, হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটা আমি জানি—তা কী ব্যাপার?’

‘মেয়েটা একটু আগে মডেস্টোর হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়ে গেছে,’ বলল রানা। ‘নিয়ম অনুসারে ওর সলিসিটরদের খবরটা জানানো দরকার। আপনি বলতে পারবেন, প্লিজ, মিস্টার ব্লেচারকে কোথায় পাওয়া যাবে?’

‘কোথায় আবার, জুয়ার টেবিলে!’ হঠাৎ কর্কশ হয়ে উঠল ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর। ‘আর নয়তো কোনও বারে—মাতাল হয়ে পড়ে আছে।’

‘জী?’ ঘাবড়ে গেছে রানা।

‘শুনুন,’ বললেন মিসেস গুডউইল, ‘ওই লোক নিজে তো রসাতলে গেছেই, নাগালের মধ্যে যাকে পাবে তাকেও ডোবাবে। আপনি অলিভার কথা বললেন না, আমার স্বামী বেঁচে থাকতেই বলে গেছেন—ওই মেয়ের সবকিছু আত্মসাৎ করবে ওই লোক।’

এই ব্যাপারটা জানা আছে রানার। মিস্টার গুডউইল টেলিফোনে ওকে একবার জানিয়েছিলেন যে সলিসিটর ব্লেচার সব সময় অলিভার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা তুলতে চান, কিন্তু তিনি কখনওই তা হতে দেন না। ‘একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন, মিসেস গুডউইল, প্লিজ?’

‘এর মধ্যে ব্যাখ্যা করার কী আছে, বলুন,’ ক্ষোভ মেশানো কাতর সুরে বললেন ভদ্রমহিলা। ‘আমার স্বামীকে খুন করেছে ওরা।’

হকচকিয়ে গেল রানা। ‘এ আপনি কী বলছেন!’

‘অলিভার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি করতে ব্লেচারকে সহায়তা করেননি,’ মিসেস গুডউইল ধরা গলায় বললেন, ‘এটাই ছিল আমার স্বামীর অপরাধ।’

অপেক্ষা করছে রানা।

‘আমার স্বামী সই না করে একের এক চেকগুলো ফেরত

দিলে কী হবে, খবর এল ওঁর সই নকল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলছে ব্লেচার,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'অগত্যা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবেন। রওনা হবেন, এই সময় দশ-বারোজন গুণ্ডা ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর—প্রত্যেকের কাছে পিস্তল আর ছুরি। ঘরে ঢুকেই অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করে দিল, বলল পুলিশের কাছে যাওয়া হচ্ছে, না? বাইরে পা ফেলে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলব।'

'তারপর?'

'আমার স্বামী হার্টের রোগী,' বললেন মিসেস গুডউইল, গলায় কান্না উঠে আসছে। 'কোনওমতেই ওঁর উত্তেজিত হওয়া চলে না। ওদেরকে আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা পুলিশের কাছে যাব না, তোমরা দয়া করে বিদায় হও। কিন্তু বিগড়ে গিয়ে আমার স্বামী চিৎকার শুরু করলেন—উনি পুলিশের কাছে যাবেনই, ভয় দেখিয়ে কেউ ওঁকে ক্ষান্ত করতে পারবে না...এইসব বলতে বলতেই দু'হাতে বুক চেপে ধরলেন, তারপর ঢলে পড়লেন মেঝেতে। ব্যাপার দেখে সটকে পড়ল গুণ্ডারা। পাশের বাড়িতেই ডাক্তার ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এলেন তিনি। পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। মারা গেছেন আমার স্বামী।'

কিছু বলবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে রানা। শুধু বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর,' কান্না থামিয়ে খানিক পর আবার বললেন মিসেস গুডউইল, 'আমার স্বামী মারা যাবার পর ওই লোক কী করেছে শুনবেন? অলিভার চিকিৎসার মাসিক বিল নিয়মিত আগাম পরিশোধ করে প্রথম থেকেই স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রেখেছে ব্লেচার—ডক্টর প্রেসটন আর ডক্টর শেলডন বদমাশটাকে ভালমানুষ বলেই জানে; ওঁদের সম্মতি আর সই আদায় করে অন্য এক লোককে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করে নিয়েছে। এখন নিজের লোককে দিয়ে সই করিয়ে যত খুশি টাকা

তুলছে সে ব্যাঙ্ক থেকে...'

'বলেন কী!' আঁৎকে উঠল রানা।

'এ-সব কথা যেন আবার বুড়ো বদমাশটার কানে না যায়, শুনতে পাই তার সঙ্গে নাকি মাফিয়া ডনদের লিঙ্ক আছে। আচ্ছা, রাখি, কেমন?'

রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলেন মিসেস গুডউইল।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে রানার। বিপদ যখন আসে, একা আসে না। একদিকে অলিভা নিখোঁজ, আরেকদিকে ওর টাকা-পয়সা চুরি হয়ে যাচ্ছে। একা ব্লেচারকে সামলানোই মুশকিল, সেই সঙ্গে জুটেছে আবার মাফিয়া!

এই সময় নক হলো দরজায়। সোফা ছেড়ে দরজা খুলে দিল ও। দেখল, নঈম মাহমুদ এজেন্সির মেকআপ এক্সপার্ট শারমিন রেজাকে পাঠিয়েছে।

সিটিং রুমে ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসল রানা। 'আমি আমার কাজ করি, তুমি তোমার, ঠিক আছে?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

রেইনকোট পরে এসেছে শারমিন, সঙ্গে করে রানার জন্যেও নিয়ে এসেছে একটা। মুভি ক্যামেরা আর রেইনকোট টেবিলের উপর রাখল। তারপর একটা চেয়ার টেনে রানার ঠিক সামনে বসল, হাতব্যাগ থেকে রডরিক ফেদেরার পরিচয়-পত্র আর মেকাপের সরঞ্জাম বের করে পাশের নিচু টেবিলটা সাজাচ্ছে। একটু পরেই দ্রুত হাতে দক্ষতার সঙ্গে শুরু করল কাজ।

রানাও একের পর এক ফোন করছে। প্রথমে খোঁজ নিল হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামে। ওখান থেকে জানা গেল—না, এখনও অলিভার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তারপর নঈম মাহমুদকে জানাল, সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার সম্পর্কে তথ্য দরকার। শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মাফিয়াদের

যোগাযোগ আছে, সত্যি কি না দেখা দরকার। খবর নিতে হবে ব্যাঙ্কেও: অলিভার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে কী পরিমাণ তোলা হয়েছে, ওর কোনও সম্পত্তি ব্লেচার বেচে দিয়েছেন কি না।

সবশেষে ট্র্যাকিং পয়েন্ট পুলিশ স্টেশনে ফোন করল রানা।

অপরপ্রান্ত থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'শেরিফ ডেভিড কুপার।'

'রডরিক ফেদেরা, ফ্রি লান্স সাংবাদিক,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে খবরটা নিশ্চয়ই আপনার কানে গেছে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শেরিফ জানতে চাইলেন, 'ঠিক কোন্ খবরটার কথা বলছেন বলুন তো, মিস্টার ফেদেরা?'

'তার মানে এখনও কিছু জানেন না আপনি,' বলল রানা। 'হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে অলিভা কারমেন নামে এক পেশেন্ট পালিয়ে গেছে।'

'পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়নি কেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন শেরিফ। 'আপনিই বা কোত্থেকে পেলেন খবরটা?'

'স্যানাটোরিয়ামের গার্ডরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে, তাদের একজনের কাছ থেকে জেনেছি আমি,' বলল রানা। 'হয়তো আরও কিছুক্ষণ খুঁজবে ওরা, পাওয়া না গেলে আপনাকে খবর দেবে।'

ইতিমধ্যে ঠোঁটের উপর নকল গোঁফ লাগিয়ে, জুলফি বড় করে, চুলের কাটিং আর রঙ বদলে দিয়ে রানার চেহারা এতটাই বদলে ফেলেছে শারমিন, সামনে ধরা আয়নায় নিজেকে সত্যি সত্যি চিনতে পারছে না ও। ফোনে হাতচাপা দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, শারমিন।'

মিষ্টি হেসে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে বিদায় নিল মেয়েটা। শুনেছিল, ওদের বস অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু অধস্তনকে যে এভাবে ধন্যবাদ দেবেন, তা ভাবতেও পারেনি। খুশিমনে উড়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

‘টেলিফোন করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার ফেদেরা,’ ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বললেন শেরিফ কুপার। ‘আমি এখনই যাচ্ছি ওখানে...’

‘থানায় পৌঁছাতে এই ধরুন মিনিট দশেক লাগবে আমার,’ বলল রানা। ‘আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, প্লিজ, দুজন একসঙ্গে যেতে পারি।’

‘ওহ্, শিওর! আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।’

মাহমুদের কাছ থেকে দুঃসংবাদটা পাওয়ার পর মাত্র উনিশ মিনিট পার হয়েছে। আরও দেড় মিনিট লাগল হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়তে। আবার স্যানাটোরিয়ামে ফোন করল ও। না, এখনও অলিভাকে পাওয়া যায়নি।

রিং হলো ওর মোবাইল ফোনে। ডিসপ্লেতে মাহমুদের নাম দেখে বলল, ‘হ্যাঁ, বলো।’

‘মাসুদ ভাই,’ ম্লান সুরে বলল মাহমুদ। ‘লস অ্যাঞ্জেলেস আন্ডারগ্রাউন্ডের কয়েকটা সোর্স থেকে সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।’

‘ভাল নয়?’

‘না। মাফিয়া ডন মারিও মারকাস-এর ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে হারতে হারতে একেবারে ফতুর হয়ে গেছে ব্লেচার। মারকাসের কাছে লাখ লাখ ডলার দেনা তার। শুধু তাই নয়, ট্রাস্টি বোর্ডের যে সদস্য মারা গেছেন তাঁর জায়গায় মাফিয়ার ওই ডনকেই সদস্য করে নিয়েছে সে।’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। তারপর জানতে চাইল, ‘আর কিছু জানতে পেরেছ?’

‘জী,’ বলল মাহমুদ। ‘অলিভার অনেক টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে খরচ করে ফেলেছে ব্লেচার...’ আরও বেশ কিছু তথ্য গড়গড় করে বলে গেল।

মাহমুদ থামতে আপন মনে মাথা ঝাঁকাল রানা, বলল, ‘গুড

জব, মাহমুদ। একটু ভাবতে দাও, পরে আবার যোগাযোগ করব আমি।' লাইন কেটে দিল রানা।

অশুভ একটা চিন্তা শঙ্কিত করে তুলল ওকে। ওর জানা ছিল না হাওয়ার্ড ব্লেচার সলিসিটর হিসাবে নাম করেছে মাফিয়া ক্রিমিনালদের আইনী সহায়তা দিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সব বড় মাফিয়া ডনের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। অনেক শহরে লোকটার শাখা অফিস আছে, এমনকী এই মডেস্টো শহরেও। অলিভা স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়েছে এ-খবর শুনে সে হয়তো ভাববে অলিভা মারা গেলে তার খুব সুবিধে হয়।

অলিভা যাতে আর স্যানাটোরিয়ামে ফিরতে না পারে, যাতে কোনও 'দুর্ঘটনা'-য় মারা যায়, তার সুবন্দোবস্ত করবার জন্য পাওনাদার ডন মারিও মারকাসকে অনুরোধও করতে পারে এই লোক। আর তা করলে সে-লোক খুশি মনেই সাহায্য করবে, কারণ সেক্ষেত্রে অলিভার সব টাকা তার পকেটেই যাবে।

ট্রাস্ট-এর বিধি অনুসারে অলিভা মারা গেলে অলাভজনক ও জনহিতকর কোনও প্রতিষ্ঠানে সমস্ত নগদ টাকা আর সয়-সম্পত্তি দান করে দিতে হবে। ব্লেচারের জন্য সেটা কোনও সমস্যাই নয়, সে নিজেই খুব সহজে ওরকম একটা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নেবে।

ট্যাক্সিতে বসে মোবাইল ফোনে মাহমুদকে নতুন আরেকটা নির্দেশ দিল রানা: 'টপ প্রায়োরিটি—ব্লেচারের ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করো। কোথায় কার কাছে যায়, কী করে—সম্ভব হলে তার ফটো তুলে রাখো।'

'জী, মাসুদ ভাই!'

রেইনকোট খুলে ভাঁজ করা হাতে ঝোলালেন শেরিফ কুপার, তারপর ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ডের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়লেন হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক পেরি প্রেসটনের চেম্বারে।

ওঁর পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল। রেইনকোটটা বাইরে খুলে রেখে

এসেছে, হাতে শুধু ক্যামেরা।

ট্রাস্ট-এর চুক্তিপত্রে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদাতা ডক্টর প্রেসটনকে এর আগে একবার দেখছে রানা। ছদ্মবেশে থাকায় ওকে চিনতে পারলেন না তিনি। ষাট-বাষট্টি বছর বয়স ভদ্রলোকের, চেহারায় পাণ্ডিত্য আর আভিজাত্যের ছাপ। তবে এই মুহূর্তে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'আমি শেরিফ, ডেভিড কুপার,' সমনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন পুলিশ কর্মকর্তা। তারপর ইঙ্গিতে রানাকে দেখালেন। 'ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট, রডরিক ফেদেরা। আপনাদের একজন পেশেন্ট পালিয়েছে শুনে খবর নিতে এলাম। কতক্ষণ হলো?'

ওদের সঙ্গে করমর্দন সেরে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর প্রেসটন, তারপর হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন। 'প্রায় একঘণ্টা হয়ে এল।' থমথম করছে ওঁর চেহারা। 'আমাদের লোকজন চারদিকে খুঁজছে ওকে। তবে পুলিশের সাহায্যও দরকার বলে মনে করছি আমি। কাজটায় খুব শক্ত নার্ভ দরকার। মেয়েটা ডেঞ্জারাস।'

শেরিফের ম্লান চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কীরকম ডেঞ্জারাস?' ধীরে ধীরে জানতে চাইলেন তিনি।

'আমরা আসলে খুব নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি,' রানাকে চট্ করে একবার দেখে নিয়ে বললেন হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক। 'খবরটা যদি মিডিয়ায় প্রচার পায়, আমাদের সুনাম ধূলায় লুটাবে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখুন, ডক্টর প্রেসটন, যতটুকু পারা যায় আপনাকে আমি সাহায্য করব,' বললেন শেরিফ, তারপর রানার দিকে তাকালেন। 'মিডিয়াকে এখনই কিছু আপনি না জানালেও পারেন, তাই না, মিস্টার ফেদেরা?'

শ্রাগ করল রানা। একটু দ্বিধা দেখা দিয়েছে ওর মনে, তবে সেটা প্রকাশ করল না। 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন... তবে, সব কথা শুনি তো আগে।'

‘অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার ফেদেরা,’ কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন ডক্টর প্রেসটন।

‘আপনি বলছিলেন মেয়েটা ডেঞ্জারাস,’ ওঁকে মনে করিয়ে দিলেন শেরিফ।

‘এমনিতে অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র, নম্র, মিষ্টি আর বিনয়ী অলিভা,’ শুরু করলেন ডক্টর প্রেসটন। ‘কিন্তু মাঝে মধ্যে হঠাৎ তার মধ্যে হিংস্র ভাব চলে আসে। সেটাও এত মারাত্মক নয় যে সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। আমরা ভয় পাচ্ছি এইজন্যে যে পালাবার সময় প্রথমে একজন নার্সকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ও, তারপর একজন গার্ডের মাথায় ভারী টর্চ দিয়ে বাড়ি মেরে মারাত্মক আহত করেছে।’

‘ঠিক কতটা ডেঞ্জারাস ও?’

‘বলা কঠিন,’ বললেন ডক্টর প্রেসটন। ‘হপ্তার পর হপ্তা স্বাভাবিক দেখেছি ওকে আমরা। এই প্রথম এতটা ভায়োলেন্ট হলো। এখন হয়তো নাগালের মধ্যে যে-কেউ ওর হামলার শিকার হতে পারে। এটা খুবই অদ্ভুত টাইপের একটা মানসিক অসুস্থতা—স্কিৎযোফ্রিনিয়ার সঙ্গে আরও কিছু, কিন্তু সেটা কী এখনও ধরা যায়নি।’

‘ওর মধ্যে খুন করার কোনও প্রবণতা কি দেখা গেছে কখনও?’ জানতে চাইল রানা।

‘না। তবে একটা ঘটনার কথা বলি। বাগানে একদিন হাঁটাহাঁটি করার সময় অলিভা দেখতে পায় আমাদের একজন গার্ড বাইরের একটা কুকুরকে মারধর করছে। নার্স কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুটে গিয়ে দু’হাতের নখ দিয়ে গার্ডের নাক-মুখ খামচে দেয় অলিভা। মেয়েটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, নার্স জাপটে না ধরলে গার্ডের একটা চোখ সেদিন উপড়েই ফেলত।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শেরিফ বললেন, ‘এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করা সহজ কাজ হবে না। আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখা

হয়েছে, মেয়েটা ওর পরিচিত কারও কাছে গেছে কি না?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে ওর একটা ফ্ল্যাট আছে, অনেক দূরে হলেও ওটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা,' জানালেন ডক্টর প্রেসটন। 'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মিস্টার মাসুদ রানাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে মেয়েটা, তাই এজেন্সির শাখাগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।'

'ওঁর মত নামকরা একজন লোকও এর সঙ্গে জড়িত?' ভ্রূ কোঁচকালেন শেরিফ। 'কোথায় তিনি? বিরাট নেটওঅর্ক ওঁদের, তল্লাশিতে ওঁরা অংশ নিচ্ছেন না?'

মাথা নাড়লেন ডক্টর প্রেসটন। 'আমাকে বলা হয়েছে মিস্টার রানা এখানে নেই।'

'পালাবার সময় অলিভার কাছে কোনও টাকা ছিল?' জানতে চাইলেন শেরিফ।

'থাকার কথা নয়।'

রানা বলল, 'মেয়েটিকে আমরা তো কেউ চিনি না, আপনারা যদি দয়া করে ওর একটা ফটো দিতে পারেন...'

'ওর ফাইলে মাত্র একটাই ফটো আছে, সেটা তো আমরা কপি না করে দিতে পারব না—একটু সময় লাগবে,' বললেন ডক্টর প্রেসটন।

'তা লাগুক,' বলল রানা। 'ফটো একটা না হলে চলবে না। ভাল কথা, ওর চেহারা বর্ণনা করুন, লিখে নিই।' ডক্টর প্রেসটন একটা ফাইল খুলতেই নোটবুক আর পেন্সিল বের করল রানা। ওর দেখাদেখি শেরিফও।

'প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ। মাথায় একরাশ লালচে-সোনালি চুল। বড় বড় সবুজ চোখ। ভারি সুন্দর ফিগার, অসাধারণ সুন্দরী। মাঝে-মধ্যে আড়চোখে তাকাবার অভ্যাস আছে। উত্তেজিত হয়ে পড়লে ডান গালের একটা পেশি বা শিরা সামান্য লাফায়। চমৎকার ছবি আঁকে।'

‘ধন্যবাদ, ডক্টর,’ নোটবুক বন্ধ করতে গিয়েও করল না রানা। ‘বিশেষ কোনও চিহ্ন, ডক্টর প্রেসটন?’

‘ওর বাম কবজির ওপর দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ আছে, ছোটবেলায় ধারাল কাঁচ লেগে কেটে গিয়েছিল। সহজে চেনার উপায় হলো ওর লালচে-সোনালি চুল।’

‘কী পরে আছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘উলের তৈরি গাঢ় রঙের একটা ড্রেস, আর উঁচু হিল লাগানো একজোড়া জুতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার শোফার, রিপোর্ট করেছে: বাথরুম থেকে ফিরে দেখে ওর ট্রেঞ্চকোটটা হ্যাঙ্গারে নেই—আমরা ধরে নিতে পারি অলিভাই নিয়ে গেছে ওটা।’

চেয়ার ছাড়লেন শেরিফ। ‘স্টেট পেট্রলকে এখনই সবগুলো রাস্তার ওপর নজর রাখতে বলে দিচ্ছি আমি। পাহাড়ি এলাকা আর জঙ্গলগুলোয় সার্চ পার্টি পাঠাচ্ছি। চিন্তা করবেন না, আমরা ওকে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলব।’

চকচকে মাথাটা নিচু করলেন ডক্টর প্রেসটন, যেন বোঝাতে চাইলেন তিনি অতটা আশাবাদী হতে পারছেন না।

আট

বিরাট নীল টয়োটা ভ্যানটা অনায়াস ভঙ্গিতে পাহাড়ি রাস্তা ধরে উঠে যাচ্ছে, সকালের রোদ লাগায় ঝকঝক করছে ওটার লম্বা হুড।

হুইলের পিছনে দায়ান বার্নেট; পাশে বসে কী যেন চিন্তা করছে ওর বড় ভাই যোসেফ। ওদের মধ্যে এমন কিছু নেই যা

দেখে বোঝা যাবে ওরা দুজন আপন ভাই। দায়ান দীর্ঘদেহী, সুঠাম, এক রত্তি মেদ নেই শরীরে, রোদে পুড়ে চামড়ার রঙ হয়েছে গাঢ় মধু। ওর চোখ দুটো মায়াভরা, আচরণ মার্জিত, কথাবার্তায় ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। সাতাশ বছর বয়স হলেও, দেখে আরও কম মনে হয়। জিনস পরে আছে ও, সঙ্গে কাউবয় চেক শার্ট—গুটানো আস্তিনের বাইরে বেরিয়ে আছে পেশল দুই বাহু।

ওর চেয়ে বয়সে বড় যোসেফ, লম্বায় প্রায় তিন ইঞ্চি ছোট। ঠোঁট জোড়া মোটা, নার্ভাস একটা ভাব লেগে থাকে ওগুলোর কোণে। হাঁটা-চলার সময় ঝাঁকি খায় শরীরটা, প্রতিটি কাজ ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে করতে অভ্যস্ত। কী কারণে যেন সব সময় উত্তেজিত হয়ে আছে, যে-কোনও মুহূর্তে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় ওর গায়ের শহুরে কাপড়চোপড় একটু বেমানান, বিশেষ করে এদিকটা রান্‌শ্‌ এলাকা হওয়ায়।

ফোন করে ছোটভাইকে আগেই জানিয়েছিল যোসেফ, নিউ ইয়র্ক থেকে আসছে সে, কিং’স ক্যানিয়ন-এ পৌঁছাবে ট্রেনে করে। নিজের রান্‌শ্‌ থেকে ভ্যান নিয়ে ওকে আনতে গিয়েছিল দায়ান।

পরস্পরের সঙ্গে অনেক বছর দেখা হয়নি ওদের। দায়ান এখনও অবাক হয়ে ভাবছে, হঠাৎ কী কারণে ওর কাছে চলে এল যোসেফ! এমন নয় যে পরস্পরের সঙ্গে খুব একটা মিল-মহব্বত আছে ওদের। মনে করা কঠিন, কোনও ব্যাপারে আদৌ ওরা কখনও একমত হতে পেরেছে কি না। স্টেশনে আজ কুশলাদি বিনিময়ের সময় যোসেফের কর্কশ ব্যবহারে এতটুকু বিস্মিত হয়নি দায়ান।

রান্‌শে ফেরার পথে প্রথম দু’মাইল দুজনের মুখ থেকে আট-দশটার বেশি শব্দ বেরোয়নি। যোসেফ নার্ভাস হয়ে আছে, বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের রাস্তার উপর চোখ বুলাচ্ছে, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে কেউ ওদের পিছু নেয়নি। ওর এই

অপ্রত্যাশিত রহস্যময় আচরণ উত্তেজিত করে তুলছে দায়ানের স্নায়ুকে। তবে ভাই কী রকম মেজাজী জানে বলে কোনও প্রশ্ন করতে দ্বিধায় ভুগছে।

'মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছ তুমি,' ভাইকে মুখ খোলার সুযোগ দিয়ে বলল ও। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে বেশ জমিয়ে ফেলেছ, তাই না?'

'আছি একরকম,' বলে আবার ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির পিছনদিকটা দেখে নিল যোসেফ।

'এত বছর পর আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগছে,' বলল দায়ান, নিজেও জানে না কথাটার মধ্যে কতটুকু আন্তরিকতা আছে। 'তা হঠাৎ এদিকটায় কী মনে করে?' জিজ্ঞেস করল, যোসেফের মনে কী চলছে জানা দরকার ওর। ভাইকে ইতস্তত করতে দেখে দায়ান সন্দেহ করল, কিছু বানিয়ে বলবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও।

একটু কেশে নিয়ে অবশেষে যোসেফ বলল, 'ভাবলাম হাওয়া বদল করলে স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল হবে।' সিটে নড়েচড়ে বসল। 'সামারে লস অ্যাঞ্জেলেসে গরমটাও পড়ে খুব বেশি।' দূর আকাশের গায়ে এবড়োখেবড়ো রেখার মত দেখাচ্ছে সারি সারি পাহাড় চূড়াগুলোকে, সেগুলোর দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। যেদিকেই চোখ ঘোরাচ্ছে, পাহাড় আর পাহাড়। চূড়াগুলোয় বরফ জমে আছে, তাতে লেগে প্রতিফলিত রোদ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। 'বড় নির্জন জায়গা, তাই না?' নরম সুরে বলল ও, এই প্রথম ওর চেহারায় স্বস্তির একটা ভাব দেখা গেল।

'হ্যাঁ, নিরিবিলি,' বলল দায়ান। 'তবে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসে একঘেয়ে লাগবে তোমার। আমার ওখান থেকে সবচেয়ে কাছের রানশ্‌টা বিশ মাইল দূরে। অনেক সময় মাস পেরিয়ে যায়, কারও সঙ্গে দেখা হয় না।'

'কোনও অসুবিধে নেই, আমার জন্যে ভালই হবে সেটা,'

বলল যোসেফ। 'আমি বিশ্রাম নিতে এসেছি।' শরীরটাকে মুচড়ে আবার পিছনে তাকাল। সরলরেখার মত লম্বা রাস্তায় কিছুই নেই। সন্তুষ্ট দেখাল ওকে। 'হ্যাঁ, আমি খাপ খাইয়ে নিতে পারব।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল কিছু, তারপর বলল, 'তবে সব সময় এই পরিবেশ আমার ভাল লাগবে না। একা তুমি থাকো কীভাবে? তোমার অস্থির লাগে না?'

মাথা নাড়ল দায়ান। 'মানিয়ে নিয়েছি,' বলল দায়ান। 'বাবা বলত, নিরিবিলি রানশই সবচেয়ে ভাল। আমারও এটাই পছন্দ। তবে হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে নিঃসঙ্গ লাগে বইকি। কিন্তু রান্‌শের কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় বলে কেটে যায় সময়।'

'কজন তোমরা?'

'মানে?'

'মানে, রান্‌শের কাজে কজন তোমাকে সাহায্য করে?'

'সব কাজ একা করি আমি,' গর্বের সঙ্গে বলল দায়ান। 'শুধু ফসল কাটার সময় লেবার ভাড়া করে আনি।'

'গুড বয়,' বলল যোসেফ, এই প্রথম ওকে হাসতে দেখল দায়ান। তারপর হাসি থামিয়ে ওর দিকে তীক্ষ্ণ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আশপাশে মেয়ে-টেয়ে আছে?'

দায়ানের মুখটা গরম হয়ে উঠল। 'আমার ঠিক জানা নেই,' সামনের দিকে চোখ রেখে বলল ও, মনে পড়ল লম্পট হিসাবে কী রকম কুখ্যাতি ছিল যোসেফের।

'জানি তোমার রক্ত চিরকালই বরফ,' বলল যোসেফ, হ্যাটটা মাথার পিছনদিকে একটু ঠেলে দিল। 'তাই বলে আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বলো, বছরের পর বছর মেয়েমানুষ ছাড়া চলতে পারছ তুমি?'

'এখানে আমি মাত্র এক বছর হলো আছি, এই সময়টায় কাজ ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাইনি,' একটু বিরক্ত হয়ে বলল দায়ান।

'হুম। দেখা যাচ্ছে সঙ্গে করে একটা না এনে ভুলই করেছি,' বলল যোসেফ। 'ভেবেছিলাম তোমার কাছে ভাল সাপ্লাই পাব।'

সামনে রাস্তাটার দুটো শাখা গজিয়েছে, ডান ও বাম দিকে। 'আমরা ডান দিকে যাব,' প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল দায়ান। 'বাঁয়ে গেলে রাউন্ডভেল পড়বে, তারপর পাহাড় আর উপত্যকা। ওই রুটে প্রচুর ট্রাফিক দেখতে পাবে। অরিগান থেকে যত ট্রাক আসে সব ওই রাউন্ডভেল রোড ব্যবহার করে। এই রুটটা আমাদেরকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাবে।'

'ওদিকে যেন একটা ভাঙা ট্রাক পড়ে আছে,' হঠাৎ বলল যোসেফ, হাত তুলে দেখাল।

যোসেফের তাক করা আঙুল অনুসরণ করে তাকাল দায়ান, ব্রেক পেডালে চাপ দিয়ে দাঁড় করাল টয়োটা ভ্যান। জানালা দিয়ে মাথা বের করে পাহাড়ের ঢালু গায়ে চোখ বুলাল। রাস্তাটা দু'হাজার ফুট উপরে উঠে রাউন্ডভেল রোডে পৌঁছেছে।

ওটা যে ভাঙা একটা ট্রাক তাতে কোনও সন্দেহ নেই, একজোড়া পাইনগাছের মাঝখানে উল্টে পড়ে আছে।

'বোকার মত থামলে কেন?' জানতে চাইল যোসেফ, চোখে-মুখে অস্বস্তি। 'ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট আগে দেখোনি কোনদিন?'

'দেখেছি বইকি,' বলল দায়ান। 'একটু বেশিই দেখেছি।' দরজা খুলে রাস্তায় নামল ও। 'সেজন্যেই খোঁজ নেয়া দরকার কেউ আহত হয়ে পড়ে আছে কি না। কাল রাতে যেরকম ঝড়-বৃষ্টি গেছে, বেচারা হয়তো কারও নজরেই পড়েনি।'

'একেবারে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, অ্যাঁ?' কর্কশস্বরে বিদ্রূপ করল যোসেফ। 'ঠিক আছে, চলো আমিও তা হলে তোমার সঙ্গে যাই—পা দুটোয় মরচে ধরে যাচ্ছে।'

ঘন ঘাসে ঢাকা খাড়া ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা উঠতে হলো ওদেরকে, প্রচুর ভাঙা পাথরের টুকরো টপকাতে হলো, তারপর ট্রাকটার কাছে পৌঁছাল ওরা।

ওল্টানো ট্রাকের ভাঙা জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল দায়ান। কয়েক ফুট দূরে, ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে যোসেফ; চড়াই বেয়ে উঠতে হওয়ায় হাঁপিয়ে গেছে।

'এসো, যোসেফ,' ডাকল দায়ান। 'একটু সাহায্য করো। ড্রাইভার ছাড়াও একটা মেয়ে পড়ে আছে এখানে। দেখে মনে হচ্ছে দুজনেই মারা গেছে, তবে শিওর হতে চাই আমি।' ক্যাবের ভিতর মাথা গলাল ও, লোকটার হাত ধরল—ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে। মুখ কালো করে ছেড়ে দিল ওটা। 'ড্রাইভার বেঁচে নেই।'

'তোমাকে তো বলেইছি কী দেখতে পাবে,' বলল যোসেফ। 'এবার চলো, এই নরক থেকে পালাই।' যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কোনও রকম আড়াল ছাড়াই মাইলের পর মাইল রাস্তার বিস্তৃতি দেখতে পাচ্ছে ও। সম্পূর্ণ খালি, কোথাও কিছু নড়ছে না। স্বস্তি বোধটা ফিরে এল মনে, ভাবল এখানে তার নিরাপত্তার কোনও অভাব হওয়ার কথা নয়।

হাতটা আরও লম্বা করে দিয়ে মেয়েটির কবজি ধরল দায়ান, ড্রাইভারের পাশেই নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। এর হাতটা গরম লাগছে। 'এই, যোসেফ! মনে হচ্ছে, মেয়েটা বেঁচে আছে! যেয়ো না, এসো দুজনে ধরে বের করি ওকে।'

বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল যোসেফ, ক্যাবের কাছে এসে দায়ানের কাঁধের উপর দিয়ে ভিতরে তাকাল। 'তো শুরু করো,' তাগাদা দিয়ে বলল ও, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার দেখে নিল নীচের রাস্তাটা। 'নাকি সারাটা দিন এখানেই কাটাতে চাও?'

ক্যাবের ভিতর ঢুকে অজ্ঞান মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলল দায়ান। ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বের করে যোসেফের হাতে তুলে দিল, যতটা সাবধানে পারা যায়।

মেয়েটিকে ক্যাবের পাশে মাটিতে নামিয়ে রাখবার সময় নিহত ড্রাইভারের দিকে চোখ পড়ল যোসেফের। 'ওহ্, গড!

লোকটার মুখের দিকে তাকাও একবার!'

'বেচারাকে যেন কোনও বুনো বিড়াল নখ দিয়ে আঁচড়েছে,' বলল দায়ান, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ক্যাব থেকে।

অলিভার একটা হাত ধরে একটু উঁচু করল যোসেফ। 'এই হলো তোমার বুনো বিড়াল,' বলল ও। 'এর নখের ভেতরে রক্ত আর চামড়া রয়েছে। বিড়াল নয়, আমি বলব বাঘিনী। কি হয়েছিল কল্পনা করতে পার?'

'কী?'

'লোকটা ওর গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করছিল, খেপে গিয়ে তার মুখ খামচে দিয়েছে মেয়েটা,' বলল যোসেফ। 'চোখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দেয়ায় কানা হয়ে যায় ড্রাইভার, ট্রাকটা রাস্তা থেকে খসে পড়ে এখানে।' অলিভাকে ধরে সিধে করল ও। 'রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে, কি বলো? বাজি ধরে বলতে পারি ড্রাইভার ভেবেছিল কোনও মডেল কিংবা সেলিব্রেটিকে লিফট দিচ্ছে সে, এই সুযোগ জীবনে আর কখনও পাবে না। আসলে নির্ঘাত একটা বেশ্যা, তা না হলে দুর্যোগের রাতে একা কেউ বাইরে বেরোয়! তা-ও আবার ব্যাটাছেলের ট্রেঞ্চকোট পরে!'

'ওর মাথার পিছনে মারাত্মক একটা ক্ষত আছে,' বলল দায়ান। 'এখনই কিছু একটা করতে হবে।'

'ভুলে যাও,' বলল যোসেফ, হঠাৎ ওর গলায় কর্কশ একটা সুর চলে এসেছে। 'আমরা ওকে এখানেই রেখে যাব। জ্ঞান ফিরে এলে নিজের পথ নিজেই চিনে নেবে। কিংবা কেউ একজন দেখতে পেয়ে খুশি মনে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া, একটা বাঘিনীর সঙ্গে আমরা জড়াতে চাই না।'

যোসেফের দিকে তাকিয়ে থাকল দায়ান। 'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণসুরে বলল ও, 'কাউকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায়?'

'সেক্ষেত্রে নীচে নামিয়ে রাস্তার ধারে রেখে গেলেই হয়,' বলল যোসেফ। 'কেউ না কেউ এদিকে আসবেই, সে-ই দেখতে পেয়ে

একটা ব্যবস্থা করবে। মোটকথা, এই ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে আমি জড়াব না।'

'ওর চিকিৎসা দরকার, হাসপাতালে নিতে হবে,' শান্ত, অথচ দৃঢ়স্বরে বলল দায়ান। 'আমার রান্‌শ্‌ আর এই জায়গার মাঝখানে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে ওকে রেখে যেতে পারি। ওকে আমার বাড়িতেই তুলব, তারপর খবর দেব ডাক্তার বেনেট-কে। এতে তোমার আপত্তির কী আছে আমি বুঝছি না।'

রাগ চেপে রাখতে হওয়ায় যোসেফের চেহারা কুৎসিত হয়ে উঠল। 'আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না,' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'বেশিদিন পাহাড়ে থাকলে আর সবার যা হয় তোমারও তা-ই হয়েছে—মেয়েমানুষ দেখে পাগল হয়ে গেছ।'

লাফ দিয়ে সিধে হলো দায়ান। ভাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। তারপর কী ভেবে নিঃশব্দে একটু তিক্ত হাসল ও, বলল, 'দেখা যাচ্ছে খুব একটা বদলাওনি তুমি। মানে, বড় হওনি এখনও—সেই স্কুলবয়ই রয়ে গেছ।' ঘুরে মেয়েটার দিকে ঝুঁকল ও, অসাড় হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখছে কোথাও কোনও হাড় ভেঙেছে কি না; এই সময় গুঙিয়ে উঠল অলিভা।

'শুধু নেড়েচেড়ে কী লাভ,' কুৎসিত হাসির সঙ্গে বলল যোসেফ, 'আমি না হয় ঘুরে দাঁড়াচ্ছি—কিছু করতে হলে শুরু করে দাও।'

ওর কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করল দায়ান, যদিও ওর ঘাড়ের পিছনটা লাল হয়ে উঠল। অলিভার পালস্‌ দেখছে ও। আঙুলের নীচে লাফাচ্ছে শিরাটা। লক্ষ করল মুখের রঙও ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

'এখনও সময় আছে, দায়ান,' আবার বলল যোসেফ। 'নিজের ভাল চাও তো বেশ্যাটাকে এখানে ফেলে রেখে যাও। তা না হলে কিন্তু তোমার কপালে দুঃখ আছে, এই বলে রাখলাম।'

'ইশ্‌শ্‌, চুপ করো তো!' ভাইকে ধমক দিয়ে অলিভাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল দায়ান।

'ঠিক আছে,' প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলল যোসেফ, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবে, পরে কিন্তু বলো না যে তোমাকে আমি সাবধান করিনি! আমার মন বলছে, মারাত্মক কোনও বিপদ ডেকে আনবে ওই মেয়ে। কিন্তু তা নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাতে যাই! সেটা তোমার মাথাব্যথা।'

ভাইকে পাশ কাটিয়ে ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল দায়ান।

নয়

মডেস্টো শহরের পুবে, তেরো হাজার একশ' তেতাল্লিশ ফুট উঁচু 'বাউন্ডারি পিক' থেকে খুব বেশি দূরে নয়, চার পাহাড়ের মাঝখানে বড়সড় একটা উপত্যকায় দায়ান'স রানশ্‌। সি লেভেল থেকে আট হাজার ফুট উপরে জায়গাটা। গোটা এলাকার নাম ব্ল্যাক পিলারস।

বিশাল ব্ল্যাক পিলারস, কয়েক হাজার একর জমি ও বনভুমি সহ, পানির দরে কিনে নিয়েছে দায়ান। তবে রান্‌শ্‌টা শুরু করেছে অল্প একটু জায়গা নিয়ে। বাবা ছিলেন রান্‌শ্‌ মালিক, ছোটবেলায় লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ পাশে পাশে থেকেছে বাবার, তাঁকে কাজ করতে দেখেছে; সে-সব মনে আছে কি না যাচাই করবার জন্য যা করবার একাই করছে ও। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর লোকজন নিয়ে বাড়াবে রানশের পরিসর।

হাইওয়ে থেকে দায়ান'স রান্‌শ্‌-এ পৌঁছাতে হলে সরু একটা

কাঁচা শাখা-পথ ধরতে হবে। বড় বড় বোল্ডার আর পাইনগাছের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে পাঁচ কি ছয় মাইল এগিয়েছে ওটা, তারপর বাঁক নিয়ে চলে এসেছে দায়ানের লম্বা কেবিনের পাশে। কেবিনটা একটা লেকের ধারে, ওটার টলটলে নীল পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ। বড় বড় মাছ খেলে বেড়ায়—ওপর থেকে দেখা যায় পরিষ্কার। খাওয়ার লোক বলতে একা শুধু দায়ান ।

বছরকয়েক লস অ্যাঞ্জেলেসে, একটা বিমা কোম্পানিতে চাকরি করে খুব নাম করেছিল, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, বাবার মত রান্‌শ্‌ করবে। ব্যাঙ্কে জমা টাকা ছিল, সহজ কিস্তিতে বিরাট অঙ্কের লোনও পেয়ে যায় সৎ বলে খ্যাতি থাকার সুবাদে—চার পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকাটা একদিন দেখতে পেয়ে মনে ধরে যায়, দু'দিন পরেই জায়গাটা লিজ নিয়ে ফার্মিং শুরু করেছে। রান্‌শ্‌টা এখনও শিশু হলেও, দায়ান আশা করছে আগামী বছরই বেশ অনেকটা বড় করে ফেলবে, তখন স্থায়ী লেবার রাখবে।

এখানে ওর সমস্যা একটাই, নিঃসঙ্গতা। গরু আর কুকুর ছাড়া কথা বলবার মত অন্য কেউ নেই। যোসেফের আগমন এই সমস্যার সমাধান দিতে পারত, কিন্তু দায়ান দ্রুতই বুঝে নিয়েছে যে ভাইটি ওকে সঙ্গ দেওয়ার বদলে ঝামেলা পাকাতেই বেশি সময় ব্যয় করবে। এরইমধ্যে তার এই হঠাৎ আগমন ভাল চোখে দেখছে না ও।

একটিও কথা না বলে বাঁকা চোখে কেবিনটা একবার দেখল যোসেফ, তারপর লেকের দিকে হাঁটা ধরল। কাঁধে অচেতন অলিভাকে নিয়ে কেবিনে ঢুকল দায়ান। ওর গায়ের ট্রেঞ্চকোটটা খুলে গাড়িতে রেখে এসেছে।

কিন্তু যেইমাত্র দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল ছোটভাই, অমনি দিক বদলে হন হন করে টয়োটা ভ্যানটার দিকে এগোল যোসেফ। সতর্ক চোরের দৃষ্টিতে চট্‌ করে কেবিনের দিকটা দেখে নিল একবার, তারপর ভ্যানের সামনের হুডটা তুলল, ক্যাচ স্প্রিং

সরিয়ে খুলে নিল ডিসট্রিবিউটর ক্যাপটা। নিঃশব্দে বন্ধ করল হুড, পকেটে ভরল ওটা, তারপর চুপিসারে উঠে এল চওড়া বারান্দায়।

ওখানে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল, কান পেতে শুনল কেবিনের ভিতর হাঁটা-চলা করছে দায়ান। তারপর অন্য একটা দরজা দিয়ে বড়সড় লিভিং রুমে ঢুকল ও। চোখ বুলিয়ে ফার্নিচারগুলো দেখল, তারপর হেঁটে চলে এল গান-র‍্যাকের সামনে।

লোহার বার, কবজা আর ঝুলন্ত তালা দেখতে পেয়ে চট্ করে তালা মেরে দিল গান-র‍্যাকে। এবার র‍্যাকের ভিতরে নিরাপদে থাকবে অস্ত্রগুলো। খুশি মনে চাবিটা পকেটে ভরল যোসেফ।

এক মুহূর্ত পর লিভিং রুমে ঢুকল দায়ান।

'তোমার গার্লফ্রেন্ডকে বিছানায় শুইয়েছ?' দেঁতো হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল যোসেফ। 'খুব জলদি সেরেছ দেখছি কাজটা!'

'এ-সব বন্ধ করো তো, যোসেফ,' একটু কঠিন সুরে বলল দায়ান। 'আমি পছন্দ করি না, কাজেই...'

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল যোসেফ, এখনও হাসছে। 'সেটা তো ভাল লক্ষণ নয়, দায়ান।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাল একটা।

'তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো?' জানতে চাইল দায়ান। 'দেখা হবার পর থেকে উদ্ভট আচরণ করছ কেন তুমি?'

'লক্ষণ হিসেবে সেটাও ভাল নয়,' বলল যোসেফ।

কাঁধ ঝাঁকাল দায়ান। 'আমি ডাক্তার বেনেটের কাছে যাচ্ছি,' বলল ও। 'যেতে-আসতে দু'ঘণ্টার মত লাগবে। মেয়েটার ওপর তোমার একটু নজর রাখতে হবে। রাখবে তো? আমার ধারণা, ওর জখমটা মাথায়। তবে আমি না ফেরা পর্যন্ত ভালই থাকবে ও।'

'রাজকন্যাকে তুমি উদ্ধার করেছ, এখন তার ওপর নজর রাখার মত সম্মানজনক দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে আমাকে...কী করতে

হবে আমার শোনা যাক। ওর হাত ধরে থাকব, মাথা থেকে টুপি খুলে বাতাস করব?'

'এটা কৌতুক করার মত কোনও বিষয় নয়,' ঠাণ্ডা সুরে বলল দায়ান, মেজাজটা অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। 'ডাক্তারকে তাঁর গাড়ি নিয়ে আসতে বলব, প্রয়োজন হলে এখান থেকে ওকে যাতে নিয়ে যেতে পারেন। তবে যতক্ষণ ও এখানে আছে, দয়া করে তুমি একটু সাহায্য করো।'

'শিওর,' বলল যোসেফ, সেই দেঁতো হাসিটা লেগে আছে মুখে। 'তুমি বেরিয়ে পড়ো। কথা দিচ্ছি ওকে আমি হাসি-খুশি রাখব। মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে।'

ওর দিকে একবার কড়া দৃষ্টিতে তাকাল দায়ান, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে তাকিয়ে যোসেফ দেখল ছোটভাই উঠানে নেমে ভ্যানের দিকে এগোল, তারপর ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। আপনমনে হেসে উঠল সে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে গাড়ি থেকে নামল দায়ান, সামনের হুড খুলে পরীক্ষা করছে কোথায় কী হয়েছে।

একটু পর যোসেফ দেখল হন হন করে বারান্দার দিকে ফিরে আসছে দায়ান। হাসি মুখে সে-ও বারান্দায় বেরুল।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল দায়ান, বলল, 'তুমি ডিসট্রিবিউটর ক্যাপটা খুলে নিয়েছ।'

'নিয়েছি,' বলল যোসেফ, হাসিটা থামছে না। 'তাতে কী?'

নিজেকে স্থির রাখল দায়ান, হাত পাতল। 'দাও ওটা।'

'যদি না দিই?' যেন কৌতুক করছে যোসেফ। 'ধরো, ওটা আমার কাছেই থাকবে।'

'কেন?'

'বেশ্যাটাকে রেখে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনোনি, তাই।' এখন আর হাসছে না যোসেফ।

'আরেকটা কথা। যতক্ষণ আমি এখানে আছি, বাইরের কাউকে রান্‌শে ঢুকতে দেয়া যাবে না—ডাক্তার-ফাক্তার কাউকে না; আমি অনুমতি না দিলে এখান থেকে কেউ বাইরে কোথাও যেতেও পারবে না।'

মুঠো পাকাল দায়ান। 'শোনো, যোসেফ, তোমার মাথায় কী চলছে আমি জানি না, তবে আমার সঙ্গে লেগে তুমি কোনদিন সুবিধে করতে পারোনি, এখনও পারবে না। ডিসট্রিবিউটর ক্যাপটা দাও, তা না হলে আমি কিন্তু জোর খাটাতে বাধ্য হব।'

'তাই?' বলে পিছু হটল যোসেফ। 'তা হলে শোনা যাক এটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা...' হঠাৎ ওর হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে—কুৎসিতদর্শন ভোঁতা একটা .৩৮ অটোমেটিক। 'এখনও মাথায় আইডিয়া গজাচ্ছে, লিট্‌ল্ ব্রাদার?' ভাইয়ের বুকে লক্ষ্যস্থির করছে। 'এসো, দেখি, কেমন তুমি জোর খাটাতে পারো।'

পিছু হটল দায়ানও, মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠেছে। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ! পিস্তলটা রেখে দাও।'

'এবার তা হলে তোমাকে সব কথা বলতে হয়,' কর্কশস্বরে ফিসফিস করল যোসেফ। 'ভাই-টাই কিছু না, আমার কাছে তুমি একটা গেঁয়ো ভূত। আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে তোমাকে কিছু করতে দেখলে স্রেফ ফুটো করে দেব হৃৎপিণ্ডটা।' পাশে হেঁটে বারান্দার রেইলিঙে হেলান দিল, পিস্তলটা আলগাভাবে ধরে আছে।

নিজের জায়গায় অটল দাঁড়িয়ে থাকল দায়ান।

'এতক্ষণে ব্যাপারটা নিশ্চয় ধরতে পেরেছ,' আবার শুরু করল যোসেফ। 'হ্যাঁ, কঠিন একটা জ্যামের মধ্যে পড়েছি আমি। আর সেজন্যেই বাধ্য হয়ে তোমার এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। লুকানোর জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। এখানে আমাকে খোঁজার কথা কারও মাথায় আসবে না।'

'তোমাকে কেউ খুঁজছে? কেন? কী করেছ তুমি?'

'ধীরে, বৎস, ধীরে!' বলল যোসেফ। 'একসঙ্গে এত কৌতূহল ভাল নয়। তো, যা বলছিলাম—ডাক্তার বেনেট বা আর কেউ এখানে আসছে না, কারণ আমি চাই না কেউ জানুক আমি এখানে আছি। আমার কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বেশ্যাটাকে নিয়ে এখানেই থাকবে তুমি। কোনও রকম চালাকি করতে দেখলে ভাই বলে তোমাকে আমি একচুল ছাড় দেব না। ভাল কথা, পিস্তলে আমার হাত এখন খুবই ভাল। কথাটা সত্যি কি না জানতে চেষ্টা করে অনেক কুখ্যাত পিস্তলবাজ অকালে মারা গেছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে দায়ান, তবে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে ওর ভাই সত্যিই সিরিয়াস। 'কিন্তু, যোসেফ, এ তো স্রেফ পাগলামি,' বলল ও। 'মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে ডাক্তার আমাকে ডাকতেই হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করো দেখি, তারপর ডিসট্রিবিটর ক্যাপটা দাও, আমি বেরিয়ে পড়ি।'

'এখনও বুঝতে রাজি নও?' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল যোসেফ। 'তা হলে শোনো: বয়েড ব্লুমফিল্ড-এর হয়ে কাজ করছিলাম আমি। এর মানে বোঝো?'

পত্রিকায় মাফিয়া ডন বয়েড ব্লুমফিল্ড সম্পর্কে পড়েছে দায়ান। জনি ডিলিঞ্জার-এর আধুনিক সংস্করণ বলা হয় ওকে; নিউ ইয়র্কে যত লুটপাটের ঘটনা ঘটে, প্রায় সবগুলোর পিছনেই ওর হাত থাকে। 'কী বলছ তুমি!' জিজ্ঞেস করল ও। 'বয়েড ব্লুমফিল্ড একজন খুনী...পুলিশ তাকে খুঁজছে!'

হেসে উঠল যোসেফ। 'গত একটা বছর আমার কাজ ছিল ওর হয়ে ব্যাঙ্ক খালি করা,' বলল ও। 'প্রচুর কামিয়েছি। ডন বয়েড ব্লুমফিল্ডের বডিগার্ডও ছিলাম। তাতেও ভাল টাকা পেয়েছি।'

'তা হলে এই ব্যাপার,' বলল দায়ান, বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে মনটা। 'আমার বোঝা উচিত ছিল কোনও ক্রাইম সিন্ডিকেটেই

যোগ দেবে তুমি। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, যোসেফ, তুমি খুব দুর্বল—আর সেজন্যেই বোধহয় সবকিছুতে জোর খাটাতে চেষ্টা করো।'

হাতের পিস্তলটা শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল যোসেফ। 'জোর খাটাই আর যা-ই করি, আখের গুছিয়ে নিয়েছি আমি,' বলল ও। 'আপাতত হয়তো একটু ঝামেলার মধ্যে আছি, তবে এ-ও কেটে যাবে। তখন জমা টাকা দু'হাতে খরচ করব। আমি তোমার মত না যে, চারপাশে পাথরের পাঁচিল তুলে নিজেকে বন্দি করে ফেলব। জীবনটাকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়, তা জানা আছে আমার।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোচ্ছে দায়ান। 'পিস্তলটা দাও, আপাতত আমার কাছে থাকুক,' শান্তসুরে বলল ও।

নিঃশব্দে হাসল যোসেফ। অকস্মাৎ ক্ষিপ্রবেগে হোলস্টারের দিকে উঠে গেল ওর একটা হাত, পরমুহূর্তে ঝলসে উঠল খানিকটা শিখা। গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ লেকের ওপার থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। গুঞ্জন তুলে কী যেন চলে গেছে দায়ানের কানের পাশ দিয়ে।

'এরকম অনায়াসে তোমার খুলিটা ফুটো করে দিতে পারি আমি,' বলল যোসেফ, 'যখন খুশি। আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছ দেখলে করবও ঠিক তা-ই। কাজেই সাবধান।' কাঁধের ধাক্কায় দায়ানকে সরিয়ে দিয়ে লিভিং রুমে ঢুকল ও, তারপর একটা ইজি চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে দিল সামনে।

বারান্দায় রোদের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দায়ান, কী করবে চিন্তা করছে। এখনও ওর বিশ্বাস হচ্ছে না, মুখে যা বলছে কাজেও তা-ই করবে যোসেফ। তবে ওর চিন্তা নিজেকে নিয়ে নয়, বিছানায় শুয়ে থাকা আহত মেয়েটিকে নিয়ে।

ডাক্তার বেনেটকে যখন আনা যাচ্ছে না, দেখতে হবে ওর কিছু করবার আছে কি না। ভাগ্যিস কেবিনে একটা ফার্স্ট-এইড

বক্স আছে, ওটা সে ব্যবহার করতেও জানে।

লিভিং রুমের ভিতর দিয়ে নিজের বেডরুমে যাচ্ছে দায়ান, ভারী গলায় যোসেফ বলল, 'আর শোনো, তোমার গান-র‍্যাকে তালা মেরে দিয়েছি, চাবিটা আমার কাছে। এখন থেকে এখানে একা শুধু আমি গুলি ছুঁড়ব।'

'জানি, অতি নীচে নেমে গেছ তুমি,' চলতে চলতেই ভাইকে বলল দায়ান। 'কিন্তু তবু তুমি আমার ভাই, কাজেই বিশ্বাস করি না সত্যি সত্যি তুমি আমাকে গুলি করবে।'

চেহারাটা আরও কঠিন হলো যোসেফের, তবে কিছু বলল না।

বেডরুমে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল দায়ান। অলিভার মাথার পিছনের ক্ষতটা পরীক্ষা করল সময় নিয়ে। তারপর কিচেন থেকে মেডিকেল কিট, এক গামলা গরম পানি আর তোয়ালে নিয়ে এল।

শেষ সেফটি-পিনটা জায়গামত লাগাচ্ছে, এই সময় জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ মেলল অলিভা।

'হ্যালো,' হাসিমুখে বলল দায়ান। 'এখন একটু ভাল লাগছে?'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভা, তারপর নিজের অজান্তেই মাথায় উঠে গেল একটা হাত। 'মাথাটা খুব ব্যথা করছে,' বলল ও। 'কী হয়েছে? আমি কোথায়?'

'তোমাকে আমি পাহাড়ি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এখানে নিয়ে এসেছি। একটা ট্রাকে ছিলে তুমি, সেটা পাহাড় থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল। চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় চোট পেয়েছ, তবে সেটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।'

'ট্রাক?' বিড়বিড় করল অলিভা, চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'কোন্ ট্রাক? মনে পড়ছে না কেন...' হঠাৎ আতঙ্কিত দেখাল ওকে, অস্থিরতার সঙ্গে উঠে বসতে গেল , তবে নরম হাতে ধরে আবার ওকে শুইয়ে দিল দায়ান। 'আমি কিছু মনে করতে পারছি না।

কিছু ভাবতে পারছি না। আমার মাথায় কিছু হয়েছে!'

'ও কিছু নয়,' অভয় দিয়ে বলল দায়ান। 'বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। আবার দেখে যাব আমি, এখন তুমি ঘুমাতে চেষ্টা করো।'

'কিন্তু আমি জানি না কেন, কী হয়েছে আমার?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল অলিভা। 'আমি কিছু মনে করতে পারছি না কেন?' দায়ানের হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেলল। 'আমার ভয় করছে! মনে পড়ছে না আমি কে, আমার নাম কী...'

'বড় একটা ধাক্কা লাগলে এরকম হয়, আবার সব ঠিকও হয়ে যায়,' আশ্বাস দিয়ে বলল দায়ান। 'অস্থিরতায় ভুগলে আর দুশ্চিন্তা করলে সুস্থ হয়ে উঠতে সমস্যা দেখা দেবে। আবার ঘুম ভাঙলে দেখবে সব তুমি মনে করতে পারছ।'

চোখ বুজল অলিভা। 'তোমার মনটা খুব নরম,' মৃদু গলায় বলল ও। 'তুমি খুব ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে থাকো, কেমন? প্লিজ, আমাকে একা রেখে কোথাও যেয়ো না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল দায়ান। 'তুমি শুধু মনটাকে শান্ত রাখো।'

কয়েক মুহূর্ত কাঠ হয়ে পড়ে থাকল অলিভা, তারপর নেতিয়ে পড়ল, আবার জ্ঞান হারিয়ে তলিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে।

পাশের কামরা। ইজি চেয়ার ছেড়ে একটা আর্মচেয়ারে বসেছে যোসেফ, কপালে চিন্তার রেখা। ভাবছে, অজ্ঞান মেয়েটা ঘাড়ে এসে না চাপলে ছোটভাইকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখতে পারত সে। এখন যেহেতু সব জানে ও, চোখ-কান খোলা রেখে খুব সাবধানে থাকতে হবে তাকে। দায়ান যে অত্যন্ত কঠিন পাত্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই, অসতর্ক মুহূর্তে একবার তাকে যদি পেয়ে যায় ও, তার কোনও আশা নেই।

দরজার কাছে আকস্মিক একটা নড়াচড়া শুরু হতেই লাফ

দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, পিস্তলের বাঁটে পৌঁছে গেছে হাত। বিরাট একটা কুকুর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল, খুশিতে লেজ নাড়ছে।

'শালা পাঙ্ক!' নার্ভাস একটু শব্দ করে হেসে উঠল যোসেফ। 'দিয়েছিলি তো আত্মাটাকে উড়িয়ে।'

জুতোর ডগা দিয়ে পাঁজরে খোঁচা মেরে কুকুরটাকে দূরে সরিয়ে দিল ও। ওর দিকে আহত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর প্যাসেজ ধরে এগোল ওটা, মনিবকে খুঁজছে।

নতুন একটা সমস্যা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে দায়ান, এই সময় দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিল কুকুরটা। এই মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, এভাবে মেয়েটিকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারবে না ও। পরনের ভেজা কাপড়ে রক্ত, কাদা ইত্যাদি লেগে রয়েছে; ওগুলো না খুললে কোথায় কী ক্ষত আছে জানা যাবে না, ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিউমোনিয়া বাধাবার পথও প্রশস্ত করা হবে।

কিন্তু তরুণী একটা মেয়েকে বিবস্ত্রই বা করে কীভাবে ও! অথচ আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। সবচেয়ে কাছের মহিলাটি বাস করে ত্রিশ মাইল দূরে।

বেডরুমে ঢুকে কুকুরটা ওর টেনশন আর বিব্রত ভাব দূর করে দিল। 'হাই, মিস্টার,' বলল ও। 'খুব একটা গোলমেলে সময়ে পৌঁছেছ, হে...'

স্বাস্থ্যবান কুকুর, শক্তিশালী, বেশ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অলিভাকে।

'যাও তো, ভাগো এখন, মিস্টার। কাজ আছে আমার,' বলল দায়ান।

বিছানায় পড়ে থাকা অলিভা ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাকাচ্ছেই না মিস্টার। তবে মনিবের নির্দেশ অমান্য না করে ধীরে ধীরে পিছু হটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। কাছাকাছি থাকল, বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে না কোথাও।

আলমারি খুলে খুব দামী এক জোড়া সাদা সিল্কের পা'জামা

সুট বের করল দায়ান। কোটের আস্তিনগুলো কেটে ফেলে দিল ও, চারদিকের কিনারা ভাঁজ করে টাঁক সেলাই দিল, তারপর অলিভার মাপ নিয়ে ছোট করল পা'জামাটাও।

'এবার প্র্যাকটিকাল ক্লাস,' বিড়বিড় করল দায়ান, মনে মনে প্রার্থনা করছে—যিশু, ওর যেন জ্ঞান না ফেরে! অলিভার ড্রেস থেকে হুকগুলো খুলে নিচ্ছে ও। একটা আস্তিনে রুমাল পাওয়া গেল, এক কোণে এমব্রয়ডারি করা—অলিভা। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রুমালটা। অলিভা। অলিভা কী? কে এই মেয়ে? কোত্থেকে আসছিল?

আচ্ছা, সত্যি সত্যি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেনি তো? বলছে কী হয়েছে জানে না, চিনতে পারছে না নিজেকে। সব যদি আবার মনে না পড়ে তা হলে তো বিপদের কথা। অলিভার দিকে ভাল করে তাকাল দায়ান।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ফিগার। অপরূপ সুন্দরী। চেহারায় মার্জিত ভাবটুকু এত স্পষ্ট, অন্ধ ছাড়া সবার চোখে পড়বে। লিফট চাওয়ার জন্য হাত তুলে ট্রাক থামাবার মেয়ে নয় এ। এ-সবের পিছনে নিশ্চয়ই গভীর কোনও রহস্য আছে।

অলিভার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল দায়ান। তারপর নরম হাতে ওকে একটু উঁচু করল, ড্রেসটা ধরে যতটা পারা যায় উপরদিকে তুলল, মাথা দিয়ে গলিয়ে সাবধানে বের করে আনছে। ড্রেসের নীচে দর্জির হাতে সেলাই করা সাধারণ, সাদামাটা একটা গারমেন্ট রয়েছে, সেটার গায়ে ফুটে থাকা নারীদেহের অনেক বৈশিষ্ট্যই ওর চোখে ধরা পড়ছে—ও যেন নগ্ন একটা মেয়ে।

দু'সেকেন্ড চোখ ফেরাতে পারল না। গলার ভিতর আঁটসাঁট একটা ভাব অনুভব করল। অলিভার সৌন্দর্য আর অসহায়ত্ব ওর মনটাকে যেমন মায়ায় ভরে দিচ্ছে, তেমনি সমস্ত স্নায়ুকে বিস্ময়ে অবশও করে ফেলছে। ওকে এভাবে দেখে বিব্রত হওয়ার অনুভূতি হারিয়ে ফেলল দায়ান—যেন জ্যান্ত কোনও মেয়েকে নয়,

অনুপম একটি শিল্পকর্ম দেখছে।

পায়ের আওয়াজ পায়নি দায়ান, জানে না ওর মত যোসেফও অলিভার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে, সে-চোখে নগ্ন লোলুপ দৃষ্টি।

আবার যোসেফও জানে না দরজার বাইরে থেকে কুকুরটা ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে।

অলিভাকে একটু তুলে পা'জামা পরাচ্ছে দায়ান।

'এত তাড়া কীসের,' বলল যোসেফ। 'ভাল করে আরেকটু দেখতে দাও। আরে বাহ্, এ তো দেখছি যা ভেবেছিলাম তারচেয়েও বহোত উমদা চিজ।'

অলিভাকে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘাড় ফেরাল দায়ান। 'গেট আউট!' কঠিন সুরে বলল ও।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল মিস্টার। অলিভাকে দেখল, তারপর যোসেফকে, এভাবে বারবার—পরিস্থিতিটা যেন বোঝার চেষ্টা করছে।

'আরে, শান্ত হও,' হেসে উঠে বলল যোসেফ, চোখ পড়ে আছে অলিভার দিকে। 'সব মজা তুমি একাই লুটবে? তোমাকে আমি সাহায্য করব। বিলিভ ইট অর নট, এ-ধরনের কাজে আমার সাংঘাতিক দক্ষতা আছে।'

ঘুরে বড় ভাইয়ের দিকে এগোল দায়ান, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। 'বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি!'

ইতস্তত করল যোসেফ, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে,' বলল ও, হাসছে। 'জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ওকে তুমি রাখতে পারো, কিন্তু তারপর আমি ওর দখল নেব।'

'কী বললে?' জিজ্ঞেস করল দায়ান, আবার এগোচ্ছে। 'আবার বলো তো দেখি।'

সরে এসে মনিবের পাশে দাঁড়াল মিস্টার।

'মেয়েদের কীভাবে সামলাতে হয় জানি আমি,' বলল

যোসেফ, কুকুরটার উপর চোখ; পিছু হটছে, ভাব দেখাল দায়ানের কথা শুনতে পায়নি। 'খামচি দিয়ে অন্তত আমার চোখ তুলে নিতে পারবে না ও। এরকম দু'একটা বাঘিনীকে আগেও পোষ মানিয়েছি আমি। আর, যদি ভেবে থাকো আমাকে তুমি বাধা দিতে পারবে, ভুল করবে। এই সুন্দরীর সঙ্গ না পেলে চলবে না আমার।' ঘুরল ও, লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল প্যাসেজে, পায়ের আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দশ

এক হপ্তা পেরিয়ে গেল।

সাতটা দিন খুব ধকল গেল দায়ানের উপর দিয়ে। একদিকে রান্‌শের রুটিন কাজ, আরেকদিকে রান্নাবান্না আর অলিভার শুশ্রূষা। তবে সেজন্য কোনও খেদ নেই ওর মনে, নেই কোনও ক্লান্তিও।

কোনও রকম সাহায্যে আসা তো দূরের কথা, ওর কাজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যোসেফ। সকাল হলেই উঁচু একটা বোল্ডারে বসে ঘন ঘন কফির অর্ডার দিয়েছে, পাহাড়ি রাস্তা আর উপত্যকার উপর তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে পার করে দিয়েছে হপ্তার প্রথম কটা দিন।

দায়ান বুঝতে পারছে কিছু একটা, কেউ একজন আতঙ্কিত করে রেখেছে ওর ভাইকে। তার বদমেজাজি ও হিংস্র হয়ে ওঠার পিছনে সেটাই প্রধান কারণ।

প্রথম তিনদিন যখন কিছুই ঘটল না, রাস্তার উপর নজর রাখার চাকরিটা ছেড়ে দিল যোসেফ। হপ্তার শেষদিকে প্রায় বন্ধুর

মত হয়ে উঠল—বদমেজাজ আর চরম স্বার্থপর প্রবৃত্তি যতটা অনুমতি দেয় আরকী। তবে এখনও নিজের গোঁ ধরে রেখেছে—ও যতদিন ব্ল্যাক পিলারস-এ আছে, রান্‌শ্‌ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না দায়ান; কাউকে আসতে দেয়াও চলবে না। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে পরিস্থিতিটা ছোটভাইকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

এখন যেহেতু অলিভা দায়ানের কামরায় থাকছে, অতিরিক্ত বেডরুমটা শেয়ার করতে হচ্ছে দুই ভাইকে। এক ঘরে ঘুমাতে হওয়ায় যোসেফের নার্ভাসনেসের আরও অনেক প্রমাণ দেখতে পেল দায়ান। প্রায় সারারাতই বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে যোসেফ, সব মিলিয়ে একঘণ্টাও ঘুমায় কি না সন্দেহ। যদি বা কখনও ঘুমায়, সামান্য একটু শব্দ হলেই চমকে উঠে বসে।

তবে অলিভা খুব দ্রুত সেরে উঠছে। কেবিনে প্রথম দুটো দিন ভয়ানক অসুস্থতার মধ্যে কেটেছে ওর, ওই সময় সারাক্ষণ পরম আত্মীয়ের মত ওর পাশে ছিল দায়ান। তবে জ্বর ছাড়ার পর ক্ষতগুলো শুকাতে শুরু করেছে, হারানো শক্তিও ফিরে পাচ্ছে দ্রুত।

কিন্তু ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টের পর অলিভার মাথা একদম খালি হয়ে গেছে। কীভাবে কী হয়েছে কিছুই মনে করতে পারছে না ও, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের কথাও বেমালুম ভুলে গেছে, জানে না ও কে।

শিশু যেমন তার মাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে, দায়ানকেও সেরকম নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে দেখছে অলিভা। দায়ানের উপর ওর অগাধ বিশ্বাস, সে বিশ্বাসে এতটুকু সন্দেহ নেই। যত দিন যাচ্ছে, ওদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে অদ্ভুত এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্পর্কটা বিহ্বল করে তুলল দায়ানকে, আর অলিভার ভিতরে জাগিয়ে তুলল গভীর আবেগ; বোঝা যায়, সেটা খুব দ্রুতই রূপান্তরিত হচ্ছে ভালবাসায়।

মেয়েদের সামনে কখনওই স্বাভাবিক হতে পারে না দায়ান।

অসুস্থ অলিভাকে মেয়েমানুষ ভাবেনি ও, মানুষ ভেবেছে; গভীর আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে ওর সেবা-যত্ন করে গেছে, মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করা ছাড়া অন্য কোনও রকম অনুভূতি জাগেনি ওর মধ্যে।

কিন্তু অলিভা যখন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে, আকারে-ইঙ্গিতে বলতে চাইছে ওকে ভালবাসে সে, কী করবে বুঝতে না পেরে দায়ান যেন অথৈই সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করল।

সুস্থ হয়ে যে-ই মাত্র দাঁড়াতে পেরেছে, দায়ানের পিছু নিয়ে পথহারা হরিণছানার মত অসহায় ভঙ্গিতে ঘরে-বাইরে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিভা। দায়ান সঙ্গে না থাকলে কিছুই ওর ভাল লাগে না। যতক্ষণ জেগে থাকে, ওর জীবনটা শুধু দায়ানকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

অলিভার মানসিক ইতিহাস জানা না থাকায় দায়ান ধরে নিয়েছে দুর্ঘটনাটা শুধু ওর সব স্মৃতিই মুছে দেয়নি, বয়স হলে যে বোধটা বর্মের মত একটা মেয়েকে রক্ষা করে সেটাকেও ভেঙে দিয়েছে, ফলে ওর মন-মানসিকতা হয়ে উঠেছে ঠিক যেন অবোধ একটা শিশুর মত।

নিজের অনুভূতির লাগাম শক্ত করে ধরে রাখছে দায়ান, অলিভার ভালবাসায় সাড়া দেওয়ার বা পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না ওর মনে। নিজেকে বোঝাচ্ছে, এই ভালবাসা মেয়েটির অসহায় নির্ভরতা থেকে তৈরি অদ্ভুত একটা ঝোঁক মাত্র, এক ধরনের অসুস্থতা, স্মৃতিশক্তি ফিরে এলে কাটিয়ে উঠবে; ফিরে যাবে তার পরিচিত নিজস্ব পরিমণ্ডলে।

তবে যোসেফ খুব দ্রুতই বুঝে নিল, অতি সহজে শিকার করা যায় অলিভাকে। সেই থেকে মাথা থেকে ওকে আর সরাতে পারছে না। জানে দায়ান ছাড়া কিছু বোঝে না অলিভা, ভুলেও একবার ওর দিকে তাকায় না, তবু ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপযুক্ত সময়-সুযোগ পাওয়া গেলে বোকা মেয়েটিকে নিজের পোষা কুকুর

বানিয়ে ফেলবে ও।

এক সকালে, লেকের ধারে একটা পাথরের উপর বসে আছে যোসেফ, দেখল পাইনবনের ভিতর দিয়ে একা ওর দিকে হেঁটে আসছে অলিভা। অমনি ভাবল, ওর মন জয় করবার এই-ই সুযোগ। কী একটা কাজে কেবিনে ব্যস্ত দায়ান, সেখান থেকে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটু এগিয়ে, অলিভার পথ আগলে দাঁড়াল যোসেফ। 'হ্যালো,' বলল ও, মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছে। ম্লান রোদে রক্তিম দেখাচ্ছে অলিভাকে, ওর রূপ-যৌবন যোসেফের হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'গরুকে খাওয়াতে,' বলল অলিভা। শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। 'এখন যাচ্ছি দায়ানের কাছে।' এক মুহূর্ত পর বলল: 'কিন্তু তুমি আমার পথ আটকে রেখেছ।'

এই সময় অলিভার পাশে এসে দাঁড়াল মিস্টার, সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে যোসেফের দিকে।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে,' বলল যোসেফ, ধীরে ধীরে অলিভার দিকে এগোচ্ছে। 'এসো, পরিচিত হই আমরা। মজার মজার গল্প করলে সব জড়তা কেটে যাবে।'

যোসেফের দিকে মিস্টারও এক পা এগোল।

'দায়ানকে খুঁজছি আমি,' আবার বলল অলিভা, যোসেফকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু বাধা দিল সে।

'দায়ানের কথা থাক। এসো, লক্ষ্মী না! তোমাকে আমার ভাল লাগে, বোকা মেয়ে। শুনলে অবাক হয়ে যাবে তোমার জন্যে কত কী করতে পারি আমি...' অলিভাকে নিজের বুকে টেনে নিল যোসেফ।

ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকল অলিভা, না বাধা দিচ্ছে, না আগ্রহ দেখাচ্ছে, না নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা

করছে—তবে চোখের দৃষ্টি এখনও কেবিনটার দিকে।

'ঘেউ!' করে প্রতিবাদ জানাল মিস্টার।

পিঠে হাতের চাপ দিয়ে অলিভাকে নিজের বুকের সঙ্গে পিষে ফেলছে যোসেফ, সেই সঙ্গে মুখ নিচু করে ওকে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করল। জ্যান্ত মানুষ নয়, এ যেন একটা ডামি। কিন্তু সেদিকে কোনও খেয়াল নেই, অলিভা বাধা দিচ্ছে না দেখে দীর্ঘ তিনমাস নারীদেহ থেকে বঞ্চিত যোসেফ নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। কল্পনার চোখে নিজেই দেখতে শুরু করেছে—পথের পাশে ঘাসের মধ্যে ফেলে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে সে।

'প্লিজ আমাকে যেতে দিন,' হঠাৎ ঠাণ্ডা, কঠিন গলায় বলল অলিভা। 'আমি দায়ানের কাছে যাব।'

'সে তো আছেই, কোথাও পালাচ্ছে না,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলে অলিভাকে ঘোরাল যোসেফ, ভাঁজ করা ডান হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাইনবনের আরও গভীরে।

এই সময় হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে কে যেন ঘোরাল যোসেফকে। দায়ানের হিংস্র চেহারাটা এক পলকের জন্য দেখতে পেল ও। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর সুযোগ পাওয়া গেল না, দায়ানের প্রচণ্ড ঘুসিটা ওর চোয়ালের হাড় যেন গুঁড়িয়ে দিল। ছিটকে ঘাসের উপর পড়ল যোসেফ, প্রায় অজ্ঞান।

'আবার যদি ওকে ছোঁও, আমি তোমার ঘাড় মটকাব,' সাবধান করে দিয়ে বলল দায়ান, একহাতে অলিভাকে জড়িয়ে ধরল। 'এসো, কেবিনে ফিরি।' যোসেফের পিস্তলটা কেড়ে নেওয়ার এ-ই সুযোগ, টের পেল দায়ান; কিন্তু আপন বড় ভাই বলে অতটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

'ওকে তুমি মারলে কেন?' জানতে চাইল অলিভা, চোখে-মুখে তৃপ্তির ভাব নিয়ে দায়ানের গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটছে। 'আমি তো কিছু মনে করিনি।'

‘আমি চাই না ও তোমাকে ভয় দেখাক,’ জবাব দিল দায়ান। চেহারায় বিমূঢ় ভাব, চট করে একবার দেখে নিল অলিভাকে।

‘আমি ভয় পাইনি। তবে ওকে আমার ভাল লাগেনি,’ বলল অলিভা। ‘তুমি যদি চাও, আমার সঙ্গে ওরকম কিছু করলে ওকে বাধা দেব আমি। কোনও সুযোগও দেব না কখনও। আমি তো আর জানতাম না।’

‘ঠিক আছে,’ বলল দায়ান, অলিভার অদ্ভুত কথাগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েছে, ‘এখন তো জানলে, আমি চাই না যোসেফ আর কখনও তোমাকে জড়িয়ে ধরুক।’

ওদেরকে চলে যেতে দেখল যোসেফ, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অলিভা বাধা না দেওয়ায় এতটাই উল্লসিত হয়ে আছে ও, প্রায় ভুলেই গেল যে দায়ানের ঘুসি খেয়ে ধরাশায়ী হতে হয়েছে ওকে। ভাবছে ও, মেয়েটাকে চুমো খেয়েছে ও! যদিও ব্যাপারটা কোনও বাচ্চাকে চুমো দেয়ার মত, বড় কথা হলো, সামান্যতম বাধা আসেনি মেয়েটির তরফ থেকে। ঠিক ওই সময় দায়ান যদি না আসত...ঠিক আছে, আবার সুযোগ আসবে—কতক্ষণ তাকে পাহারা দিয়ে রাখবে দায়ান? বিশেষ করে মেয়েটার যখন কোনও আপত্তি নেই!

রাতে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে যোসেফ, কেবিনের দরজা লাগিয়ে দিয়ে বেডরুমে ঢুকল দায়ান।

সারাটা দিন ওর কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছে যোসেফ। তবে এই মুহূর্তে আবার মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, ছোটভাই গালমন্দ শুরু করবার আগে ও-ই বরং প্রথমে মুখ খুলবে। ‘তুমি শালা এখন থেকে নিজের হাত সামলে রাখবে,’ হুমকির সুরে বলল ও। ‘ফের যদি ওরকম কিছু করো, তোমার হাত আমি ভেঙে দেব।’

‘মেয়েটিকে তুমি ছোঁবে না,’ বিছানার কিনারায় বসে বলল

দায়ান। 'একটা মানুষ এতটা নীচ, এতটা নির্লজ্জ হয় কী করে! দেখতে পাচ্ছ না, ও স্বাভাবিক নয়? মাথায় ওই বাড়িটা লাগায় মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে। বাচ্চার মত হয়ে গেছে। কাজেই ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকো, যোসেফ।'

'স্বাভাবিক হোক আর যা-ই হোক, আমার কাছে স্রেফ একটা মেয়েমানুষ ও।' নিঃশব্দে হাসছে যোসেফ। 'আর মেয়েমানুষ আমি খুব পছন্দ করি।'

'বাড়াবাড়ি করলে আমার সঙ্গে তোমার একটা শো ডাউন হবে,' বলল দায়ান, চোখ-মুখ থমথম করছে।

'হাহ্, তোমার যেন জেতার আশা আছে!' হেসে উঠল যোসেফ। 'তোমাকে মেরে ফেলতে চাইলে কে আমাকে বাধা দেবে, বলো? মাসের পর মাস কেউ তোমার খোঁজ করবে না। তার অনেক আগে এখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে চলে যাব আমি। ও-সব ভুলে পরিস্থিতিটা মেনে নাও, এখানে আমি যা চাইব তা-ই হবে।'

'বোলচাল ছাড়ো,' পা ছুঁড়ে জুতো খুলল দায়ান, দ্রুত হাতে কাপড় ছাড়ছে, 'আবারও বলছি, অলিভাকে তুমি ছোঁবে না।'

'মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে। তা না হলে চুমো খেতে দিল কেন? তুমি ঝপ করে আকাশ থেকে না পড়লে ওকে আমি আমার ভক্ত বানিয়ে ফেলতাম। এ-সব মেয়েরা কী চায় আমি জানি।'

'এক কথা বারবার বলব না,' শান্ত কণ্ঠে বলল দায়ান। 'তোমার যদি ব্যবস্থা করতে চাই, করব—পিস্তল থাক বা না থাক।'

দুই ভাই পরস্পরের দিকে ঝাড়া বিশ সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। অবশেষে যোসেফকেই চোখ নামাতে হলো। 'নাহ্, উদ্ভট এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি!' বলে পাশ ফিরে শুলো ও।

বিছানায় উঠল দায়ান। 'কেন এত ভয় তোমার?' হঠাৎ করে

জানতে চাইল ও। 'কী করেছ? কে তোমার পিছু নিয়েছে?'

বিদ্যুৎবেগে মোচড় খেল যোসেফ, আধ-বসা অবস্থায় ঘাড় বাঁকা করে তাকাল। 'চুপ করো। আমি কাউকে ভয় পাচ্ছি না।'

'আসলে পাচ্ছ। তা না হলে কথায় কথায় চমকে উঠতে না। কার কাছ থেকে পালাচ্ছ, যোসেফ—পুলিশ?'

হাতের কুৎসিতদর্শন পিস্তলটা নাড়ল যোসেফ। 'চুপ না করলে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব,' খেঁকিয়ে উঠল ও, রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা দেখাচ্ছে চেহারা, মুখের পেশিগুলো নড়ছে নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। 'কেন যে আগে তোমার ব্যবস্থা করিনি...'

'একা হয়ে পড়ার ভয়ে,' শান্ত সুরে বলল দায়ান। 'কিছু একটা ঘটবে, তুমি চাও তখন যেন তোমার পেছনে আমি থাকি।'

মাথাটা বালিশে নামাল যোসেফ, অস্ত্রটা সরিয়ে রাখল। হাত বাড়িয়ে আলো নেভাবার সময় বলল, 'কী বলছ নিজেও জানো না। আমি ঘুমাচ্ছি।'

কিন্তু ঘুম এল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে থাকল যোসেফ, দায়ানের হালকা নাক ডাকার আওয়াজ শুনল, খোলা জানালা দিয়ে আকাশ ছোঁয়া পাইনগাছের পাতায় চাঁদের আলো নাচতে দেখল।

রাতটা নীরব আর স্থির। হালকা বাতাসে গাছের পাতা দুলছে, তীরে এসে ছলছলাৎ শব্দ করছে দিঘির ছোট ছোট ঢেউ।

অলিভার কথা ভাবছে যোসেফ। ভাবছে দায়ানের ঘুম না ভাঙিয়ে কামরা ছেড়ে বেরুতে পারবে কি না। একবার অলিভার কামরায় পৌঁছাতে পারলে বাকিটা তার জন্য পানির মত সোজা। অলিভাকে আবার আলিঙ্গন করছে, এই কল্পনা হঠাৎ তৎপর করে তুলল ওকে।

মাথা তুলে দায়ানকে দেখল যোসেফ। ঠিক এই সময় কেবিনের বাইরে একটা ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। কামনার আগুন দপ করে নিভে গেল, উঠে বসল ও, বুকের

ভিতরটা ধকধক করছে।

খোলা জানালার সামনে দিয়ে একটা ছায়া সরে গেছে। নীরব, সচল ছায়া, থামেনি বা ইতস্তত করেনি, ফলে ওর দৃষ্টিতে বিশদ কিছুই ধরা পড়েনি।

ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকল যোসেফ, জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। বারান্দা থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কয়েক মুহূর্ত আর কিছু শোনা গেল না। তারপর আবার পা ফেলার শব্দ। একটা তক্তা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করল। কাছে চলে আসছে।

দায়ানকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকাল যোসেফ। হঠাৎ এভাবে ঘুম ভাঙানোয় হকচকিয়ে গেল দায়ান, উঠে বসল, অনুভব করল যোসেফের অস্থির আঙুল ওর বাহুতে গেঁথে যাচ্ছে। 'কী হয়েছে? এমন করছ কেন?'

'কেউ এসেছে!' বলল যোসেফ, গলা কাঁপছে। 'শোনো!'

লেকের ওদিকে কোথাও থেকে ডাক দিল মিস্টার।

বিছানা থেকে মেঝেতে পা নামাল দায়ান, এই সময় সে-ও জানালার সামনে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখতে পেল। 'গাধা আর খোঁজে কোথায়! আরে, ও তো অলিভা!' বলল ও। 'শান্ত হও তুমি।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বাতাস ছাড়ল যোসেফ। 'অলিভা? এত রাতে বাইরে কী করছে ও? কী করে বুঝলে তুমি ও অলিভা?'

'কী করে আবার, চোখে দেখে।' নিঃশব্দ পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল দায়ান। এক মুহূর্ত পর ওর পাশে চলে এসে বাইরে উঁকি দিল যোসেফও।

দুজনেই দেখতে পেল বারান্দায় পায়চারি করছে অলিভা। দায়ানের সিল্কের পা'জামা পরে আছে ও, পা দুটো খালি।

'মরুক শালী!' বিড়বিড় করে গাল দিল যোসেফ। 'আরেকটু

হলে আমার প্যান্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কী করছে ওখানে ও?'

'চুপ!' ফিসফিস করল দায়ান। 'এমন হতে পারে যে ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।'

ভয় কেটে যাওয়ায়, পা'জামা পরা অলিভাকে দেখে, যোসেফের হার্ট বিট আবার বেড়ে গেল। 'দেখতে সত্যি খুব ভাল, তাই না? মাইরি বলছি, কী একখানা ফিগার!'

ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না দায়ান, গভীর মনোযোগের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কী করছে মেয়েটি।

হঠাৎ থামল অলিভা, ঝট করে ওদের দিকে তাকাল, যেন বুঝতে পেরেছে ওর উপর নজর রাখছে কেউ। মেঘ সরে যেতে চাঁদের উজ্জ্বল আলোটা সরাসরি পড়ল ওর মুখের উপর। মেয়েটির চেহারা দেখে চমকে উঠল ওরা দুজন।

অলিভার মুখের রেখা আর ভাঁজগুলো অন্যরকম লাগছে। চেহারায় ফুটে রয়েছে সম্পূর্ণ অচেনা নিষ্ঠুর একটা ভাব। ডান গালের একটা শিরা বার কয়েক লাফিয়ে উঠল, চোখ দুটো যেন কাঁচের তৈরি, নিষ্প্রাণ। দায়ান ওকে কোনও রকমে চিনতে পারছে।

হঠাৎ কোত্থেকে উঠানে এসে হাজির হলো মিস্টার। অলিভার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে থামল, দৃষ্টিতে যেন সহানুভূতি, ঠায় তাকিয়ে থাকল অলিভার দিকে।

ঝট করে সেদিকে একবার তাকাল অলিভা। এই মুহূর্তে রীতিমত বিপজ্জনক দেখাচ্ছে ওকে। ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক হয়ে এল চেহারা। মিস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তারপর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়।

'ব্যাখ্যা করতে পারবে ব্যাপারটা?' অস্বস্তির সঙ্গে জানতে চাইল যোসেফ। 'লক্ষ করেছ কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল ওকে?'

'হুঁ,' বলল দায়ান, উদ্বিগ্ন। 'কী করছে দেখে আসতে হয় একবার।'

‘তোমার চোখ দুটো না তুলে নেয়!’ নার্ভাস হাসির সঙ্গে বলল যোসেফ। ‘ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।’

গায়ে ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে দেরাজ থেকে একটা টর্চ বের করল দায়ান, তারপর প্যাসেজ ধরে অলিভার কামরার দিকে এগোল। আস্তে করে দরজাটা খুলল ও।

বিছানায় শুয়ে রয়েছে অলিভা, চোখ দুটো বন্ধ, ধবধবে সাদা চাঁদের আলো ধুয়ে দিচ্ছে মুখটা। আবার সেই আগের মতই অপরূপ সুন্দর আর আকর্ষণীয় লাগছে ওকে। নাম ধরে দু’একবার ডেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

আরও দু’এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল দায়ান, তারপর পিছিয়ে এসে নিঃশব্দে বন্ধ করল দরজাটা, ফিরে এল নিজেদের কামরায়।

বাকি রাতটা ভাল ঘুমাতে পারল না দায়ান। ভোরের দিকে তন্দ্রা মত এসেছিল, গুলির শব্দ আর অলিভার আর্তচিৎকারে ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসল সে।

এগারো

সারা রাত পুলিশের সঙ্গে থেকে তল্লাশি চালাচ্ছে রানা।

কয়েকটা টিমে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ, মডেস্টো শহরের চারধারে এক-দেড়শ’ মাইল পর্যন্ত কোনও এলাকা বাদ দিচ্ছে না। রানা যে টিমে রয়েছে সেটা পুবদিকে রওনা হয়ে আকাশ ছোঁয়া বাউন্ডারি পিক-এর গোড়া পর্যন্ত তল্লাশি চালাল, কিন্তু অলিভার কোনও হদিস বের করতে পারল না।

মেয়েটি যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বাকি সব টিমের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে ওরা, তারাও ভাল কোনও খবর

দিতে পারল না।

পুলিশ টিমের সঙ্গে থাকলেও, রেন্ট-আ-কার কোম্পানি থেকে তোবড়ানো একটা নিশান জিপ নিয়ে এসেছে রানা। প্রথম দফার তল্লাশি শেষ করে ফেরার সময় টিম থেকে আলাদা হয়ে গেল ও; এলাকায় পুরানো দুই বন্ধু থাকে, দেখা করতে যাচ্ছে।

জায়গাটা ওখান থেকে দক্ষিণ দিকে, আরও প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে, কিং'স ক্যানিয়ানের কাছাকাছি রাবার প্ল্যানটেশনের ভিতর।

রানার ওই দুই বন্ধুর নাম জেড ফিনলে আর টিসা ফিনলে। ওরা স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাবেক অফিসার। জেড মেজর ছিল, টিসা ছিল ক্যাপটেন। অযৌক্তিক আর অনৈতিক মনে হওয়ায় ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে ওরা। ফলে কোর্ট মার্শাল হয় ওদের, চাকরি হারানো ছাড়াও তিন বছর জেল খাটতে হয়েছে দুজনকে।

জেল থেকে বেরিয়ে অনেক আগে কিনে রাখা নিজেদের জায়গায় রাবারের চাষ করছে ওরা। ওদের কোনও সন্তানাদি নেই। আত্মীয়-স্বজনও বোধহয় নেই কেউ, অন্তত সেরকম কাউকে কখনও দেখেনি রানা।

অনেকদিনের পুরানো বন্ধু, সময়-সুযোগ পেলে ওদের বাগানবাড়িতে বেড়াতে চলে আসে রানা। কাঠের তৈরি তিনতলা একটা বাড়িতে ওরা থাকে, আশপাশে বহুদূর পর্যন্ত কোনও প্রতিবেশী নেই। বাড়ি থেকে রাবার বাগানটাও তিন কি সাড়ে তিন মাইল দূরে।

গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় দোতলার একটা কামরার আলো জ্বলে উঠল। উঠানে থেমে বার দুই হর্ন বাজিয়ে জিপ থেকে নামল রানা, পিঠে বাঁধা চওড়া একটা ব্যাকপ্যাক, ভিতরে ক্যামেরা ছাড়াও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট আছে।

দোতলার একটা জানালা খুলে বাইরে মাথা বের করে দিল টিসা ফিনলে। হেডলাইটের আলোয় ছদ্মবেশী রানাকে প্রথমে চিনতে পারল না ও।

'বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই?' কৌতুক করল রানা। 'ক্লান্ত মুসাফির, একটু বিশ্রামের আশায় এসেছি।'

ওর গলা চিনতে পেরে হইহই করে উঠল টিসা: 'হেই, ফাইটারম্যান! অ্যাদ্দিন পর মনে পড়ল আমাদের কথা? এই নাও চাবি,' বলে চাবির একটা গোছা ছুঁড়ে দিল রানার পায়ের কাছে। 'দরজা খুলে উঠে এসো, আমি চুলোয় কফি চড়াচ্ছি।'

দরজার তালা খুলে দোতালায় উঠে এল রানা, তারপর সরাসরি কিচেনে ঢুকল। 'জেড মনে হচ্ছে বাড়িতে নেই?' একটা চেয়ার টেনে বসল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখছে টিসা, প্রশ্নটা শুনে কী এক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখ-মুখ। 'ওহ্, রানা, তোমাকে তো বলাই হয়নি! আমরা একটা বাচ্চাকে দত্তক নিচ্ছি!'

'ওহ্, মার্ভেলাস!'

'জেড ভারতে গেছে—বাচ্চাটাকে আনতে,' বলল টিসা, ফ্রিজ খুলে দু'জোড়া স্যান্ডউইচ বের করল, তারপর আরেক চুলোয় গরম করতে দিল ওগুলো। 'দু'মাস আগে আমিই পছন্দ করে এসেছি, এবার কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে ও।'

'ভারতের কোত্থেকে দত্তক নিচ্ছ?'

'আগরতলা থেকে। ওর মা-বাবা আদিবাসী, দুজনেই রায়টে মারা গেছেন।' একটা প্লেটে স্যান্ডউইচ সাজিয়ে টেবিলে রাখল টিসা। 'খেয়ে নাও—চেহারাই বলে দিচ্ছে সারারাত তোমার পেটে কিছু পড়েনি।'

স্যান্ডউইচ সাবাড় করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, অনুভব করল টিসা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। 'কী?'

জিজ্ঞেস করল ও।

'কিছু হয়েছে তোমার,' মৃদুকণ্ঠে বলল টিসা। 'তা না হলে এরকম শেষরাতে তোবড়ানো একটা জিপ নিয়ে হুট করে চলে আসার লোক তুমি নও। তা-ও আবার ছদ্মবেশ নিয়ে।'

কথা না বলে কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা।

'কী হয়েছে বলবে না আমাকে?' জানতে চাইল টিসা।

'হ্যাঁ, বলব,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'এক পাগলী মেয়ের কাহিনি। এটাকে তুমি একতরফা একটা প্রেমের গল্পও বলতে পারো...'

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কাহিনিটা বোধগম্য করবার জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন, ধীরে ধীরে সব বলে গেল রানা।

ও থামতে দোতলার কিচেনটাতে নীরবতা নেমে এল। সেটাকে দীর্ঘ হতে না দিয়ে ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল টিসা, 'অসহায় একটা মেয়ে, মাথার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, নিজের ভাল-মন্দ বোঝে না, এলাকায় দুষ্ট লোকের অভাব নেই...ওহ্, গড, রানা! ওকে তুমি এই দুর্গম জঙ্গল আর পাহাড়ি এলাকায় কোথায় খুঁজবে? কোথায়?'

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা। 'জানি না, সত্যি আমি জানি না।'

'এখানে এসে খুব ভাল করেছ তুমি, রানা,' বলল টিসা। 'এটা আমাদের এলাকা, খুব ভাল করে চিনি সব। তুমি ঘুমিয়ে নাও, তারপর আমরা ওকে খুঁজতে বেরুব...'

'না,' বলে মাথা নাড়ল রানা। 'এরকম বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি জড়াতে পারি না...'

'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, যে-কোনও বিপজ্জনক সিচুয়েশন সামলানোর ট্রেনিং নেয়া আছে আমার,' বলল টিসা। 'তা ছাড়া, সব কথা শোনার পর অলিভাকে সাহায্য করা আমার একটা নাগরিক দায়িত্ব...'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। ‘ঠিক আছে, সাহায্য লাগলে বলব তোমাকে। গেস্টরুমটা যদি খুলে দাও, আমি এখন একটু ঘুমাতে চাই।’

পরদিন বেলা বারোটার দিকে মোবাইল ফোনের আওয়াজে ফিনলে দম্পত্তির বাড়ির গেস্টরুমে ঘুম ভাঙল রানার। ওর এজেন্সির মডেস্টো শাখার প্রধান নঈম মাহমুদ ফোন করেছেঃ ‘ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সলিসিটার হাওয়ার্ড ব্লেচার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট, মাসুদ ভাই।’

‘হ্যাঁ, বলো।’

‘হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামে লোক পাঠিয়ে অলিভার এক কপি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছে ব্লেচার,’ বলল মাহমুদ।

‘আর কিছু?’

‘জী, মাসুদ ভাই,’ বলল মাহমুদ। ‘ব্লেচারের মডেস্টো শাখার অফিস থেকে ওই ফটোগ্রাফটা নিয়ে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের মাফিয়া ডন মারিও মারকাস-এর একজন ভাড়াটে স্নাইপার। তার নাম ব্রুনো হপার।’

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিল রানা; পরিষ্কার বুঝল, সলিসিটর ব্লেচার মাফিয়া ডন মারিও মারকাসের সাহায্য নিয়ে অলিভাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তার মানে একা শুধু পুলিশ নয়, ওদের পাশাপাশি মাফিয়াও খুঁজছে অলিভাকে। খোঁজটা কে আগে পাবে বলা মুশকিল, কারণ পুলিশের চেয়ে একজন মাফিয়া ডনের নেটওঅর্ক কম শক্তিশালী নয়।

পুলিশের কাজ যদি অলিভাকে উদ্ধার করা হয়, মাফিয়ার কাজ হবে দেখামাত্র ওকে মেরে ফেলা। অলিভাকে খুন করতে পারলে ব্লেচার আর মারিও মারকাস ব্যাঙ্কে রাখা নগদ পাঁচ মিলিয়ন ডলার আর পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে

নিতে পারবে। সন্দেহ নেই নিজের ভাগের টাকা বেশিরভাগই দেনা শোধ করতেই বেরিয়ে যাবে ব্লেচারের। যদি কিছু বাঁচে, সেটাও আবার মারকাসের ক্যাসিনোয় জুয়া খেলতে গিয়ে হারবে।

ব্রুনো হপার সম্পর্কে শুনেছে রানা। স্রেফ একটা পাষণ্ড। হাতের টিপ নাকি খুবই ভাল। গিলবার্ট নামে নিগ্রো এক বন্ধু আছে ওর। দুজন একটা টিম হিসাবে কাজ করে।

মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে রানার। এই সব বিপজ্জনক লোকদের হাত থেকে অলিভাকে বাঁচাবার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। কাকে নিরাপত্তা দেবে? তার খোঁজ পেলে তো!

এক হপ্তা পর মডেস্টোর আন্ডারওয়ার্ল্ডে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, অলিভা কারমেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। মডেস্টো শহর থেকে আড়াইশ' কিলোমিটার দূরে, সিকোইয়া ন্যাশনাল পার্কের পাশে একটা রাস্তায় পাওয়া গেছে ওর লাশ।

লাশ উদ্ধার করে মডেস্টো সিটি হসপিটালের মর্গে নিয়ে এসেছে পুলিশ, সনাক্ত করবার জন্য ডাকা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে। তাদের মধ্যে দুজন হলো ট্রাস্টি বোর্ডের পুরানো সদস্য সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার, আর নতুন সদস্য মারিও মারকাস।

ট্রাস্টি বোর্ডের অপর সদস্য রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা, প্রথম সাক্ষী হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক পেরি প্রেসটনকে এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ডিরেক্টর ডক্টর লেভি শেলডনকেও ডাকা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় সাক্ষী ব্যস্ত থাকায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আসতে পারবেন না।

খবরটা পাওয়া মাত্র মর্গের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রানা। যাওয়ার পথে মোবাইল ফোনে পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও।

শেরিফ ডেভিড কুপার জানালেন, অনেক আগেই অকুস্থলে

উপস্থিত হয়ে অলিভার লাশ সনাক্ত করে গেছে সলিসিটর ব্লেচার আর মারিও মারকাস। ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে গাড়িতে আগুন লেগে যায়, ক্ষতবিক্ষত লাশটার মুখ পুড়ে গেছে, তারপরেও তাঁরা লিখিতভাবে জানিয়েছেন ওটা নিঃসন্দেহে অলিভারই লাশ।

শেরিফ আরও বললেন, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের মালিক ডক্টর প্রেসটনও ইতিমধ্যে মর্গে এসে লাশটা দেখে গেছেন। তবে হ্যাঁ বা না কিছুই জানাননি, বলছেন: তিনি নিশ্চিত নন।

সব শুনে খটকা লাগছে রানার।

তিন মিনিটের মধ্যে সিটি হসপিটালে পৌঁছে গেল ও। ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে মাসুদ রানা হিসাবে এসেছে, পরিচয়-পত্র দেখিয়ে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হলো।

মর্গের ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয়েছে লাশ। ওটার গায়ের চাদর সরিয়ে তাকাল রানা। প্রথমেই যেটা লক্ষ করল, লাশের গায়ে একটা ট্রেঞ্চকোট।

চেহারা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই, এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে।

রানার মনে পড়ল স্যানাটোরিয়াম থেকে পালাবার সময় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই একজন শোফারের ট্রেঞ্চকোট চুরি করেছিল অলিভা। কিন্তু যে রোড অ্যাক্সিডেন্টে অলিভার মারা যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা হয়েছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে। ওই সময় প্রচণ্ড রোদ ছিল, কাজেই তখন কারও ট্রেঞ্চকোট পরে থাকবার কথা নয়।

একরাশ প্রশ্ন ভিড় করে এল রানার মনে। লাশটা কোথাও থেকে চুরি করা? কোনও কবর থেকে তোলা? ট্রেঞ্চকোট পরিয়ে ওটার উপর দিয়ে গাড়ি চালানো হয়েছে, যাতে কেউ পরীক্ষা করলে হাড়গোড় ভাঙা দেখতে পায়? সবশেষে আগুনে পোড়ানো হয়েছে মুখটা?

অসম্ভব নয়। কারণ অলিভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকা আর সয়-সম্পত্তি মেরে দিতে হলে ব্লেচার আর মারকাসকে প্রমাণ করতে হবে: সে বেঁচে নেই।

মর্গের খাতায় রানা লিখল: 'অসম্ভব, এই লাশ অলিভা কারমেনের হতে পারে না। ওর বাম কবজির ওপর দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ ছিল—এখানে দেখা যাচ্ছে হাতটাই নেই। গোটা ব্যাপারটা স্রেফ বানোয়াট। যারা এটাকে অলিভা কারমেনের লাশ বলে সনাক্ত করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অ্যাকশন নেওয়া উচিত।'

যোসেফ এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে, যখন-তখন শুধু অপরের নয়, নিজের মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

ভোর রাতে বালিশের তলা থেকে পিস্তল বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করেছে ও, তারপর জানালা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করেছে—একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আধো ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নে দেখেছে: দুটো প্রকাণ্ডদেহী কাক কেবিনের চারধারে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হাসবে ভেবে কথাটা দায়ানকে জানায়নি, তবে নিজে খুব ভাল করেই জানে এই দুঃস্বপ্নের কী তাৎপর্য।

নিস্তব্ধ পাহাড়ি এলাকায় গুলির শব্দ শতগুণ জোরালো লেগেছে ওদের কানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আর্তনাদ করে উঠেছে অলিভা। কামরায় ঢুকে দায়ান জড়িয়ে না ধরলে থামানোই যেত না ওকে।

একটু বেলা হতে অলিভাকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে দায়ান। সূর্য ওঠার আগে মাছ ধরবার কথা বলে বেরিয়েছে যোসেফ, এখনও ফেরার নাম নেই। আসলে হয়তো রাস্তার উপর নজর রাখতে গেছে।

'গুলি হবার আগে ভালই ঘুম হয়েছে তোমার, তাই না?'

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অলিভাকে প্রশ্ন করল দায়ান।

'স্বপ্ন দেখেছি,' জবাব দিল অলিভা। 'জানো, আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি।'

'না, মানে, রাতে কি এক-আধবার উঠেছ?' হাসিমুখে আবার জিজ্ঞেস করল দায়ান। 'কারণ আমার যেন একবার মনে হলো কেবিনের ভেতরে কেউ হাঁটাচলা করছে। হতে পারে আমিও স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'কই, না, উঠিনি তো,' বলল অলিভা, সরু আঙুল দিয়ে কপালের একটা পাশে চাপ দিল। 'তবে কিছু একটা ঘটেছে। মনে করতে পারছি না কী। কিছুই মনে আনতে পারছি না। ব্যাপারটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।' টেবিলের উপর হাত লম্বা করে ওর কবজি চেপে ধরল। 'জানি না তুমি না থাকলে কী হতো আমার! তুমি কাছে থাকলে মনে হয়, আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

নিঃশব্দে হাসল দায়ান, তবে অস্বস্তি বোধটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল ও। 'স্বপ্নটা কী, অলিভা?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি আসলে একই স্বপ্ন বার বার দেখি। ব্যাপারটা একজন নার্সকে নিয়ে। ওর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে।'

অলিভাকে নিয়ে সারাটা দিন দুশ্চিন্তায় ভুগল দায়ান। সন্ধের পর যোসেফ যখন ফিরে এল, তখনও মন খারাপ হয়ে আছে ওর।

ফেরার পর থেকে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চুপচাপ থাকল যোসেফ, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ; তবে চোখ দুটো খানিক পরপর খুঁজে নিচ্ছে অলিভাকে।

ঘুম পাওয়ায় বিছানায় উঠল দায়ান। যোসেফ আগেই এসে শুয়েছে, ভান করল ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত গভীর হতে বিছানায় উঠে বসল যোসেফ, মৃদুকণ্ঠে দায়ানের নাম ধরে ডাকল, সাড়া না পেয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে।

উত্তেজনা আর প্রত্যাশায় কাঁপছে ও। কত আর ধৈর্যের পরীক্ষা দেবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ রাতেই অলিভাকে রাজি করাতে হবে।

ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল দায়ান, দম বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল যোসেফ, আবার শুয়ে পড়তে তৈরি হয়ে আছে। তবে দায়ানের ঘুম ভাঙল না।

পা টিপে টিপে দরজার সামনে চলে এল যোসেফ। কবাট খুলে সাবধানে বেরুল প্যাসেজে। কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু বাতাসে গাছের পাতা নড়ে উঠলে খসখস আওয়াজ হচ্ছে।

অলিভার কামরাটা প্যাসেজের শেষ মাথায়। ওর দরজায় কান পাতল, কোনও শব্দ না পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল কবাটটা। দেখল, বিছানায় শুয়ে আছে অলিভা, বালিশে ছড়িয়ে পড়েছে একরাশ লাল চুল। মুখের উপর সরাসরি চাঁদের আলো পড়ায় অপরূপ সুন্দর লাগছে ওকে।

কামরার ভিতর ঢুকছে যোসেফ, চোখ মেলে তাকাল অলিভা। ওকে দেখে চমকে ওঠেনি, চেহারায় ভয় পাওয়ারও কোনও লক্ষণ নেই। শুধু চোখ দুটো বড় হয়ে আছে, তবে চেহারায় প্রশান্তির ছাপটা ম্লান হয়নি।

'হ্যালো,' বলল যোসেফ, 'তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।'

কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অলিভা।

'আমি জানি তুমি আমাকে ভয় পাও না।' মেয়েটির রূপ আর সৌন্দর্য অস্থির করে তুলছে ওকে। 'নাকি পাও?'

'না,' শান্ত গলায় বলল অলিভা। 'মন বলছিল, আজ রাতে তুমি আসবে। স্বপ্নে তোমাকেই তো দেখছিলাম আমি।'

'তার মানে তুমি চাইছিলে আমি আসি?' বিছানার কিনারায় বসে ফিসফিস করে জানতে চাইল যোসেফ, আনন্দ আর উল্লাসে নাচতে ইচ্ছে করছে ওর।

কেমন চিন্তিত মুখে যোসেফের দিকে তাকিয়ে থাকল

অলিভা। 'সেই সন্ধে থেকে তোমার দৃষ্টি অনুভব করেছি। যেখানেই গেছি, আমার ওপর থেকে তুমি চোখ সরাওনি। মনে হচ্ছিল রাতে তুমি আসতে পার।'

ফিক করে হাসল যোসেফ। অলিভার হাতটা ধরল ও। কেমন ঠাণ্ডা আর অসাড়, তবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। 'আবার তোমাকে আমি চুমো খেতে চাই।'

'দায়ান চায় না এ-সব তুমি করো।'

'ও জানবে না—ঘুমাচ্ছে। সেদিন তো তোমার খারাপ লাগেনি, তাই না?' অলিভার মুখের দিকে মুখ বাড়াল যোসেফ।

বাধা দিল অলিভা। 'না, এ-সব আমার ভাল লাগছে না...'

'এসো, আগে শুরু তো করি, দেখবে কত ভাল লাগে। খোলো এগুলো,' অলিভার সিল্ক জ্যাকেটের বোতামে আঙুল রেখে বলল যোসেফ। 'আমি তোমাকে এতটুকু ব্যথা দেব না।'

'না!' ঝাপটা দিয়ে যোসেফের হাত সরিয়ে দিল অলিভা।

'তুমি খুব সুন্দরী, অলিভা,' নরম সুরে বলল যোসেফ। 'আর তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমিও আমাকে ভালবাস, তা না হলে সেদিন চুমো খেতে দিতে না...'

'তুমি যাও!'

'কেন যাব?' রেগে গিয়ে জোর খাটাতে শুরু করল যোসেফ। অলিভা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর পরনের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলছে উন্মত্ত যোসেফ।

আরেক বেডরুমে হঠাৎ করে দায়ানের ঘুম ভেঙে গেল। এক ঝটকায় বিছানার উপর উঠে বসে চারদিকে বোকার মত তাকাচ্ছে ও, ভাবছে কী কারণে এভাবে ভাঙল ঘুমটা। তারপর দেখল যোসেফের বিছানা খালি।

মেঝেতে নেমে দ্রুত দরজার দিকে এগোল দায়ান। ঠিক এই

সময় তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়ল কেবিনের ভিতর। এক মুহূর্তের বিরতি। তারপর ফোঁপানোর আওয়াজ কানে এল, ওই একই গলা থেকে বেরিয়ে এল কর্কশ চিৎকারঃ 'দায়ান! জলদি! জলদি এসে আমাকে সাহায্য করো!'

যোসেফের চিৎকার শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল দায়ানের, ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্যাসেজে, আলো জ্বালল।

ওর দিকে এগিয়ে আসছে যোসেফ। কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে শরীরটা, মুখটা দু'হাতে ঢাকা, আঙুলের ফাঁক গলে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে মেঝেতে।

'কী হয়েছে?' হাঁপিয়ে উঠল দায়ান, ওখানেই জমে পাথর হয়ে গেল।

'আমার চোখ গেলে দিয়েছে!' ফুঁপিয়ে উঠে বলল যোসেফ। 'ও আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, দায়ান! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! যিশুর দোহাই, কিছু একটা করো!'

নাগালের মধ্যে চলে আসতে ভাইকে ধরল দায়ান, ঝাঁকাচ্ছে ওকে। 'কেন এমন হলো? কী করেছ তুমি ওর?' তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে প্যাসেজ ধরে অলিভার কামরার দিকে এগোল।

দরজা খোলা, অলিভার কামরায় ঢুকল দায়ান। কিন্তু বেডরুম খালি, কেউ নেই। এক লাফে জানালার সামনে চলে এল ও। পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল।

ওর দিকে তাকিয়ে বারান্দার উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে অলিভা। নাভি থেকে গলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ খালি, চাঁদের আলোয় চোখ জোড়া বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দায়ান। এমন বন্য অথচ সুন্দর প্রাণী দেখবার সৌভাগ্য আগে কখনও হয়নি ওর। অলিভার লাল চুল যেন পালিশ করা ব্রোঞ্জ, সাদা জোছনায় ঝলমল করছে। সাদা শাটিনের মত আভা ছড়াচ্ছে ত্বক।

হঠাৎ ঘুরে ধাপ বেয়ে ছুটল মেয়েটা, পালাচ্ছে; রাগের মাথায়

যোসেফের চোখ তুলে নেওয়ার পর সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে।

'অলিভা!' চেঁচিয়ে উঠল দায়ান। 'অলিভা, ফিরে এসো!'

কিন্তু পায়ে হরিণীর ক্ষিপ্রতা, এরইমধ্যে পাইনবনের ভিতর হারিয়ে গেছে অলিভা। ওর পিছু নিয়ে মিস্টারকেও ছুটে যেতে দেখল দায়ান।

কী করতে হবে জানে না, জানালার সামনে ইতস্তত করছে দায়ান, যোসেফের গোঙানি শুনে ফিরে এল প্যাসেজে। 'শান্ত হও,' বলল ও। 'সিরিয়াস কিছু হয়নি তোমার।'

'শালী আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, আর তুমি বলছ...' চেঁচিয়ে উঠে চোখ থেকে হাত নামাল যোসেফ।

চমকে উঠে পিছু হটল দায়ান। বমি পাচ্ছে ওর, শিরশির করে উঠল শরীর।

যোসেফের চোখ দুটো রক্তে ভরে আছে। নখ দিয়ে আঁচড়ের লম্বা নির্দয় দাগটা শুরু হয়েছে কপাল থেকে, চোখের পাতা হয়ে নেমে এসেছে নাকের দু'পাশে। দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে, তারপরেও টলছে ও, যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

'আমার চোখ দুটোকে বাঁচাও, ভাই,' করুণ সুরে বলল যোসেফ। 'কথা দাও তুমি আমাকে সাহায্য করবে। ও আবার ফিরে আসবে...আমাকে ফেলে কোথাও তুমি যেয়ো না...আমি আগেই বলেছিলাম, ও সুস্থ নয়, খুনি... দেখো আমার কী অবস্থা করেছে।'

'শান্ত হও,' বলে যোসেফকে হাঁটতে সাহায্য করল দায়ান, বেডরুমে এনে শুইয়ে দিল বিছানায়। 'দাঁড়াও, ধুয়ে দিচ্ছি ওগুলো।' কিচেনে এসে স্টোভ জ্বেলে কেটলি বসাল, দেরাজ খুলে বের করল মেডিকেল কিটটা।

বেডরুম থেকে চেঁচাচ্ছে যোসেফ। 'আমাকে একা রেখে কোথাও যেয়ো না, দায়ান! আমি একদম দেখতে পাচ্ছি না! ও ফিরে আসবে!'

কিচেন থেকে জবাব দিল দায়ান, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' খানিক পর বেডরুমে ফিরে এল ও। 'তোমার চোখটা ধুয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা রক্ত বেরুচ্ছে বলে তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'না, আমি অন্ধ হয়ে গেছি! আমার দু'চোখ উপড়ে নিয়েছে ও; আর কোনওদিন দেখতে পাব না!' গুঙিয়ে উঠল যোসেফ। 'আমার পাশে থাকো, দায়ান। ওরা আমার পিছু নিয়েছে...যেখানেই খুঁজে পাবে, দেখামাত্র খুন করবে আমাকে। আমি এখন অসহায়। নিজেকে রক্ষা করতে পারব না।'

'কারা তোমার পিছু নিয়েছে?' তীক্ষ্নকণ্ঠে জানতে চাইল দায়ান, একটা পাত্রে গরম পানি ঢালছে।

'টোবি...টোবি ব্রাদার্স,' বলল যোসেফ, দায়ানের হাতটা ধরবার জন্য বৃথাই হাতড়াচ্ছে ও। 'তুমি ওদেরকে চিনবে না। কেউ ওদেরকে চেনে না। ওরা গোপনে কাজ সারে...পেশাদার খুনি। আমাকে খুন করার জন্যে ডন বয়েড ব্লুমফিল্ড ওদেরকে ভাড়া করেছে।'

'ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না,' বলল দায়ান। 'এখানে তুমি নিরাপদ। চুপচাপ শুয়ে থাকো, চোখ দুটো ধুয়ে দিচ্ছি। একটু জ্বালা করতে পারে, সহ্য করতে হবে।'

'ছুঁয়ো না আমাকে!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল যোসেফ, বিছানার উপর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। 'আর কোনও ব্যথা আমি সহ্য করতে পারব না।'

অপেক্ষা করছে দায়ান। 'কী করেছ তুমি ওর?' যোসেফ একটু শান্ত হতে জানতে চাইল ও।

'কিছুই করিনি!' ফোঁপাচ্ছে যোসেফ। 'ও চেয়েছিল আমি ওর কাছে যাই। কিন্তু চুমো খেতে চাইলেই ঝটকা-ঝটকি শুরু করে দিল। ছিঁড়ে গেল কাপড়, তারপর দেখি জাপটে ধরে ফেলেছে আমাকে, ছাড়ছে না। ওর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, নিজেকে আমি ওর বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। এমনভাবে গলাটা

পেঁচিয়ে ধরল, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমাকে কামড়াতে শুরু করল। বুঝলাম ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ওর চোখ ল্যাম্পের মত। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে এনেছি, এই সময় আমার চোখে খামচি দিল। ঠিক যেন একটা মানুষখেকো বাঘের মত। ও উন্মাদ...বুনো জন্তু...'

'ও আসলে ভয় পেয়েছে,' বলল দায়ান, শিরশির করছে ওর শরীর। 'ওকে ঘাঁটাতে নিষেধ করেছিলাম তোমাকে আমি।'

'টোবিরা যদি এখানে আসে...কী করব আমি? দায়ান! ওরা আমাকে খুন করতে এলে নিশ্চয় তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না?' ঝট করে উঠে বসে বালিশের তলাটা দ্রুত হাতড়াতে শুরু করল। 'এই যে, পিস্তলটা রাখো। দেখামাত্র গুলি করবে ওদেরকে... কীভাবে চিনবে বলে দিচ্ছি...'

'আরে, শান্ত হও তো,' অধৈর্য হয়ে বলল দায়ান। 'বললাম না এখানে তুমি নিরাপদ...'

'ওদেরকে তুমি চেনো না। মানুষ খুন করাই ওদের পেশা। একবার কোনও কাজ হাতে নিলে, ব্যর্থ হয় না কখনও। একের পর এক করে যাচ্ছে। ডন ব্লুমফিল্ড অনেক টাকা দিয়েছে ওদেরকে। ওরা ঠিকই আমাকে খুঁজে বের করবে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল দায়ান। 'কী করেছ তুমি যে ওরা তোমাকে খুন করতে চাইছে?'

নাগাল পেয়ে ওর কোটটা খামচে ধরল যোসেফ। 'ডন ব্লুমফিল্ড আর আমি বড়সড় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছি। তারপর সব টাকা ব্যাগে ভরে নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। অনেকদিন থেকেই আমাকে ঠকাচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছি। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছি, সব মিলিয়ে তিন মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ব্লুমফিল্ড আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে টোবিদের।'

'এখানে কেউ তোমাকে খুঁজতে আসবে না,' আবার বলল

দায়ান।

‘আসবে।’ ব্যথায় কাতরাচ্ছে যোসেফ। ‘পিস্তলটা হাতের কাছে রাখো। কোনও সুযোগ দিয়ো না, দেখামাত্র গুলি করবে...এক জোড়া কালো কাকের মত দেখতে ওরা...হ্যাঁ, ঠিক যেন একজোড়া কালো কাক...’

‘শোও। রক্তটুকু ধুয়ে দিই,’ বলল দায়ান, ভাইকে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়।

চোখে তুলোর স্পর্শ পেতেই চেঁচিয়ে উঠল যোসেফ।

বারো

এক জোড়া কালো কাক।

এই বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে টোবি ব্রাদারদের। কালো আঁটসাঁট ওভারকোট, চওড়া কারনিসওয়ালা কালো হ্যাট, কালো ঢোলা ট্রাউজার, কিন্তু চকচকে কালো জুতোর ডগাগুলো ছুঁচলো। দেখলেই অশুভ কোনও বিপদ মনে হয় ওদেরকে। গলায় জড়ানো কালো স্কার্ফ চেহারায় কিলারের ভাব এনে দিয়েছে।

কয়েক বছর আগে একটা ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির তারকা শিল্পী ছিল ওরা, ওখানেই টোবি ব্রাদার্স হিসাবে খ্যাতি পায়। তবে ওরা আসলে পরস্পরের ভাই নয়: ওদের আসল নাম জন বাডি আর ফ্রেড ফ্রিম্যান।

পেশায় নাইফ-থ্রোয়ার ছিল ওরা—কালো ভেলভেটে মোড়া বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো একটা মেয়ের চারধারে ফসফরাস মাখানো ছুরি ছুঁড়ে মারত।

স্টেজটা অন্ধকার, দর্শকরা শুধু উড়ন্ত ছুরি দেখতে পেত।

ওগুলো একটার পর একটা ছুঁড়ে বোর্ডের গায়ে, মেয়েটির শরীর থেকে এক ইঞ্চি দূরে গেঁথে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলা হত মেয়েটির ফিগার। ভারি উত্তেজক আর জনপ্রিয় একটা খেলা, বছরের পর বছর চলতে পারত, কিন্তু টোবি ব্রাদারদের কাছে সার্কাস পার্টি আর মেয়েটা একসময় একঘেয়ে হয়ে উঠল।

আসলে ওই মেয়ের কারণেই পেশাটা ছেড়ে দিল টোবি ব্রাদাররা। দেখতে সুন্দর, উৎসাহী একটা মেয়ে; কিন্তু মুশকিল হলো অবসর সময়ে টোবি ব্রাদারদের আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। তা ছাড়া, একজন জোকারের প্রেমে পড়ল সে, ফলে তার বিপদ আরও বেড়ে গেল। একদিন একই সঙ্গে ছুরি ছুঁড়ল দু'ভাই, কাটা পড়ল মেয়েটির দু'কান।

অন্য মেয়ে খুঁজল টোবি ব্রাদাররা। কিন্তু বেতন খুব কম হওয়ায় ছুরি খাওয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি হয় না কেউ—তা ছাড়া, অবসর সময়ে টোবি ব্রাদারদের চাহিদাও তারা মেটাবে না। অগত্যা ম্যানেজারকে ডেকে জানিয়ে দিল, সার্কাস ছেড়ে দিচ্ছে তারা। কিন্তু চুক্তির কথা তুলে ম্যানেজার ওদেরকে ছাড়তে রাজি হলো না। টোবি ব্রাদারদের ওই খেলাটাই সার্কাসকে টিকিয়ে রেখেছে, ওরা চলে গেলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। সাহসী দেখে একটা ছোকরা খুঁজে বের করল ম্যানেজার।

কিন্তু মন উঠে গেছে টোবিদের। এক রাতে খেলা দেখাবার সময় জন বাডি সমস্যাটার সমাধান করল সরাসরি ছোকরার দু'পায়ের ফাঁকে ছুরি গেঁথে। কিছু না, কাটা পড়েনি কিছুই, তবে সামান্য একটু চামড়া ছড়ে গেল মাত্র, কিন্তু তাতেই সাংঘাতিক ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ছোকরা। ফলে খেলা বন্ধ হয়ে গেল, বাতিল হয়ে গেল চুক্তিও।

পেশাদার খুনি হওয়ার প্রস্তাবটা এল বাডির কাছ থেকে। মৃত্যু ওর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার সময় এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা অনুভব করে, যেন ও-ই

ঈশ্বর। এই কাজটা অনায়াসে করতে পারে বলে নিজেকে আর সব মানুষের চেয়ে উন্নত আর আলাদা ভাবে ও। তা ছাড়া, প্রচুর টাকা কামাবার দিকে ওর একটা বিশেষ ঝোঁক আছে, সার্কাস পার্টি থেকে সেটা সম্ভব ছিল না।

বাডির যুক্তি হলো, হাজার হাজার মানুষ কাউকে না কাউকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে ইচ্ছেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না তারা। এক-আধজন পেশাদার খুনি সমাজের উপকারে লাগতে পারে। যেহেতু কোনও মোটিভ প্রমাণ করা সম্ভব নয়, খুনির ধরা না পড়বার ভাল সম্ভাবনা আছে।

তবে কখনও যদি ধরা পড়বার আশঙ্কা দেখা দেয়, দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকার মত নিরাপদ একটা জায়গা ঠিক করা আছে ওদের। জায়গাটার নাম গেটওয়ে, ওখানে পেড্রো আর হিলি নামে সার্কাস পার্টির পুরানো দুজন সহকর্মী থাকে।

আইডিয়াটা পছন্দ করল ফ্রিম্যান। মাথা খাটানোর ব্যাপারটা ভাল আসে না ওর, তবে সবকিছুতে উৎসাহ বোধ করা তার বিশেষ একটা গুণ। বাডি জানে সঙ্গী হিসাবে আরও যোগ্য কাউকে পেলে ভাল হত।

দুজন একমত হওয়ার পর শুধু নিজ শহরে নয়, নয় শুধু নিজ রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায়, গোটা দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডে খবরটা রটিয়ে দিল ওরা—বিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে যে-কোনও মানুষকে খুন করতে রাজি তারা, প্রতি হপ্তার জন্য খরচা নেবে এক হাজার ডলার।

তারপর...নির্দিষ্ট কিছু মহল থেকে এত দ্রুত, এত বেশি কাজের অর্ডার আসছে দেখে এমনকী নিজেরাও বিস্মিত না হয়ে পারল না।

সেই থেকে কালো একটা ক্যাডিলাক নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছে ওরা: একজোড়া কালো কাক, যারা নিঃশব্দে ও গোপনে

মৃত্যু ডেকে আনে, কিন্তু কখনও ধরা পড়ে না। পুলিশ ওদের সম্পর্কে কিছু জানে না, কারণ ভুক্তভোগীরা পুলিশকে ভয় পায় বলে তাদের কাছে মুখ খোলে না—প্রোটেকশনও চাইতে পারে না।

কখনও হয়তো টার্গেট জানতে পারে টোবি ব্রাদাররা তাকে মারতে আসছে। গা ঢাকা দিল সে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, টোবিরা ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে। ওদের শুধু টার্গেটের একটা ফটো আর সর্বশেষ ঠিকানা দরকার, আর কিছু লাগে না: টার্গেটকে খুঁজে বের করা ওদের সার্ভিসেরই একটা অংশ।

খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করে ওরা। প্রতি হপ্তায় পাওয়া এক হাজার ডলার দিয়ে সব খরচ চালায়, খুনের টাকাটা জমায়। দুজনেই পাখির খুব ভক্ত, ইচ্ছে আছে প্রচুর পুঁজি হলে বড় একটা পাখির ব্যবসা শুরু করবে।

ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা নিয়ে যোসেফ যেদিন পালাল, তার পরদিন নিউ ইয়র্ক থেকে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মাফিয়া ডন বয়েড ব্লুমফিল্ড। যোসেফকে খুন করবার জন্য ত্রিশ হাজার ডলার চেয়েছে ওরা। ডন ব্লুমফিল্ড নিজের লোকদের দিয়ে কাজটা করাচ্ছে না, কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে যোসেফকে খুন করাটা খুব সহজ হবে না। বেশি ফি চাওয়ার সেটাই কারণ। কোনও রকম দ্বিধা না করেই তাতে রাজি হয়েছে ডন ব্লুমফিল্ড।

শুধু তা-ই নয়, সেই সঙ্গে আরও একটা প্রলোভন দেওয়া হয়েছে ওদেরকে। যোসেফ যে টাকাটা নিয়ে পালিয়েছে সেটা উদ্ধার করে দিতে পারলে তার সিকি ভাগ বোনাস পাবে ওরা।

যোসেফকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন হবে বলে মনে করা হয়েছিল। টোবি ব্রাদার তাকে টার্গেট করেছে, এ-খবর পাওয়া মাত্র গায়েব হয়ে যায় সে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ছুটে বেড়ালেও, ওহাইয়ো-র পর তার আর কোনও হদিস নেই—পায়ের ছাপ মুছে একেবারে গায়েব হয়ে

গেছে। অদৃশ্য একজন মানুষকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

কিন্তু টোবিরা কোনও কাজকে অসম্ভব বলে মনে করে না। দক্ষ শিকারি ওরা, দ্রুত কোনও টার্গেটকে খুঁজে বের করবার জন্য প্রথমে তার অভ্যাস আর আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, বিশেষ করে জানতে চায় আত্মীয় নারী বা পুরুষটি কোথায় থাকে।

যোসেফের একটা ভাই আছে, এটা জানতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না ওদেরকে—বছরখানেক আগে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে নামকরা একটা বিমা কোম্পানিতে সেলস ডিরেক্টর হিসাবে চাকরি করেছে দায়ান বার্নেট। ওখানে গিয়ে জানল চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই রাজ্যেই কোথাও রান্‌শ্‌ দিয়েছে দায়ান।

হোটেলে বসে এক হপ্তা পার করে দিল ওরা। প্রথম কটা দিন রান্‌শ্‌-এর ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে এমন সব দোকানের ঠিকানা সংগ্রহ করল। তারপর ওই সব দোকানে টেলিফোন করে দায়ান বার্নেটের ঠিকানা চাইল—একটা বিখ্যাত 'ল হাউস'-এর নাম করে বলল, আমাদের মাধ্যমে দায়ান বার্নেট মোটা অঙ্কের টাকা পেতে যাচ্ছেন, ঠিকানাটা দিলে ভদ্রলোকের খুব উপকার হবে।

একশ'র মত ফোন করবার পর বিড়ালের কপালে শিকে ছিঁড়ল। মডেস্টো শহরের এক দোকানদার রান্‌শ্‌-এর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট বিক্রি করেছিল দায়ানের কাছে, খুশি মনে ওর ঠিকানাটা বাডিকে জানিয়ে দিল সে।

তিনদিন পর কালো ক্যাডিলাকটা সিগনাল পয়েন্টে এসে থামল। ছোট্ট একটা উপত্যকা-শহর সিগনাল পয়েন্ট, ব্ল্যাক পিলারস থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে। পর্যটন শহর, আশপাশে প্রচুর রিসর্ট ফ্যাসিলিটিজ আছে। তবে বার, হোটেল, রেস্তোরাঁ সবই প্রায় খালি এখন, কারণ এটা বেড়ানোর মরশুম নয়। তা ছাড়া বেশ

অনেক রাত হয়েছে।

টাওয়ার বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামাল টোবি ব্রাদাররা, তারপর ভিতরে ঢুকে খালি বার-এ বসল।

সার্কাসের মঞ্চে ঢোকার সময় প্রতিদিন একযোগে পা ফেলত ওরা, ওদের হাত দুটোও একই ছন্দে ও মাত্রায় দোল খেত শরীরের দু'পাশে, গর্বিত মাথা সামান্য উঁচু করা, দ্রুত পদক্ষেপে ক্ষিপ্র ভঙ্গি, দৃষ্টি নামিয়ে একজন অপরজনের ছায়ার চোখ রাখত—পুরানো সেই অভ্যাসটা এখনও ধরে রেখেছে ওরা।

তার উপর দুজনের পরনেই কালো ড্রেস, একবার দেখলে কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না। সেই সঙ্গে অশুভ একটা বিপদের গন্ধও পায় তারা।

টুল টেনে বসল টোবিরা, দস্তানা পরা হাতগুলো কাউন্টারের উপর। ওদেরকে খুঁটিয়ে দেখল বারম্যান, টের পেল, বিপজ্জনক লোক এরা, মুখটা হাসি হাসি করে বোঝাতে চাইল ঝামেলায় জড়াবার কোনও ইচ্ছে নেই তার। 'ইয়েস, স্যর?' জানতে চাইল সে, কাউন্টার মুছছে।

'দুই গ্লাস কমলার রস,' বলল বাডি, ওর গলার আওয়াজ নরম।

একটু পরেই কমলার রস নিয়ে এল বারম্যান, চেহারায় কোনও ভাব নেই। ফিরে যাবে, তর্জনী বাঁকা করে কাছে ডাকল বাডি ওকে। 'শহরের খবর বলো। আমরা নতুন।'

'শহরে এখন খুব উত্তেজনা,' বলল বারম্যান। 'মিস্টার রডরিক ফেদেরা গতকাল বলছিলেন, আগামীকাল দেশের সমস্ত মিডিয়ায় প্রচার করা হবে।'

'বুঝলাম না।' ভ্রূ জোড়া উঁচু করল বাডি। 'কী প্রচার হবে?' আর এই মিস্টার রডরিক ফেদেরাই বা কে?'

'ওহ্, সে এক মস্ত কেলেঙ্কারি! হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম থেকে এক রোগিণী পালিয়েছে,' ব্যাখ্যা করল বারম্যান। 'শোনা

যাচ্ছে পাঁচ মিলিয়ন নগদ টাকা, সেই সঙ্গে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দামের সম্পত্তি আছে মেয়েটার নামে।'

'এত সব খবর পাওয়া গেল তোমার ওই মিস্টার রডরিক ফেদেরার কাছ থেকে?' সুর আরও নরম করে জানতে চাইল বাড়ি। 'কে সে?'

'ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট...'

হাত তুলে বারম্যানকে থামিয়ে দিল বাড়ি, জার্নালিস্ট সম্পর্কে ওর কোনও আগ্রহ নেই। 'সেটা কোথায়, হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম?'

'নদীর কাছে, পাহাড়ের ঢালে। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে, রাউন্ডভেল রোডে,' বলল বারম্যান। 'ট্রাকে লিফট নিয়ে এদিকে কোথাও এসেছিল পাগলীটা। রাস্তার ওপর দিকে, মাইলখানেক দূরে, ওল্টানো অবস্থায় পাওয়া গেছে ওটাকে। পুলিশের ধারণা, ড্রাইভারকে ওই পাগলীই সম্ভবত খুন করেছে। মারা গেছে এক পুলিশ সার্জেন্টও, তবে সেটা খুন নাকি অ্যাক্সিডেন্ট, তা এখনও পরিষ্কার নয়।'

'ওকে পাওয়া গেছে?' জানতে চাইল ফ্রিম্যান, লেবুর রসে চুমুক দিল, তারপর দস্তানা দিয়ে ঠোঁট মুছল।

'মনে হয় না। এখনও বোধহয় খুঁজছে। আজ সকালে এখানেও পুলিশ এসেছিল। একসঙ্গে এত পুলিশ আগে কখনও দেখিনি।'

কৌতূহলে নাকি লোভে, বলা মুশকিল, ঝিক করে উঠল বাড়ির চোখের তারা। 'একটা পাগলী এত টাকা পায় কীভাবে?'

'শুনলাম, মারা যাবার আগে ভাই দিয়ে গেছে,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল বারম্যান, অর্থাৎ এ-ব্যাপারে আর কিছু জানে না ও।

'পাগলীটা কি ডেঞ্জারাস?' জানতে চাইল বাড়ি।

প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাল বারম্যান। 'ডেঞ্জারাস বলে ডেঞ্জরাস...!'

‘যিশুর দয়ায় হঠাৎ যদি চোখে পড়ে যায়... দেখতে কেমন?’

‘মাথায় লাল চুল। দেখতে...পরী। বাম কবজিতে পুরানো ক্ষতচিহ্ন আছে।’

কাউন্টারে বিল রাখল বাড়ি। ‘কাছাকাছি নতুন রান্‌শ্‌ করেছে কেউ?’ নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ও।

খুচরো টাকা ফেরত দিচ্ছে বারম্যান। ‘হ্যাঁ, ব্ল্যাক পিলারস-এ। দায়ান বার্নেটের রান্‌শ্‌টাকে নতুনই বলা যায়, মাত্র একবছর হয়েছে।’

‘অনেক দূরে?’

‘মাইল বিশেক।’

হাতঘড়ি দেখল বাড়ি। সকাল সাড়ে ন’টা। ‘আমরা রান্‌শের যে-কোনও প্রোডাক্ট কিনি,’ বলল ও। ‘ওখানে একবার গিয়ে দেখতে চাই, সস্তায় কিছু পাই কি না। দায়ান না কি যেন নাম বললে, কত বড় রান্‌শ্‌ তার, কি কি আছে?’

‘রান্‌শ্‌ তো বিশাল, কিন্তু চালাচ্ছে ছোট করে। ও একাই চালায়। গরু, মোষ ইত্যাদি আছে।’

‘ওখানে সে একা থাকে?’ গলার সুর শুনে মনে হলো বারম্যানের কথা বিশ্বাস করছে না বাড়ি।

‘হ্যাঁ, একাই থাকে, তবে কদিন হলো এক লোক থাকছে ওর ওখানে। হপ্তাখানেক আগে এদিকের রাস্তা দিয়ে ওদেরকে আমি যেতে দেখেছি।’

‘একটা হোটেলের নাম বলো, যেখানে ভাল ইটালিয়ান ডিশ পাওয়া যাবে।’

‘লা ভেরোনা-য় চলে যান,’ বলল বারম্যান, জানিয়ে দিল কোনদিকে সেটা।

কাঠের মত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে টোবি ব্রাদারদের চেহারা। ‘আসি,’ বলল ফ্রিম্যান, বাড়ির পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

টাওয়ার বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁর সামনে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কালো ক্যাডিলাকটাকে চলে যেতে দেখল ফেদেরা ওরফে রানা। চিন্তিত ভঙ্গিতে হাতের তালু ঘষল চিবুকে, হ্যাটটা আরেকটু ঠেলে দিল মাথার পিছনে, তারপর অলস পায়ে বার-এ গিয়ে ঢুকল।

চোখ-কান খোলা রেখে জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ি এলাকাটা রাত নেই দিন নেই চষে বেড়াচ্ছে রানা, আশা অলিভার যদি কোনও খবর পায়, কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসের মাফিয়া ডন মারিও মারকাস-এর পোষা স্নাইপার ব্রুনো হপার বা ওর সহকারী নিগ্রো গিলবার্টকে যদি কোথাও দেখতে পায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাগ্যের কোনও সহায়তাই পায়নি ও।

অথচ ওর আগে তারা যদি অলিভার খোঁজ পেয়ে যায়, মেয়েটার বাঁচার কোনও আশা নেই, কারণ স্নাইপার ব্রুনো হপার দেখামাত্র গুলি করবে অলিভাকে।

'হাই, স্যাম,' বলল রানা, একটা টুল টেনে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসল। 'এক ঢোক হুইস্কি খাওয়াও দেখি। উইথ সোডা।'

রানার জন্য হুইস্কির সঙ্গে সামান্য সোডা মিশাল বারম্যান।

'হ্যালো, মিস্টার ফেদেরা,' এক গাল হেসে বলল স্যাম। 'পাগলীটার আর কোনও খবর পেলেন?'

'নাহ্,' বারম্যানের হাত থেকে গ্লাসটা নিল রানা।

'ওই দুই লোককে আপনার স্টোরি সম্পর্কে বলছিলাম। ওদেরকে আপনি দেখেননি? কালো ড্রেস পরা, একজোড়া কাকের মত দেখতে?'

'দেখেছি।'

ইতস্তত করছে বারম্যান, মাথা চুলকাচ্ছে। 'ওদেরকে আমার সুবিধের লোক মনে হয়নি। বলছিল রান্‌শের প্রোডাক্ট কেনে।'

'তা-ই?' রানার চেহারায় তিক্ত একটা ভাব ফুটল। 'কী জানি, মনে তো হয় না। ওদেরকে আগেও আমি দেখেছি। সত্যি বলতে

কি, দু'বছরে তিনবার। প্রতিবার কেউ না কেউ হঠাৎ বীভৎসভাবে মারা গেছে।'

'আপনার কথার মানে কি, মিস্টার ফেদেরা?'

'নিজেও জানি না,' বলল রানা। 'তবে এরকম একজোড়া লোককে একবার দেখলে ভোলা সহজ নয়। টোবি ব্রাদারদের কথা শুনেছ কখনও?'

'কই না...মনে পড়ছে না।'

'ওদের হয়তো কোনও অস্তিত্ব নেই, তবে প্রচলিত গল্পটা হলো টোবি ব্রাদাররা পেশাদার খুনি। ভাবছি, এই দুজন টোবি ব্রাদার হতে পারে কি না।' খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে সাংবাদিক ফেদেরাকে। 'কী চাইছিল ওরা?'

'দায়ান বার্নেট সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল,' বলল বারম্যান, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। 'জানতে চাইছিল ওখানে সে একা থাকে কি না।'

'দায়ান বার্নেট? কে সে? কোথায় থাকে?'

রানার আগ্রহ উপলব্ধি করে গড়গড় করে যা জানে সব বলে ফেলছে বারম্যান। 'দায়ান থাকে ব্ল্যাক পিলারসে, চার পাহাড়ের মাঝখানে একটা উপত্যকায়। ছেলেটা যেমন সুদর্শন, তেমনি ভদ্র...গায়ের রঙটা বাদ দিলে অনেকটা আপনার মতই দেখতে। আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে বিয়ার আর হুইস্কি কেনে। মাসে এক-আধবার দেখা হয় ওর সঙ্গে। গত হপ্তায় এদিক দিয়ে গেছে, তবে বারে ঢোকেনি। সঙ্গে একজন ছিল।'

'তা-ই? আর ওর সম্পর্কেই জানতে চাইছিল কালো ড্রেস পরা লোক দুজন?'

মাথা ঝাঁকাল বারম্যান। 'আপনার কি ধারণা...'

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে শ্‌শ্‌শ্‌ করল রানা, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান, স্যাম। দেয়ালও কিন্তু শুনতে পায়।'

'এই মুখে কুলুপ আঁটলাম, মিস্টার ফেদেরা!'

কাউন্টার থেকে সরে এসে একটা টেবিলে বসল রানা, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর চিন্তা করছে। অলিভাকে খুন করবার জন্য ডন মারকাস স্নাইপার পাঠালে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু টোবি ব্রাদারদের কে পাঠিয়েছে? ওরা কাকে খুন করতে এল?

চিন্তায় বাধা পড়ল আয়নায় চোখ পড়তে—হাতে গিটারের বাক্স নিয়ে বারে ঢুকছে একজন নিগ্রো।

লোকটাকে দেখামাত্র রানার পালস্ রেট বেড়ে গেল। ওর নাম গিলবার্ট, স্নাইপার ব্রুনো হপারের যোগ্য সহকারী। গিটারের বাক্সের ভিতর নিঃসন্দেহে একটা রাইফেল লুকানো আছে।

বারম্যান নিচু গলায় কথা বলছে গিলবার্টের সঙ্গে—মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম থেকে অলিভা নামে এক রোগিণী পালিয়েছে...

বিয়ার শেষ করে বার থেকে বেরিয়ে গেল গিলবার্ট। এক মুহূর্ত পর ওর পিছু নিল রানা।

পাশের রোডেই লা ভেরোনা হোটেল, ওটার লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে ব্রুনো হপার—ওকেও দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। ভিতরে ঢুকে সোজা ওর দিকে এগোচ্ছে গিলবার্ট। গুরু-শিষ্য লম্বা একটা সোফায় বসল।

গিলবার্টের পিছু নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলেও, দূরত্ব বজায় রেখে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসল রানা।

নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, চোখ ঘুরিয়ে দুজনেই দেখে নিল আশপাশের কেউ ওদের কথা শুনছে কি না।

'কোনও খবর পেলে?' জিজ্ঞেস করল ব্রুনো।

'মেয়েটাকে কেউ এখনও দেখেনি কোথাও। এলাকায় নাকি টোবি ব্রাদারদের দেখা গেছে,' বলল গিলবার্ট। 'ওরা এখানে কেন? কী করছে?'

'বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বললেন, টোবিরা নিউ ইয়র্ক থেকে আসছে,' বলল ব্রুনো। 'ওখানকার মাফিয়া চিফ,

ডন ব্লুমফিল্ড ওদেরকে ভাড়া করেছে। এই হোটেলেই নাম লিখিয়েছে একটু আগে।'

'কিন্তু এদিকে কী কাজে এল ওরা?' জানতে চাইল গিলবার্ট।

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন।'

'তোমার কি মনে হয় ওরাও অলিভাকে খুঁজছে?' জিজ্ঞেস করল গিলবার্ট।

'অসম্ভব নয়,' বলল ব্রুনো। 'তবে, তা যদি খোঁজেও, দু'দলের উদ্দেশ্য এক বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। আমরা এসেছি মারতে, ওরা হয়তো ঠিক তার উল্টোটা করতে এসেছে।'

'জানি আমরা মারতে এসেছি,' বলল গিলবার্ট। 'কিন্তু কেন মারতে এসেছি তা জানি না। কেন?'

মৃদু হেসে ব্রুনো জবাব দিল, 'আমরা যাঁর অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে এসেছি, মেয়েটার প্রচুর টাকা আর সম্পত্তি আছে তাঁর কাছে—আমরা মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারলে ও-সব তাঁর কাছেই থেকে যাবে।'

'আর টোবিরা উল্টোটা করতে এসেছে?' প্রশ্ন করল গিলবার্ট।

'এটা একটা সম্ভাবনা। ধরো, ডন ব্লুমফিল্ড চাইছেন হয়তো নিজের হেফাজতে কটা দিন বাঁচিয়ে রাখবেন মেয়েটাকে। কেন? মেয়েটাকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলাবার চেষ্টা করবেন।'

'এখন তা হলে আমরা কী করব?' জানতে চাইল গিলবার্ট।

'কাক দুটোকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করা যাবে না,' বলল ব্রুনো। 'আমি তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি, তারপর তুমি ঘুমাবে।'

'ঠিক আছে।'

রানা দেখল সোফা ছেড়ে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ব্রুনো। গিলবার্ট একা সোফায় বসে থাকল।

আধ ঘণ্টা পর অপেক্ষার অবসান হলো। গিলবার্টের সঙ্গে

রানাও দেখল টোবি ব্রাদাররা এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আসছে।

লাউঞ্জ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বাডি আর ফ্রিম্যান, ওদের পিছু নিল গিলবার্ট।

গিলবার্টের পিছনে থাকল রানা।

তেরো

যোসেফের চোখের পাতা এত বেশি ফুলে আছে, মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়ে থাকলেও তা ধরতে পারার কোনও উপায় নেই। রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে দায়ান, ভাইয়ের জন্য যতটুকু সম্ভব আরামের ব্যবস্থাও করেছে।

'আমি এবার অলিভার খোঁজে যাচ্ছি,' হাতের কাজ শেষ করে বলল ও। 'তুমি...'

কিন্তু যোসেফের গলা ফাটানো চিৎকার থামিয়ে দিল ওকে। 'না! অসম্ভব! আমাকে ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না। ডাইনীটা বাইরে কোথাও লুকিয়ে আছে, জানে তুমি খুঁজতে বেরুবে। ঠিক তখনই এসে হাজির হবে। ওর উদ্দেশ্য আমাকে খতম করা!'

'আহ্, চুপ করো তো!' ধমকে উঠল দায়ান। 'আমি যাচ্ছি, চেঁচামেচি করে তুমি সেটা ঠেকাতে পারবে না।'

'বোকামি করো না, দায়ান,' হাঁপাতে শুরু করল যোসেফ, হাত বাড়িয়ে ছোটভাইয়ের নাগাল পেতে চেষ্টা করছে। 'মেয়েটা ডেঞ্জারাস... তোমাকেও ছাড়বে না...তোমার চোখেও আঙুল ঢুকিয়ে দেবে!'

জানালা দিয়ে জোছনা ভরা বাইরেটা দেখল দায়ান। ওর ইচ্ছে হচ্ছে না এই রাতে জঙ্গলে ঢুকতে, কিন্তু অলিভাকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়াও ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ জানে মেয়েটা সম্পূর্ণ অসহায়। ব্যাপারটা অমানবিক হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে বারবার বোঝাচ্ছে ও। অসহায় একটা মেয়েকে তোমার সাহায্য করতে হবে। বিশেষ করে সে যখন তোমাকেই তার নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করে।

মেয়েটি বদ্ধ উন্মাদ নয় তো? ওই অ্যাক্সিডেন্টের ফলে মাথায় সিরিয়াস টাইপের গোলমাল দেখা দিয়েছে? হ্যাঁ, এটাই এর ব্যাখ্যা।

তবে, মাথায় যতই গোলমাল দেখা দিক, ওর কোনও ক্ষতি করবে না অলিভা। যোসেফ ওর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা না করলে তারও কোনও ক্ষতি করত না।

পিস্তলটা যোসেফের হাতে গুঁজে দিয়ে দায়ান বলল, 'আমি যাচ্ছি, যোসেফ। এটা নিয়ে তৈরি থাকো। অলিভা ফিরে আসলে সিলিঙে একটা গুলি করবে। আমি বেশি দূরে যাচ্ছি না।'

দ্রুত হাতে কাপড় পরছে দায়ান, ভাইয়ের প্রতিবাদে কান দিচ্ছে না।

'তুমি আর ফিরবে না,' ফোঁপাচ্ছে যোসেফ। 'আমি জানি তুমি ফিরবে না। ডাইনীটা তোমার জন্যে ওত্ পেতে বসে আছে অন্ধকারে। ও তোমাকে খুন করবে, তখন আমার কি হবে ভেবে দেখেছ? আমি অসহায়! চোখে দেখি না!' বিছানায় উঠে বসল, গলা আরও চড়াচ্ছে। 'আমি অন্ধ! দয়া করো, দায়ান! আমার পাশে থাকো, ভাই! মরা মায়ের কিরে, আমাকে ফেলে যেয়ো না!'

'তুমি কি থামবে না?'

'তা না হলে এক কাজ করো,' বলে বিছানার গদির কিনারা তুলে হাতড়াতে শুরু করল যোসেফ। 'আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো, যেখানে আমার চিকিৎসা করতে পারবে

তুমি। হ্যাঁ, পালাই চলো। নিরাপদ এমন কোনও জায়গা নেই, তুমি চেনো? এই নাও ডিসট্রিবিউটর ক্যাপ...'

যোসেফের বাড়ানো হাত থেকে ক্যাপটা নিয়ে পকেটে রাখল দায়ান। ও জানে, প্রলাপ বকছে যোসেফ। 'ঠিক আছে, তোমার কথা বিবেচনা করা যাবে। আগে অলিভাকে খুঁজে বের করি।' চার ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে উঠানে নেমে এল ও। পাইনবনের মাথার উপর মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদটা, জমিনে লম্বা লম্বা গাঢ় ছায়া পড়েছে।

মিস্টারের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, একা কেমন গা ছমছম করছে দায়ানের। সাবধানে হেঁটে লেকের কিনারায় চলে এল ও। পানির ধারে দাঁড়িয়ে কান পাতল, চোখ দুটো জঙ্গলের ঘন অন্ধকার ভেদ করবার চেষ্টা করছে। ওদিকেই কোথাও গেছে অলিভা, ভাবল ও। হয়তো কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

লেকের কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করল দায়ান। কাছাকাছি একটা গাছ থেকে হঠাৎ ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুকের ভিতরটা ধক ধক করছে। পাইন শাখাকে এলোমেলো করে দিয়ে একটা পাখি বেরিয়ে এল, লেকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বড় করে শ্বাস নিয়ে আবার এগোল দায়ান। সামনের রাস্তা বাঁক নিয়ে লেক থেকে দূরে সরে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। ওদিকে অন্ধকার খুব গভীর দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'অলিভা!' তীক্ষ্নসুরে ডাকল। 'আমি দায়ান। কোথায় তুমি, অলিভা?'

প্রতিধ্বনির আওয়াজ কয়েক সেকেন্ড ভেসে থাকল বাতাসে। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ধীর পায়ে গভীর অন্ধকারে ঢুকল দায়ান। যখন কিছুই দেখতে পেল না, হাতের টর্চটা জ্বালল। উজ্জ্বল রশ্মি সরু পথটাকে আলোকিত করে তুলল।

মাথার উপর ঝুলে থাকা পাইনগাছের শাখাগুলোকে হুমকি

মনে হচ্ছে, যেন চেষ্টা করছে কীভাবে ওর নাগাল পাওয়া যায়। ভয় জয় করে একটু একটু করে এগোচ্ছে দায়ান, মাঝে-মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পাতছে। হঠাৎ করেই অনুভূতিটা হলো, এখানে একা নয় ও— কেউ ওর উপর নজর রাখছে।

টর্চ ঘুরিয়ে চারদিকে আলো ফেলল দায়ান, ঝোপ আর গাছগুলোকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। 'এই, অলিভা, তুমি এখানে?' ডাকল ও, গলাটা একটু কেঁপে গেল। 'আমি দায়ান। তোমাকে খুঁজছি, অলিভা।'

ওর পিছনে, ঝোপের আড়াল থেকে সিধে হলো একটা ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

দায়ানের সামনে মরা একটা ডাল মট করে ভাঙল কেউ। ঝট করে সেদিকে আলো ফেলল ও। পরমুহূর্তে ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠল। টর্চের উজ্জ্বল আলোয় ওখানে এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনের সবকিছুই কুচকুচে কালো, হাতে একটা .৪৫ পিস্তল।

'হ্যান্ডস আপ, দায়ান,' নরম সুরে বলল বাডি।

পিছন থেকে এগিয়ে এল একজোড়া হাত, সার্চ করল দায়ানকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিরশিরে অনুভূতি উঠে এল: কালো ড্রেস পরা আরেক লোককে দেখতে পাচ্ছে।

'কালো একজোড়া কাক! টোবি ব্রাদার্স!' ভাবছে দায়ান, মুখের ভিতরটা শুকিয়ে ব্লটিংপেপার হয়ে গেছে। 'কে তোমরা?' জানতে চাইল, অনেক কষ্টে স্থির রাখতে পারল গলার কাঁপুনি।

'মুখ বন্ধ,' বলল বাডি, পিস্তলের মাজলটা চেপে ধরল দায়ানের পেটের একপাশে। 'প্রশ্ন শুধু আমরা করব। অলিভা কে? আর এখানে কী করছ তুমি?'

'ও আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে এখানে থাকে,' বলল দায়ান। 'আমি ওকে খুঁজছি।'

বাডি আর ফ্রিম্যান দৃষ্টি বিনিময় করল।

'যোসেফ কেবিনে?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল বাডি।

ইতস্তত করছে দায়ান। মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। কয়েক পা হেঁটে গেলে নিজেরাই তাকে দেখতে পাবে ওরা। 'হ্যাঁ,' বলল ও।

'ওকে খুন করতেই এখানে এসেছি আমরা,' দায়ানকে বলল বাডি। 'ডন ব্লুমফিল্ডের টাকা মেরে দিয়েছে ও।' সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'তুমি একে পাহারা দাও, ফ্রেড, আমি যোসেফের খবর নিচ্ছি।'

'কিন্তু মেয়েটার কী হবে, জন?'

'সে না ফিরলে কিছু আসে যায় না। যিশুর দয়ায় ফিরলে তারও ব্যবস্থা করব আমরা,' বলল বাডি। 'তুমি বরং ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসো।' কেবিনের দিকে হাঁটা ধরল ও।

'পা বাড়াও।' দায়ানের পিঠে পিস্তলের খোঁচা মারল ফ্রিম্যান। 'কোনও রকম চালাকি করতে যেয়ো না। বিশেষ করে, কেবিনের কাছাকাছি গিয়ে চিৎকার করলে স্রেফ অকালে মারা যাবে।'

বাডির পিছু পিছু হাঁটছে দায়ান। ও বুঝে নিয়েছে, যোসেফকে খুন করবার পর ওকেও মেরে ফেলা হবে। তবে নিজের কথা ভাবছে না ও। ভাবছে অলিভার কথা। তার কী হবে? বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল—অলিভার কথা মনে পড়া মাত্র গলার কাছে আঁটসাট একটা অনুভূতি হচ্ছে, গোটা অন্তর জুড়ে উথলে উঠছে আবেগ। যত যা-ই ঘটে যাক, সিদ্ধান্ত নিল ও, এই দুই খুনির হাতে অলিভাকে পড়তে দেওয়া যাবে না।

'আমরা তোমাদের কোনও ক্ষতি করছি না,' বলল দায়ান। 'কাজেই...'

'শাট আপ!' ধমক দিল ফ্রিম্যান। 'তোমাকে নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা যোসেফের খোঁজে এসেছি।'

'কেন, কী করেছে ও তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল দায়ান। 'তোমরা যদি টাকার জন্যে এসে থাকো, আমার কাছে প্রচুর

আছে। ওকে তোমাদের খুন করার দরকার নেই।'

'আমাদের টাকা আমরা পেয়ে গেছি,' বলল ফ্রিম্যান। 'যখন কারও কাছ থেকে টাকা নিই, তাকে আমরা সন্তুষ্ট করি। এই নীতিতেই ব্যবসাটা চালাচ্ছি আমরা।'

দায়ান বুঝতে পারছে, ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চেয়ে কোনও লাভ নেই। শিরদাঁড়ায় পিস্তলের গুঁতো খেয়ে হাঁটছে ও, পেটের ভিতর অসুস্থকর একটা আলোড়ন অনুভব করছে। একবার সন্দেহ হলো, গোটা ব্যাপারটা কোনও দুঃস্বপ্ন নয় তো?

কেবিন পর্যন্ত চলে আসা রাস্তার মাথায় কালো একটা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দায়ান, ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে—লম্বা হুড উপত্যকার দিকে তাক করা।

অনেক মাথা ঘামিয়েও ভাইকে বাঁচাবার কোনও উপায় বের করতে পাচ্ছে না দায়ান।

এরইমধ্যে বারান্দায় উঠে খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে কামরার ভিতরে তাকিয়েছে বাডি। যোসেফের দু'চোখে সাদা ব্যান্ডেজ দেখে হাঁ হয়ে গেছে ও। কী হয়েছে ওর? কেউ অন্ধ করে দিয়েছে? কে সে?

ঘরে আলো জ্বেলে রেখে গেছে দায়ান। বিছানায় শুয়ে রয়েছে যোসেফ, পিস্তলটা শক্ত করে ধরা। সারাক্ষণ কান পেতে আছে, প্রতিটি স্নায়ু টান টান, গলায় ফাঁসের মত চেপে বসছে আতঙ্ক। ওর ভয়, যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে এসে ওকে খুন করবে অলিভা।

টোবি ভাইদের কথা ভাবছেই না যোসেফ। ওর মনে একটা বিশ্বাস জন্মেছে, তাদের তরফ থেকে আর কোনও ভয় নেই। যুক্তিটা হলো—তারা যেহেতু প্রতিটি কাজ খুব দ্রুত সারে, এতদিন ওর হদিস বের করতে না পারায়, কখনওই আর খুঁজে পাবে না।

ভাবছে দায়ানের ফিরতে কতক্ষণ লাগবে। আদৌ ফিরবে তো? চোখ দুটোর ব্যথা ভোঁতা হয়ে গেছে, দপদপ করছে

সারাক্ষণ। ভয়ে, নিজের প্রতি করুণায়, অসুস্থ বোধ করছে যোসেফ।

পা টিপে টিপে কামরার ভিতর ঢুকল বাডি। এক সময় বিছানার সামনে পৌঁছে গেল। এই মুহূর্তে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে যোসেফকে, কিন্তু না, প্রথমে ওর কাছ থেকে টাকাটা উদ্ধার করতে হবে।

সময় হোক, এই ব্যাটাকে খুব কষ্ট দিয়ে মারতে হবে, ভাবল বাডি। একের পর এক সহজ মৃত্যু একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

আহত একটা চোখের ভিতরে হঠাৎ চুলকানি ওঠায় পিস্তল ছেড়ে দিয়ে ওখানে হাত তুলল যোসেফ, চোখটার চারপাশে আঙুলের চাপ দিয়ে আরাম পাওয়ার চেষ্টা করছে।

পিস্তলটা বিছানা থেকে তুলে নিল বাডি, নিজের হিপ পকেটে গুঁজে রাখল। অপেক্ষা করছে ও, অন্ধ লোকটাকে দেখছে, ভাবছে যখন বুঝতে পারবে পিস্তলটা ওখানে নেই তখন কী প্রতিক্রিয়া হবে তার।

এক মুহূর্ত পর যেখানে পিস্তলটা ছিল ঠিক সেখানে হাত নামাল যোসেফ। আঙুলগুলো প্রথমে ডানদিকে এগোল, তারপর বামদিকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কী যেন বিড়বিড় করল ও, বিছানার উপরটা দ্রুত হাতড়াচ্ছে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল যোসেফ। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। তারপর বিছানার উপর দু'হাতের ভর দিয়ে ঝট করে উঠে বসল।

খুব সতর্কতার সঙ্গে একটা চেয়ার তুলে এনে বিছানার পাশে রাখল বাডি, কোনও শব্দ না করে বসল সেটায়। যোসেফের আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে দেখে মজা পাচ্ছে ও। মজা পাচ্ছে টার্গেটের অজ্ঞাতে তার এত কাছাকাছি দিব্যি বসে থাকতে পারায়।

'হয়তো মেঝেতে পড়ে গেছে,' আপনমনে বিড়বিড় করল যোসেফ, বিছানার কিনারা থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে কার্পেটে হাত

বুলাচ্ছে।

স্থির হয়ে বসে আছে বাড়ি, ভাঁজ করা হাত দুটো কোলের উপর, কালো স্কার্ফের ভিতরে ডুবে আছে চিবুক। অপেক্ষা করছে ও, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

বাড়ির জুতোর চোখা টো-ক্যাপ ছুঁলো যোসেফের আঙুল। আঙুলগুলো সরে গিয়ে থামল, তারপর ফিরে এল—এবার ধীরে ধীরে, ইতস্তত ভঙ্গিতে। টো-ক্যাপ ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠল ওগুলো, ট্রাউজারের কিনারা ছুঁলো।

এবার থরথর করে কেঁপে উঠল যোসেফ। পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা দাঁতের ফাঁক গলে হিসহিস করে বেরিয়ে এল আটকে রাখা বাতাস।

ওর বিছানার পাশে কে!

ঝট করে হাতটা টেনে নিল যোসেফ, দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে কুঁকড়ে শরীরটাকে ছোট করে ফেলল। 'কে?' এতই বিকৃত শোনাল, নিজের গলার আওয়াজ চিনতে পারল না ও। দর দর করে ঘামছে।

'টোবি,' নরম সুরে বলল বাড়ি, 'ব্রাদার্স।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেয়ালের গায়ে কুঁকড়ে থাকল যোসেফ, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় চলছেই না, চোখে বাঁধা ব্যান্ডেজ ভিজে যাচ্ছে ঘামে। তারপর গলার রগ ফুলিয়ে ডাকল: 'দায়ান! জলদি, দায়ান! আমাকে বাঁচাও!'

'তাকেই কে বাঁচায়!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বাড়ি, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। 'তার ওপর ফ্রিম্যান নজর রাখছে। কেউ আর তোমার কোনও সাহায্যে আসবে না। তোমার এখন একটা কাজই শুধু বাকি, সেটা আমরা করব।'

'একজন অসহায় মানুষকে কীভাবে খুন করো তুমি?' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যোসেফ। 'আমি অন্ধ! ভাল করে দেখো আমাকে। আমি শেষ...বুঝতে পারছ না, আমি একটা মরা মানুষ? একটা

লাশকে তোমরা কীভাবে খুন করো?’

যোসেফের চোখে বাঁধা পট্টির দিকে তাকিয়ে আছে বাডি। ‘চোখের ব্যান্ডেজ খোলো,’ নির্দেশ দিল ও। ‘সত্যি তুমি অন্ধ কি না দেখব।’

‘না, বিশ্বাস করো, সত্যি আমি অন্ধ!’ মুঠো পাকানো হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঠুকছে যোসেফ। ‘ব্যান্ডেজ খুলতে বোলো না, প্লিজ...আবার ব্লিডিং শুরু হবে।’

নিঃশব্দে হাসল বাডি, হাত বাড়াল, ব্যান্ডেজের কিনারা দিয়ে আঙুলের ডগা ঢোকাল ভিতরে, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। ‘হোক না ব্লিডিং।’

আর্তনাদ করে উঠল যোসেফ।

‘একা একা ফুর্তি করো, না?’ বারান্দা থেকে বলল ফ্রিম্যান।

যোসেফের চোখ দুটোর বীভৎস অবস্থা দেখে মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেছে বাডি। ‘ও হে, ফ্রেড,’ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল। ‘এই ব্যাটার চোখ দুটো কে যেন উপড়ে নিয়ে গেছে।’

‘ভাল করেছে,’ বলল ফ্রিম্যান। ‘এবার তুমি ওর হাত-পায়ের নখ উপড়াতে শুরু করো, দেখবে বাপ বাপ করে বলে দিচ্ছে কোথায় রেখেছে চুরির টাকা।’

‘ওকে একবার দেখলে,’ বলল বাডি। ‘তোমার একঘেয়েমি কেটে যাবে।’

‘বিরক্ত করো না তো,’ জবাব দিল ফ্রিম্যান। ‘বন্ধুকে নিয়ে এখানে শান্তিতে আছি আমি।’

‘মিস করছ,’ বলল বাডি। তারপর যোসেফের কাঁধে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে হলো?’

দস্তানা পরা হাতটা ধরে ফেলল যোসেফ, কিন্তু ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল বাডি।

‘ওই ডাইনী করেছে! বদ্ধ একটা উন্মাদ...অসুস্থ!’

‘কার কথা বলছ?’ বাডির মরা চোখে প্রাণ ফিরে এল।

'ওই মেয়েটা...অলিভা...পাহাড়ের ঢালে পেয়েছি আমরা। ওখানে একটা ট্রাক উল্টে পড়ে ছিল...কেবিনে নিয়ে এসে দায়ান ওর সেবা-শুশ্রুষা করেছে...কিন্তু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে...'

সামনের দিকে ঝুঁকল বাডি। 'চেহারার বর্ণনা দাও।'

হাঁপাচ্ছে যোসেফ, সারা মুখে রক্ত আর ঘাম মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। মুখের ভিতরও রক্ত ঢুকছে, ফলে লাল হয়ে উঠেছে দাঁতগুলো। বাডির সামনে ওটা যেন কোনও মানবেতর প্রাণী।

কথা বলবার সময় ওর মুখে রক্তের ছিটা দিল যোসেফ, ঝট করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল বাডি। 'দেখতে ভাল... মাথায় লাল চুল।'

'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না,' দস্তানা পরা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল বাডি। ওর হাতে একজোড়া প্লায়ার্স বেরিয়ে এসেছে। 'এবার আসল কথায় এসো।' অপর হাতে যোসেফের কড়ে আঙুলটা ধরে নাড়াচাড়া করছে। তারপর প্লায়ার্সের দুই চোয়ালের মাঝখানে ঢোকাল ওটা।

'কী করছ তুমি?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল যোসেফ।

'টাকাটা কোথায়?' উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল বাডি। 'তিন মিলিয়ন ডলার?'

'কীসের টাকা, ভাই!' না বোঝার ভান করল যোসেফ। 'কীসের তিন মিলিয়ন...'

প্লায়ার্সের হাতলে খুব জোরে বাডি চাপ দিতেই কট করে আওয়াজ হলো, একটা গিঁট সহ যোসেফের কড়ে আঙুল ডান হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝেতে পড়ল। একই সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করেছে যোসেফ।

মিনিট দুয়েক চুপ করে থাকল বাডি। যোসেফের চিৎকার ধীরে ধীরে কমে এল। এখন শুধু ফোঁপাচ্ছে। আবার ওর একটা হাত ধরল বাডি।

শিউরে উঠে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল যোসেফ, কিন্তু

প্রচণ্ড ব্যথায় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বাডির সঙ্গে পারছে না।

'কোথায়?' নরম সুরে আবার প্রশ্ন করল বাডি, এবার যোসেফের বাম হাতের কড়ে আঙুল জোড়া প্লায়ার্সের মাঝখানে আটকে ফেলেছে। 'সত্যি কথা বলবে, ঠিক আছে?'

'বললে মারবে না তো?' করুণ সুরে জিজ্ঞেস করল যোসেফ।

'দেখো না কী করি!'

'না, ভাই,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল যোসেফ, 'কথা দাও টাকা পেলে মারবে না...'

'আচ্ছা, দিলাম।'

'ওহাইয়োয়, সিটি ব্যাঙ্কের লকারে,' বলল যোসেফ, থেমে থেমে কাঁদছে। 'কম্বিনেশন লকের কোড: নাইন-জিরো-নাইন-জিরো-নাইন-ওয়ান। চাবিটা আমার জুতোয় আছে। চকলেট রঙের জুতো, ডান পাটিতে, সুকতলার নীচে।'

জুতোটা খুঁজে নিয়ে চাবিটা বের করে নিল বাডি। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'টাকা পাওয়া গেল, নাকি?' বলল ফ্রিম্যান, ভ্রূ কুঁচকে দেখছে বাডিকে। 'এবার বাকি কাজ শেষ করো...'

'পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলারের মালিক,' ঝাঁঝাল সুরে প্রশ্ন করল বাডি, 'লালচুলো সেই পাগলী মেয়েটার কথা মনে আছে? বারম্যান যার কথা বলছিল, স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়েছে?'

'মনে আছে।'

'ওই মেয়ে এখন এখানে,' বলল বাডি।

খিকখিক করে হাসল ফ্রিম্যান। 'কত বড় কপাল নিয়ে জন্মেছি আমরা, তাই না? না চাইতেই কত কিছু পেয়ে যাই।' পিস্তলের খোঁচা দিল দায়ানকে। 'কোথায় সে, অ্যাঁই?'

'তোমরা কী বলছ কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' বলল দায়ান, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

'খুবই পরিষ্কার বুঝতে পারছ। লালচুলো মেয়েটা...অলিভা,

এটাই তার নাম না? কোথায় সে?'

'অলিভা পালিয়েছে।'

'সে-ই কি যোসেফের ওই হাল করেছে?' জিজ্ঞেস করল বাডি।

মাথা ঝাঁকাল দায়ান। 'তবে পাগল নয় ও, ভয় পেয়েছে...'

'ঠিক আছে, পাগল নয়,' বলল বাডি, ফ্রিম্যানের দিকে ফিরে চোখ মটকাল। 'কিন্তু তাকে খুঁজে বের করাটা খুব জরুরি।' লেকের উপর দিয়ে দূরের পাহাড় সারির উপর চোখ বুলাল ও। 'পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলার পেলে নিজেকে আমার ওই চূড়াগুলোর মত মনে হবে।'

'একেবারে আমার মনের কথা!' হাসল ফ্রিম্যান। 'তবে আগের কাজ আগে। অভাগাটার কী হবে?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। ওর কথা আমি ভুলিনি। এখনই ব্যবস্থা করব আমরা। কীভাবে করা যায়, বলো তো?'

'ডন ব্লুমফিল্ড চেয়েছেন কাজটা আমরা যেন ধীরে ধীরে করি,' বলল ফ্রিম্যান। 'ওকে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে। ডুবে মরাটা খুব কষ্টের। ওকে আমরা লেকে চুবিয়ে মারতে পারি।'

মাথা নাড়ল বাডি। 'সবকিছু চোবানোর অদ্ভুত একটা প্রবণতা আছে তোমার মধ্যে। যখনই কাউকে চোবাতে গেছ, নিজে ভিজে একাকার হয়ে গেছ। ও-সব বাদ।'

'ঠিক আছে, বাদ,' বলল ফ্রিম্যান। 'তা হলে...শিরা কেটে দিই?'

'ওর জন্যে একদম সহজ মৃত্যু হয়ে যায়। তা ছাড়া, চারদিক নোংরা হয়ে যাবে। ভাবছিলাম এদের দুজনকে সরিয়ে দেয়ার পর এখানে কদিন বিশ্রাম নেব আমরা। জায়গাটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। কেবিনটা নোংরা করতে চাই না।'

'ঠিক বলেছ!' সায় দিল ফ্রিম্যান। 'লালচুলো মেয়েটাকে আটকে রেখে যা খুশি তা-ই করলাম, তারপর ওকে দিয়ে সাদা

কাগজে আর স্ট্যাম্পে সই করিয়ে নিলাম? সব সয়-সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কের টাকা যাতে হাত করতে পারি?'

'সে-সব পরে ঠিক করব,' বলল বাডি। 'তবে আইডিয়াটা অনেকটা সেরকমই।'

'আমাকে চিন্তা করতে দাও, দেখি কোনও আইডিয়া পাই কি না,' বলল ফ্রিম্যান। কয়েক সেকেন্ড পর হাসল ও। 'এক বালতি গুড়ের ভেতর ওর মুখটা আমরা ঠেসে ধরতে পারি। শ্বাস বন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে মারা যাবে ও।' দায়ানের দিকে তাকাল। 'কি হে, এখানে গুড় পাওয়া যাবে তো?'

মাথা নাড়ল দায়ান, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বারান্দায় বেরিয়ে আসছে যোসেফ। 'ওকে তোমরা মাফ করে দিচ্ছ না কেন?' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'টাকা তো ফেরত দিয়ে দিল, মারতেই হবে কেন?'

বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল যোসেফ, মাথাটা ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। টোবি ব্রাদাররা দায়ানের সঙ্গে কথা বলছে ওর দিকে পিছন ফিরে।

'ওকে আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, আগুনের আঁচ পাব, কফি তৈরি করা যাবে,' দায়ানের কথায় কান না দিয়ে বলল বাডি।

'এরচেয়ে ভাল আইডিয়া আর হতে পারে না,' প্রশংসা করল ফ্রিম্যান। 'কবর খোঁড়ার খাটনি থেকেও রেহাই পাব আমরা।'

এই সময় প্রাণ হাতে করে দৌড় দিল যোসেফ। বারান্দার কিনারা থেকে ছিটকে দড়াম করে উঠানে পড়ল, একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো আবার, তারপর অন্ধের মত ছুটছে...জানে না, কোনদিকে, কোথায়।

ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই ওকে দেখতে পেল টোবিরা।

'বাঁয়ে থাকো, যোসেফ!' লেকের দিকে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করে ভাইকে সাবধান করে দিল দায়ান।

দিক বদলে পাইনবনের দিকে ছুটল যোসেফ।

'ও আসলে ভেবেছেটা কী, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল বাড়ি, হেসে উঠল, তারপর পিস্তল ধরা হাতটা তুলল।

নড়ে উঠছে দায়ান, কিন্তু পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে পাঁজরে প্রচণ্ড গুঁতো মারল ফ্রিম্যান। ফুসফুস খালি হয়ে গেল ওর।

কান ফাটানো শব্দে গুলি হলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল যোসেফ। এক মুহূর্ত ওখানে স্থির হয়ে পড়ে থাকল, তারপর ঘাস ঢাকা জমিনের উপর দিয়ে ক্রল শুরু করল, বাম পা অসাড় হয়ে আছে।

কোনও ব্যস্ততা নেই, যোসেফের উপর একটা চোখ রেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল বাড়ি। 'মিস্টার বয়েড ব্লুমফিল্ড, স্যর, আমি জন বাড়ি,' বোতাম টিপে কানেকশন পাওয়ার পর বলল। '...জী, স্যর যোসেফকে পেয়েছি। বলছে ওহাইয়োয়, সিটি ব্যাঙ্কের লকারে টাকাটা রেখেছে। কম্বিনেশন লকের কোড: নাইন-জিরো-নাইন-জিরো-নাইন-ওয়ান। একটু বেলা হলে চাবিটা কুরিয়ার যোগে পাঠিয়ে দেব...মাই প্লেযার, স্যর।' মোবাইল বন্ধ করে রেখে দিল পকেটে।

'বস্ খুশি, তাই না?'

'বেজায়। এবার ওর খেলাটা এবার শেষ করে দিই,' বলল বাড়ি, বারান্দার ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। উঠানে নেমে যোসেফের দিকে এগোল, পাশ কাটানোর আগে ওর পাঁজরে কষে দুটো লাথি মারল। বেশ খানিকটা হেঁটে কালো ক্যাডিলাকের দিকে যাচ্ছে।

'যিশুর দয়ায় এখনই একটা জিনিস দেখতে পাবে তুমি,' দায়ানকে বলল ফ্রিম্যান। 'বাড়ির মাথায় ঘিলু আছে, আর আছে স্টাইল—এমন স্টাইল, আগে যা কখনও দেখোনি।'

এখনও মরিয়া হয়ে ক্রল করছে যোসেফ, হয়তো জানেও না যে ঘুরে আবার লেকের দিকে যাচ্ছে ও। পিছনে, বেলে মাটিতে, রক্তের মোটা একটা ধারা রেখে যাচ্ছে।

ক্যাডিলাকের পিছনে থামল বাডি, বুট খুলে গ্যাসোলিন ভর্তি একটা ক্যান বের করল, ফিরে আসছে যোসেফের দিকে।

ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে কেঁদে উঠল যোসেফ, চেষ্টা করল আরও দ্রুত ক্রল করবার, তারপর একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। 'আমাকে ছুঁয়ো না!' বাডি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে ফুঁপিয়ে উঠল ও। 'ফর গড'স সেক, আমাকে মাফ করে দাও...'

'ডন ব্লুমফিল্ড বলেছেন, তিনি চান তুমি যেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করো,' বলল বাডি, ক্যানভর্তি গ্যাসোলিন ঢালছে যোসেফের সারা শরীরে।

ঘরের ভিতর নিয়ে এসে নাইলনের রশি দিয়ে দায়ানের হাত-পা বাঁধল বাডি।

'এত কষ্ট করছ কেন?' জানতে চাইল ফ্রিম্যান। 'বেঁধে না রেখে কাজটা সেরে ফেলো, তারপর চলো পাগলীটাকে খুঁজি। এ ব্যাটা তো আমাদের কাজের প্রত্যক্ষদর্শী, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে দুজনকে।'

কী ভেবে যেন মাথা নাড়ল বাডি। 'না, আগে মেয়েটাকে পেতে হবে,' বলল ও। 'এ তো আর পালাচ্ছে না।'

চোদ্দো

বাডি আর ফ্রিম্যানের পিছু নিয়ে ব্ল্যাক পিলারস্-এর দায়ান'স রান্শ্-এ পৌঁছাল গিলবার্ট, হাতে সেই গিটারের বাক্স। সাদা একটা পিকআপ ভ্যান চালিয়ে এসেছে ও, পার্ক করেছে টোবি

ব্রাদারদের ক্যাডিলাক থেকে দুশো গজ পিছনে, গাছপালার আড়ালে।

পাইনবনের ভিতর দিয়ে বাড়ি আর ফ্রিম্যানকে অনুসরণ করবার সময় কপাল খুলে গেল গিলবার্টের।

হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলছে, 'এই, অলিভা, তুমি এখানে? আমি দায়ান। তোমাকে খুঁজছি, অলিভা... ।' সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিল টোবি ব্রাদাররা। ওদের দেখাদেখি গিলবার্টও।

সঙ্গে নাইটগ্লাস আছে, সেটা চোখে তুলতেই দেখতে পেল কী হচ্ছে। সুদর্শন তরুণ দায়ানকে আটক করবার পর কিছুক্ষণ জেরা করল বাড়ি আর ফ্রিম্যান, তারপর ওকে নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেল ওরা। ইতিমধ্যে গিলবার্টের জানা হয়ে গেছে, এখানেই আছে অলিভা—এই পাইনবনের ভিতর কোথাও। সিদ্ধান্ত নিল, এখানেই অপেক্ষা করবে ও।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ওর নাইটগ্লাসে ধরা পড়ল কয়েকটা ঝোপের মাঝখান দিয়ে কে যেন দৌড়াচ্ছে। দিশেহারা, সন্ত্রস্ত মনে হলো তাকে, বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। একটা নারীমূর্তি।

কাজে কোনও রকম ভুল করা চলবে না, এই মেয়েটাই অলিভা কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পকেট থেকে একটা ফটো বের করল গিলবার্ট।

মেয়েটা বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে বলে ফটোর সঙ্গে ওর চেহারা মেলাতে কোনও সমস্যা হলো না। হ্যাঁ, এই মেয়েই অলিভা, একে খুন করবার কাজই দেওয়া হয়েছে ওদেরকে। কোনও সন্দেহ নেই।

গিটার-কেস থেকে রাইফেলটা বের করে প্রস্তুতি নিল গিলবার্ট। পঞ্চাশ গজ দূরের বড় একটা ঝোপের ভিতর ঢুকেছে অলিভা, দেখে রেখেছে ও। রাইফেলেও নাইট-গ্লাস ফিট করা

আছে, কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই। ঝোপটা থেকে বেরুনো মাত্র মারা যাবে অলিভা। ব্রুনো হপারের সাগরেদ, এই দূরত্বে আজ পর্যন্ত কোনও টার্গেট মিস করেনি।

এখন শুধু ঝোপটা থেকে অলিভা বেরিয়ে এলেই হয়।

গিলবার্টের সে আশাও একটু পর পূরণ হলো। ধীরে ধীরে, যেন আদর্শ টার্গেট হতে চায়, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে অলিভা।

রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করল গিলবার্ট। আপনমনে হাসছে ও, ওর এই সাফল্যে ভারি খুশি হবে ওর গুরু ব্রুনো হপার। এবং ডন মারকাসের কাছ থেকে পাওয়া যাবে মোটা ইনাম।

ট্রিগারে টান দিতে শুরু করেছে গিলবার্ট, এমনি সময়ে চমকে উঠল প্রচণ্ড এক গর্জনে, পরমুহূর্তে ব্যথায় কাতরে উঠল সে, কী যেন পা কামড়ে ধরেছে ওর। লাথি ছুঁড়ল ও, কামড় ছেড়ে ছুটে চলে গেল মিস্টার।

আবার কাঁধে রাইফেল তুলল গিলবার্ট, কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে অলিভা। আকাশের গায়ে ফুটে রয়েছে রাইফেলসহ ওর কাঠামোটা। রাইফেলের নল এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে খুঁজছে মেয়েটাকে।

রানা কোনও শব্দ করে ওকে চমকে দিল না—প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারের মাজলটা শুধু ঠেকাল ওর ঘাড়ের পিছনে। গিলবার্টের পিছু নিয়ে ব্ল্যাক পিলারসে পৌঁছালেও, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে পড়েছিল রানা, ফলে জঙ্গলের ভিতর একসময় ওকে হারিয়ে ফেলেছিল।

দায়ানের সঙ্গে টোবি ভাইদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, এ-সব ওর জানা নেই। ওরা এখন কোথায় কী করছে, তা-ও জানে না।

অলিভাকেও দেখেনি রানা, তবে গিলবার্টের আচরণ দেখে বুঝতে পেরেছে কাউকে গুলি করতে যাচ্ছে সে।

কখন বোকার মত সাহস দেখাতে নেই, জানে গিলবার্ট। রানার নির্দেশে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাতের রাইফেল ফেলে দিল ও। রানা ওকে সার্চ করবার সময় বাধাও দিল না।

গিলবার্টকে মাটিতে ফেলে হাত-পা বাঁধল রানা, তারপর জেরা শুরু করল। 'কাকে গুলি করতে যাচ্ছিলে?'

'কই? ও, হ্যাঁ, একটা বুনো শুয়োরকে,' বলল গিলবার্ট।

ওকে সার্চ করে পাওয়া অলিভার ফটোটা দেখাল রানা। 'এই তোমার বুনো শুয়োর?'

হেসে উঠল গিলবার্ট, বলল, 'আরে, ও তো আমার ফিয়াঁসে! ওকে আমি ভালবাসি, গুলি করতে যাব কেন?'

রানা বুঝল, বৃথা সময় নষ্ট করছে ও, ডন মারকাসের ভয়ে মুখ খুলবে না গিলবার্ট। তারপরেও শেষ একবার চেষ্টা করল, 'আমি জানি অলিভাকে মারতে এসেছ তোমরা, কিন্তু টোবি ব্রাদাররা এখানে কেন?'

'প্রথম কথা, আবার বলছি, আমি কাউকে মারতে আসিনি। টোবি ব্রাদার্স...সেটা অন্য গল্প,' বলল গিলবার্ট। 'ডন ব্লুমফিল্ডের টাকা মেরে দিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে যোসেফ, আশ্রয় নিয়েছে ভাই দায়ানের কাছে। কালো কাকেরা অলিভাকে নয়, মারতে এসেছে ওই যোসেফকে।'

'ওরা এখন কোথায়?'

মাথা নাড়ল গিলবার্ট। 'তুমি কে না কে, আমি আর কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না। প্রয়োজনে যা বলার বলব পুলিশকে।'

পুলিশকে বলবে? রানার মাথায় অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল—এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারা যায়, মন্দ কি! 'ঠিক আছে,' বলে মোবাইল বের করে পুলিশ স্টেশনে ফোন করল ও। 'আমি রডরিক ফেদেরা, শেরিফ কুপারকে দিন, প্লিজ।'

শেরিফ কুপারকে পাওয়া গেল না, রানার সব কথা শুনে ডেপুটি শেরিফ জন লেস্টার জানাল, এই মুহূর্তে ওদের লোকবল

খুব কম হওয়ায় থানা থেকে ব্ল্যাক পিলারসে কাউকে পাঠানো সম্ভব নয়; তবে মিস্টার ফেদেরা যদি বন্দি গিলবার্টকে উত্তর রাউন্ডভেল রোডে ধরে আনতে পারেন, তা হলে ওখানে টহল দিচ্ছে এমন একটা কার তাকে তুলে নেবে।

অগত্যা তাতেই রাজি হলো রানা। হিসাব করে দেখল, যেতে আসতে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না ওর।

গিলবার্টের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে পিস্তলের মুখে ওকে সাদা পিকআপ ভ্যানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

অলিভার মাথায় কিছু একটা হয়েছে। যেন কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে ওর মগজ উল্টে গেছে। সেই সঙ্গে স্বপ্নময় অস্পষ্ট যে জগৎটায় বাস করছিল, এক নিমেষে সেটা জ্যান্ত ও বাস্তব হয়ে উঠেছে।

এইমাত্র যে-সব জিনিসের কিনারা ঝাপসা লাগছিল, রং ছিল নিষ্প্রভ, শব্দ ছিল অস্পষ্ট, সেগুলো তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল আর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এতক্ষণ অলিভা ভাবছিল পাইনবনটা নিশ্চয়ই স্বপ্নের ভিতর দেখছে সে, কিন্তু এখন উপলব্ধি করছে ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলে এসেছে এখানে—ওর কাছে এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে, সাবধানে, কেবিনের দিকে ফিরছে অলিভা। গা ছম ছম করছে ওর; কারণ ভূত, পেত্নী, অশরীরী আত্মা ইত্যাদি যেখানে যা কিছু আছে সবাই ওকে ভয় দেখাচ্ছে।

ভয় তাড়ানোর জন্য মনটাকে ব্যস্ত রাখছে ও, স্মরণ করতে চাইছে জেগে ওঠার আগে স্বপ্নের ভিতর কী দেখছিল। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে, ওর কামরায় ঢুকেছিল যোসেফ। সম্ভবত ঠিক তখনই ওর মাথার ভিতরে আওয়াজটা হয়, সেই সঙ্গে উল্টে যায় মগজটা। এরকম অতীতেও হয়েছে, তবে ঠিক কবে তা মনে করতে পারছে না।

আসলে কোনও স্বপ্নই এখন আর পরিষ্কার মনে পড়ছে না। ভাবল, পাইনবনে কী কারণে এসেছে? খেয়াল হতে এতক্ষণে লজ্জা পেল, অর্ধনগ্ন অবস্থায় কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

তারপর ভাবল দায়ান কি জানে ব্যাপারটা? ও কি আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেবিনে ফিরে গিয়ে পা'জামা জ্যাকেটটা পরে ফেলতে হবে। কারণ এই অবস্থায় দায়ান ওকে আবিষ্কার করলে ভীষণ লজ্জা লাগবে ওর। সুন্দর চেহারার সুপুরুষ ওই তরুণ যেন খুব প্রিয় কারও হুবহু প্রতিচ্ছবি বলে সন্দেহ হয়—যদিও শত চেষ্টা করেও প্রিয়জনের চেহারাটা ঠিক কেমন ছিল মনে করতে পারছে না। জানে, এ এক অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী ব্যাপার।

লেক থেকে শুরু হওয়া মেঠো পথ ধরে কেবিনের দিকে ফিরছে, এই সময় সামনের পথে টোবি ব্রাদারদের দেখতে পেল অলিভা, ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। চাঁদের আলোয় ও শুধু তাদের কালো কাপড়চোপড় দেখতে পেল, তবে সেটাই যথেষ্ট।

ওদের পরিচয় জানে না অলিভা, কিন্তু দেখামাত্র সাংঘাতিক ভয় গ্রাস করল ওকে। চট্ করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা, উঁকি মেরে দেখছে ওদের। বাতাসে চামড়া আর মাংস পোড়ার দুর্গন্ধ খুব অসুস্থ করে তুলছে। কী পুড়ছে? দায়ান...

ঘুরে ওর দিকে হেঁটে আসছে লোক দুজন। পাইনবনে ঢুকে ওকে পাশ কাটাল, ধনুকের মত বাঁকা লেকের আরেক দিকে যাচ্ছে।

লোকগুলোকে কাছ থেকে দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল অলিভা। তারপর, যেন বিরাট একটা লাফ দিয়ে, দায়ানের কাছে চলে গেল ওর মন। হঠাৎ দুর্বল লাগছে শরীরটা, ভাবছে দায়ানের কোনও ক্ষতি করেনি তো ওরা।

লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতে কেবিন লক্ষ্য করে ছুটল অলিভা, বুকের ভিতর অসম্ভব তোলপাড় শুরু হয়েছে।

উঠান পেরুবার সময় যোসেফকে দেখতে পেল ও, যে-টুকু অবশিষ্ট আছে। ওর কাছে অচেনা একটা জিনিস ওটা, আরেকটা স্বপ্নের খুদে কোনও অংশ। ওদিকে ভাল করে তাকালও না, নিজেকে বিশ্বাস করতে বলছে জিনিসটার অস্তিত্ব শুধুমাত্র ওর মগজে, আর কোথায় নেই। এই মুহূর্তে ওর একমাত্র কাজ আলোকিত কেবিনটায় পৌঁছে দায়ান নিরাপদে আছে কি না দেখা।

ধাপ বেয়ে দ্রুত উঠে এল বারান্দায়, ছুটে এসে থামল দোরগোড়ায়, আলোকিত সিটিং রুমের ভিতর তাকাল।

মেঝেতে পড়ে রয়েছে দায়ান, হাত-পা নাইলন রশি দিয়ে বাঁধা। অলিভাকে দেখে মনটা অসম্ভব উতলা হয়ে উঠল, তার প্রতি ওর ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বুঝল, জীবনে আর কোনও মেয়েকে কখনওই এভাবে ভালবাসতে পারবে না ও।

উঠে বসবার চেষ্টা করছে দায়ান। 'অলিভা!' বলল ও। 'জলদি, ডার্লিং। রশি খুলে দাও।'

ছুটে এসে ওকে আদর করছে মিস্টার। চাটছে, গা ঘষছে ওর গায়ে।

দ্রুত ওর কাছে চলে এল অলিভা। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আলিঙ্গন করল ওকে। 'তুমি আহত?' জিজ্ঞেস করল অলিভা, দায়ানের মুখের একেবারে কাছে ওর ঠোঁট। 'বলো তুমি আহত হওনি!'

'আমার কিছুই হয়নি, রশিটা খোলো তাড়াতাড়ি! আমাদের দুজনেরই খুব বিপদ, অলিভা।'

'দায়ান, আমার দায়ান,' বিড়বিড় করছে মেয়েটা, ঠোঁট ঘষছে ওর গালে। 'তোমাকে নিয়ে কী ভয় যে পাচ্ছিলাম!'

'সব ঠিক আছে,' বলল দায়ান। 'এবার রশিগুলো খোলো।'

নাইলন রশির গিঁটগুলো খুলতে চেষ্টা করে পারল না অলিভা। কিচেন থেকে ছুরি আনতে গেল। ছুরি নিয়ে ফেরার সময় দায়ানের জ্যাকেটটা দেখতে পেয়ে পরে নিল ব্যস্ত হাতে।

অলিভাকে সিটিং রুমে ফিরতে দেখে আবার তাগাদা দিল দায়ান, 'জলদি, অলিভা, জলদি! এখুনি ফিরে আসবে ওরা।'

ছুরি চালিয়ে দ্রুতই বাঁধনগুলো কাটল অলিভা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল দায়ান, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে আর কবজি ডলছে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি দেখো,' আশ্বাস দিয়ে বলল ওকে। 'তবে এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না।'

এগিয়ে এসে দায়ানকে আলিঙ্গন করল অলিভা; এত জোরে চাপ দিচ্ছে, ওকে যেন পিষে ফেলবে। 'তোমাকে আমি ভালবাসি, দায়ান। ওদের দুজনকে দেখে এত ভয় পেয়েছি! ভাবলাম...জানি না তোমাকে ছাড়া কীভাবে বাঁচব আমি।'

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আনন্দে লেজ নাড়ছে তাগড়া কুকুরটা।

অলিভাকে একটু সরিয়ে দুজনের মাঝখানে একটু ফাঁক তৈরি করল দায়ান, তারপর চুমো খেল ওর ঠোঁটে।

একটু পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অলিভা। 'তুমি না বলছিলে আমাদের দেরি করা চলবে না?'

'হ্যাঁ। তোমার কাপড় নিয়ে এসো, জলদি।'

নিজের বেডরুমে চলে গেল অলিভা। বারান্দায় বেরিয়ে এসে উঠানে চোখ বুলাল দায়ান। চাঁদের আলোয় যতদূর দেখা যাচ্ছে কিছুই নড়ছে না। টোবি ব্রাদারদের ফিরে আসবার কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। পালাবার এটাই সুযোগ।

বারান্দায় অলিভার পায়ের আওয়াজ হতেই ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল দায়ান। ছুটে পাশে চলে এল অলিভা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসল—চোখ দুটোয় রাজ্যের বিশ্বাস আর ভরসা থই থই করছে।

‘তুমি গাড়ি চালাতে পার তো?’ টয়োটা ভ্যানের দিকে হাঁটার সময় জানতে চাইল দায়ান।

‘পারি।’

‘তা হলে যাও, ড্রাইভিং সিটে বসো।’

হন হন করে উঠানটা পার হয়ে এসে নীল ভ্যানের বনেট খুলল দায়ান, ডিসট্রিবিউটরের ক্যাপটা জায়গামত লাগাল।

বনেট বন্ধ করে দেখল ওর কথামত ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছে অলিভা।

এই সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও। ‘দায়ান, ওরা তোমার পেছনে!’

পাইনবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাডি আর ফ্রিম্যান দেখল, নীল ভ্যানটার বনেট বন্ধ করছে দায়ান। তারপর শুনতে পেল ওকে সাবধান করে দিল অলিভা।

‘অলিভা, গাড়ি ছাড়ো!’ গলা চড়িয়ে তাগাদা দিল দায়ান।

‘কী! আর তুমি?’

‘দরজা খোলা রাখো, আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়ব!’

‘স্টপ!’ হুঙ্কার ছাড়ল বাডি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘেউ করে একটা হুঙ্কার ছাড়ল মিস্টার, লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে। বাডির হাতের পিস্তলও গর্জে উঠল। মিস্টার তখন শূন্যে, খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। ভারী বস্তার মত বাডির পায়ের সামনে পড়ল কুকুরটা, মারা গেছে।

দায়ান’স রান্‌শে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল রানার।

উত্তর রাউন্ডভেল রোডে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল টহল পুলিশের একটা কার। ওদের লিডার লেফটেন্যান্ট শন মিচেল।

নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল রানা, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে মিচেল বলল, ‘আমি জানি।’

ওর মুখে মাফিয়া ডনের ভাড়াটে খুনি গিলবার্ট সম্পর্কে সব কথা শোনার পর গম্ভীর হয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট শন মিচেল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরকম একটা কাজ করায় প্রশংসা করেছে সে, ধন্যবাদ জানিয়েছে।

হাত বাঁধাই ছিল, নতুন করে পা বেঁধে গিলবার্টকে রাস্তার ধারে শুইয়েছে শন মিচেল, তারপর হাতের তালুতে পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে নির্দেশ দিয়েছে—ফোন করে ব্রুনো হপারকে বলো, অলিভা কোথায় আছে তুমি জানো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে চলে আসুক। তা না হলে এক এক করে তোমার হাতের তালু আর পায়ের পাতা ফুটো করা হবে।

গিলবার্ট পুলিশকে যতটা না ভয় পায় তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় পায় মাফিয়াকে। তার মুখের সামনে মোবাইল ফোনটা ধরতেই চেঁচিয়ে উঠেছে: 'ব্রুনো, পালাও!'

হুমকি দিলেও, শন মিচেল ওর হাতের তালুতে গুলি করেনি। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ স্টেশনে।

গিলবার্টের পিকআপ নিয়েই আবার ফিরে এসেছে রানা ব্ল্যাক পিলারস, অর্থাৎ দায়ান'স রান্‌শে। গাড়িটা আগের জায়গায় লুকিয়ে রেখে ছোটখাট কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পার হয়েছে ও, তারপর পাইনবনের ভিতর ঢুকেছে।

পাইনবনের দুই প্রান্ত থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা—একদিক থেকে বেরুল বাডি আর ফ্রিম্যান, আরেকদিক থেকে রানা। পরিষ্কার চিনতে পারল রানা দুজনকে।

চোখে নাইট-গ্লাস পরে আছে, নীল টয়োটা ভ্যানের ভিতরে বসা অলিভাকে দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। তারপর দেখল গাড়িটার সামনের বনেট বন্ধ করছে এক তরুণ—ওর মতই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, চেহারাও যেন খানিকটা মেলে।

এই সময় অলিভার চিৎকার শুনল রানা: 'দায়ান, ওরা তোমার পেছনে!'

পাইনবন বরাবর সরল রেখা ধরে নিজের ডান দিকে তাকাল রানা, কালো কাক দুটোকে দেখতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক।

'স্টপ!' কর্কশকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল বাডি। পরমুহূর্তে শুনতে পেল কুকুরের গর্জন, তারপর গুলির আওয়াজ, ধপ্ করে শূন্য থেকে মাটিতে পড়ল বিশাল কুকুরটা।

দৌড় শুরু করেছে বাডি, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে গুলি করল দ্বিতীয়বার।

গুঙিয়ে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়ল দায়ান। দু'হাতে বুক চেপে ধরেছে।

'শেষ করো শালাকে!' চেঁচিয়ে বলল ফ্রিম্যান, ওর হাতেও পিস্তল বেরিয়ে আসছে।

দূরত্ব এত বেশি, গুলি লাগবে বলে মনে হয় না; তারপরেও ফ্রিম্যানকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল রানা।

প্রথমে একটা ঝাঁকি খেল ফ্রিম্যান, তারপর বিচ্ছিরি গালি দিয়ে বসে পড়ল উঠানের মাঝখানে, আহত হাতটা চেপে ধরেছে অপর হাতে। জখমটা মোটেও গুরুতর নয়, হাতে সামান্য দাগ কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

বিপদ টের পেয়ে ডাইভ দিল বাডি, ক্রল করে একটা নিঃসঙ্গ নিমগাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে। এটাও অসম্ভব টার্গেট, তারপরেও গুলি করল রানা। কিন্তু লাগাতে পারল না।

ক্রল করে নিমগাছের দিকে কিছুটা এগোল ও। আবার গুলি করতে যাচ্ছে—এবার গাছের পাশে বেরিয়ে থাকা বাডির পা লক্ষ্য করে।

হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে দায়ান। নিমগাছের আড়াল থেকে ওকে লক্ষ্য করে আবার গুলি করল বাডি।

দুটো শব্দ হলো। রানা গুলি করেছে বাডির চেয়ে এক সেকেন্ড আগে। হাত কেঁপে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বাডি।

রানার গুলিও লাগেনি তাকে।

বিরতি না দিয়ে, দুই কি তিন সেকেন্ডের মাথায়, ফ্রিম্যানকে লক্ষ্য করেও আরেকটা গুলি করল রানা। কালো ক্যাডিলাকের দিকে ছুটছিল সে।

বাড়ির চতুর্থ বুলেট দায়ানের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রানার বুলেটও ফ্রিম্যানকে লাগল না, তবে গুলি খাওয়ার ভয়ে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে, ক্যাডিলাকের কাছে পৌঁছানোর প্ল্যানটা আপাতত বাদ দিয়েছে।

'আমি গুলি খেয়েছি, অলিভা!' হাঁসফাঁস করছে দায়ান। দরজার কাছে পৌঁছে হাঁটুর উপর সিধে হলো, গাড়ির ভিতর ঢুকতে চাইছে, ঢলে পড়ল সিটের উপর। কোথায় গুলি খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, অলিভা দেখল ওর একটা হাত বেয়ে রক্ত নেমে আসছে।

পাশে ঝুঁকে দায়ানকে গাড়ির ভিতর টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল সিটে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্যাডিলাকের দিকে ছুটছে শত্রুদের একজন, এক মুহূর্ত পর তার পিছু নিল আরেকজন।

ভ্যানের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল অলিভা।

দাঁড়িয়ে পড়ল বাড়ি, জানে রানার পিস্তল ওর নাগাল পাবে না, হাত তুলে লক্ষ্যস্থির করছে ড্রাইভিং সিটে বসা অলিভার দিকে।

কিন্তু ছুটে এসে ওর হাতটা খামচে ধরল ফ্রিম্যান। 'মাথা খাটাও, জন,' বলল ও। 'ওকে নয়, বোকা! ভুলে গেছ, পাগলীটা পঞ্চান্ন মিলিয়ন ডলারের মালিক?'

'কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে যে!' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল বাড়ি, দেখল স্পিড বাড়িয়ে ওদের ক্যাডিলাকের দিকে ছুটছে নীল টয়োটা ভ্যান, 'পালাচ্ছে সাক্ষীটাকে নিয়ে!' অচেনা শত্রুটাকেও দেখা গেল এই সময়, ওদের ক্যাডিলাক আর নীল ভ্যানের

মাঝখানের রাস্তায় পৌঁছাবার জন্য ছুটছে।

'আবার ওদের খুঁজে নেব আমরা,' বলল ফ্রিম্যান, গলা থেকে স্কার্ফ খুলে আহত হাতটায় জড়াচ্ছে। 'ভেবে দেখো, ওদেরকে সব সময় আমরা খুঁজে পাই। ধন-সম্পদের মালিক হবার জন্যে এবার না হয় একটু বেশিই কষ্ট করলাম।'

হেডলাইটের আলোয় রানাকে দেখতে পেয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অলিভা। নিজের চোখেই দেখেছে ও, ওদেরকে পালাতে সাহায্য করেছে লোকটা। কেন, সে-প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়।

দুটো গাড়ির মাঝখানে নয়, ক্যাডিলাকের কাছে পৌঁছাল রানা, গুলি করে সামনের দুটো টায়ার বসিয়ে দিল। তারপর সরে এসে রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে অলিভাকে থামাতে চেষ্টা করল ও।

অলিভা ভাবল, কে না কে, চিনি না জানি না, সাহায্য করেছে বলেই কি ওকে গাড়িতে তোলা উচিত হবে?

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই দায়ান বলল, 'না, অলিভা, থেমো না!' পরমুহূর্তে সিটের উপর ঢলে পড়ল ও, সেখান থেকে গাড়ির মেঝেতে।

অলিভা থামবে না বুঝতে পেরে ঝট্ করে পিছিয়ে গেল রানা।

এখান থেকে ছয়-সাতশো গজ দূরে রেখে এসেছে জিপ, সময় বাঁচাবার জন্য সেদিকে ছুটল রানা।

বৃথা চেষ্টা, পাঁচ মিনিট পর জিপে স্টার্ট দিয়ে অনেক খুঁজেও টয়োটা ভ্যানটাকে কোথাও দেখতে পেল না ও।

পনেরো

টয়োটা ভ্যানের স্টিয়ারিং হুইল জোরে চেপে ধরেছে অলিভা। হেডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে।

ওর হৃদয় যেন জমাট বেঁধে গেছে, ভয়ে অবশ হয়ে গেছে মাথা। গাড়ির মেঝেতে নিথর পড়ে আছে দায়ান, ড্যাশবোর্ডের আলোয় রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা, চোখ দুটো বন্ধ।

অলিভার ইচ্ছে হচ্ছে গাড়ি থামিয়ে দায়ানকে ভাল করে দেখে একবার, কিন্তু পিছনে লোক লেগেছে ধরে নিয়ে সাহস পাচ্ছে না।

সরু, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় স্পিড বাড়ানো যাচ্ছে না। তারপরেও পুরানো ভ্যানটাকে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পিডে ছোটাচ্ছে অলিভা। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্টেট হাইওয়েতে উঠে এল ভ্যান, স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে তুলে ফেলল অলিভা।

বনভূমির মাঝখান দিয়ে গেছে হাইওয়ে। কিছুদূর এগোবার পর স্পিড কমাল, গাড়ি পার্ক করবার মত একটা জায়গা খুঁজছে।

জঙ্গল লাগোয়া ফাঁকা জায়গা দেখা গেল সামনে, পরিত্যক্ত একটা লগিং ক্যাম্প পর্যন্ত বিস্তৃত। ওটার গায়ে লেখা নম্বরটা এখনও মুছে যায়নি: ২২। হাইওয়ে থেকে কাঁচা রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে ওদিকে যাচ্ছে অলিভা।

উঁচু-নিচু মেটো পথে ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, কয়েকটা ভাঙা-চোরা কুঁড়েঘর দেখা গেল সামনে, এক সময় কাঠুরেরা থাকত ওখানে।

হাইওয়ে থেকে এখন আর ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থামিয়ে দায়ানের উপর ঝুঁকে পড়ল অলিভা। 'আমার উত্তেজিত হওয়া চলবে না,' নিজেকে বোঝাল ও। 'নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।' দায়ানের মারা যাওয়ার আশঙ্কা মনে জাগতেই

অদম্য কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল শরীরে, দাঁতের পাটি পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'দায়ান, ডার্লিং,' বলল ও, আঙুল দিয়ে ওর গাল ছুঁলো। 'কী হয়েছে, বলো আমাকে। সিরিয়াস কিছু?'

একচুল নড়ল না দায়ান। ফুঁপিয়ে উঠে ওর মাথাটা তুলল অলিভা, ভারী আর নিষ্প্রাণ লাগল।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড অটল মূর্তির মত বসে থাকল অলিভা, গলায় উঠে আসা চিৎকারটাকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তারপর দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, পাইন কাঁটার উপর দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। মনে হলো, আশপাশে কেউ নেই কোথাও।

হঠাৎ টলে ওঠায় গাড়ির দরজা ধরে ফেলল অলিভা, তা না হলে পড়ে যেত। উদ্বেগে অসুস্থ, সেই সঙ্গে দিশেহারা বোধ করছে ও, যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

নিজেকে শক্ত করল অলিভা। টলমল করতে করতে গাড়িটাকে ঘুরে এগোল, তারপর থেমে অফ-সাইডের দরজাটা খুলল। দায়ানের শরীর গড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল।

শরীরটা ভারী হলেও, অনেক কষ্টে গাড়ির ভিতর থেকে ওকে বের করল অলিভা, শোয়াল মাটিতে। স্পট-ল্যাম্প অ্যাডজাস্ট করে ওটার আলোয় দায়ানের কোটে রক্ত দেখে আঁৎকে উঠল ও। ব্যস্ত হাতে খুলল কোটটা। রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। দায়ানের বুকে হাত রাখল।

হার্টবিট আছে, তবে খুবই ক্ষীণ। স্বস্তিতে বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো অলিভার। 'ও মারা যায়নি! আমার দায়ান বেঁচে আছে!' বিড়বিড় করল ও। বুঝতে পারছে, চিকিৎসা না হলে ওর প্রিয়তমকে বাঁচানো যাবে না। প্রথম কাজ...প্রথম কাজ কী?

'রক্ত বন্ধ করা, পাগলী কোথাকার!'

গাড়ির কাছে ফিরে এল অলিভা। পিছনের মেঝেতে দুটো সুটকেস রয়েছে। তাড়াতাড়ি খুলল একটা; ভিতরে শার্ট, রুমাল ইত্যাদি রয়েছে। ব্যান্ডেজের জন্য একটা শার্ট ছিঁড়ল ও।

'অলিভা!' ক্ষীণ গলায় ডাকল দায়ান।

শুনে ফোঁপানোর মত অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল অলিভার গলা থেকে। ছুটে দায়ানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। স্পট-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছে দায়ান, তবে নড়েনি ও। ওর চোখ দুটোকে ম্লান আর নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে।

'ওহ্, ডিয়ার!' বলে দায়ানের পাশের জমিনে হাঁটু গাড়ল অলিভা। 'কী করব বলে দাও আমাকে। খুব কি ব্যথা লাগছে? তোমার রক্ত বন্ধ করা যায় কি না দেখছি আমি...'

'লক্ষ্মী, সোনা,' বিড়বিড় করল দায়ান, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে ওর মুখ। 'জখম খুব গুরুতর, অলিভা। বুকে কোথাও।'

মুহূর্তের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অলিভা, মুখ ঢাকল দু'হাতে। 'কী করব আমি এখন?' ভাবছে ও। 'কী করলে ওকে আমি বাঁচাতে পারব? ও মারা গেলে আমিও বাঁচব না! এখানে কেউ নেই যে সাহায্য করবে, আমাকেই কিছু একটা করতে হবে...'

'প্লিজ, অলিভা, সাহস হারিয়ো না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল দায়ান। 'তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু নার্ভ শক্ত রাখো। আগে দেখো ব্লিডিংটা বন্ধ করতে পার কি না।'

'হ্যাঁ...' চোখের পানি মুছল অলিভা, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'ঠিক আছে।'

দ্রুত পায়ে গাড়ি থেকে ব্যান্ডেজটা নিয়ে এল ও। খুব সাবধানে দায়ানের গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল। ওর বুকের ঠিক মাঝখানে লাল একটা ছোট ফুটো তৈরি হয়েছে, দেখে আবার অলিভার শরীরে অদম্য কাঁপুনি শুরু হলো।

'ভয় পেয়ো না, অলিভা,' বিড়বিড় করল দায়ান, অনেক কষ্টে

মাথাটা উঁচু করে নিজের ক্ষতটা দেখল। ‘ওহ্, গড!’ অনুভব করল ওর পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর ব্যথা...বুকে যেন ছুরি গেঁথে মোচড় দিচ্ছে কেউ। ‘শোনো, লক্ষ্মীটি, এই অবস্থায় একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার। এসো, অলিভা, ব্লিডিংটা বন্ধ করো।’

‘পারব না, আমি পারব না,’ চেঁচিয়ে উঠল অলিভা। ‘ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। কোথায়, দায়ান? কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?’

এতটুকু নড়ছে না দায়ান, তবে চিন্তা করছে। অনুভব করল ওর যেন গোটা বুকই খুলে ফেলা হয়েছে, আর লোনা বাতাস এসে লাগছে উন্মুক্ত স্নায়ু আর মাংসে। ‘ডাক্তার মিলটন,’ কোনও রকমে বলতে পারল ও।

‘কী? আবার বলো, ডার্লিং,’ দায়ানের দিকে ঝুঁকে বলল অলিভা।

‘ডাক্তার মিলটন...সোজা ব্ল্যাক পিলারসের ভেতর দিয়ে যেতে হবে...ঘুরতে হবে বাম দিকের দ্বিতীয় বাঁকটা... রাস্তা থেকে খানিক দূরে দোতলা বাড়ি... আশপাশে আর কোনও বাড়ি বা রান্‌শ্ নেই...’

‘দায়ান!’ ওকে নিস্তেজ হয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল অলিভা। ‘থেমো না, কথা বলো, প্লিজ...’

জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বড় করে শ্বাস নিল দায়ান। ‘এখান থেকে বিশ মাইল হবে...ওই একজনই, আশপাশে আর কেউ নেই...’

‘কিন্তু বিশ মাইল...’ অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল অলিভা। ‘অনেক সময় লেগে যাবে...’

‘উপায় নেই,’ বলল দায়ান, গলার আওয়াজ জড়িয়ে আসছে। ‘আর কেউ নেই...’

‘যাব আমি,’ সমস্ত দ্বিধা আর ভয় ঝেড়ে ফেলে বলল

অলিভা। তারপর ভাবল, উঁহুঁ, না, ওকে এখানে একা ফেলে রেখে যাব না, সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তা হলে তো দেখছি গাড়ি থেকে ওকে নামানোটাই ভুল হয়ে গেছে।

দায়ানের উপর ঝুঁকল অলিভা। 'আমরা দুজনেই যাব, ডার্লিং,' বলল ও। 'তুমি যদি সামান্য সাহায্য করো আমাকে, গাড়িতে আবার আমি তুলতে পারি তোমাকে।'

'না,' বলল দায়ান, অনুভব করল ওর মুখের ভিতর রক্ত উঠে এসেছে। 'আমার ভেতরে একটু ব্লিডিং হচ্ছে।' ঠেকানো গেল না, ঠোঁটের কিনারা দিয়ে গড়াতে শুরু করল লাল রক্ত, চিবুক হয়ে গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে—মুখটা ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল ও, অলিভাকে দেখতে দিতে চায় না।

ফোঁপাতে শুরু করল অলিভা, দেখে ফেলেছে। 'ঠিক আছে, দায়ান, আমি যাব আর আসব।' রুমাল দিয়ে প্যাড বানাচ্ছে। 'আর যদি, দায়ান...মানে, এই কথাটা আমি জানাতে চাই—তোমাকে আমি ভালবাসি। জেনো এটাই আমার প্রথম আর শেষ প্রেম। এর আগে কখনও কাউকে ভালবাসিনি...গত জন্মে যদি বেসেও থাকি, তা নির্ঘাত তোমাকেই...'

জোর করে হাসতে চেষ্টা করেও পারল না দায়ান, তবে অলিভার হাতটা চাপড়ে দিল।

বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়ল দায়ান।

অলিভা যেন বিপদের গুরুত্বটা নতুন করে উপলব্ধি করল। চঞ্চল প্রজাপতির মত ব্যস্ততার সঙ্গে কয়েকটা কাজ সারল ও—গাড়ি থেকে কম্বল, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরি বালিশ, গুটানো শার্ট, পা'জামা, ইত্যাদি এনে একটা বিছানা বানাল, যতটা পারা যায় আরামের ব্যবস্থা করল দায়ানের।

তারপর ওর রক্তাক্ত ঠোঁটে একটা চুমো খেয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল আবার, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল টয়োটা ভ্যান।

এই রাস্তা দিয়ে খানিক আগে গেছে একবার, কিন্তু দেখেও চিনতে পারছে না অলিভা। আসলে ডাক্তার মিলটন আর দায়ান ওর মনের সবটুকু দখল করে রেখেছে, আর কিছু ঢুকছে না সেখানে।

দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট, এত রাতে রাস্তা একদম ফাঁকা পড়ে আছে। হাইওয়েতে আশিতে ওঠার পর ওর স্পিড আর নামলই না। ব্ল্যাক পিলারস রোডে পৌঁছাতে মাত্র বিশ মিনিট লাগল ওর। বাঁক ঘুরে ঠিকমতই পৌঁছাল ডাক্তার মিলটনের বাড়িতে।

ভ্যান থামিয়ে গেটের দিকে এগোল অলিভা। খোলাই পেল ওটা, ভিতরে ঢুকে বাগানের সরু পথ ধরল, থামল এসে সদর দরজার সামনে।

দরজায় ঘুসি মারল অলিভা। মারছে তো মারছেই, থামার নাম নেই। এক সময় মাঝবয়েসী এক মহিলা, মাথায় এলোমেলো চুল, গায়ে ড্রেসিং-গাউন জড়ানো, দরজা খুলে কঠিন চোখে তাকাল। 'এটা কী ধরনের ভদ্রতা?' কর্কশ, পুরষালি কণ্ঠে জানতে চাইল। 'রাত দুপুরে এভাবে কেউ আওয়াজ করে?'

'প্লিজ!' বলল অলিভা, উদ্বেগ আর আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। 'ডাক্তার মিলটনকে দরকার আমার। মারাত্মক জখম নিয়ে পড়ে আছে একজন...কোথায় তিনি, প্লিজ?'

নোংরা, কাঁচা-পাকা চুলে হাড়সর্বস্ব আঙুল চালাল মহিলা। 'এখানে এসে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ,' বলল সে, দরজা বন্ধ করে দিতে চাইছে। 'ডাক্তার নিজেই অসুস্থ। পরের দরজা, ভাঙলে ভাঙল, না? যত্তোসব!'

'কিন্তু ডাক্তার ছাড়া যে চলবে না!' দরজায় পা বাধিয়ে বন্ধ করতে বাধা দিল অলিভা। 'ও মারা যাচ্ছে। দয়া করে ডাক্তারের সঙ্গে আমাকে আপনি শুধু একবার কথা বলতে দিন, প্লিজ। সঙ্গে গাড়ি আছে...বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'বললাম তো, আমার কিছু করার নেই,' বলল মহিলা, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ। 'ডাক্তার বুড়ো মানুষ, তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। এত রাতে কোথাও তিনি যাবেন না। তুমি অন্য কোথাও দেখো।'

'কিন্তু রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে ও! আপনি বুঝতে পারছেন না! সব কথা শুনলে ডাক্তার মিলটন অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবেন। ওর ব্লিডিং আমি বন্ধ করতে পারিনি...আর আমি ওকে ভালবাসি।'

'যাও তুমি!' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল মহিলা। 'এখানে যতই ঘ্যানর ঘ্যানর কর, কোনও কাজ হবে না।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল অলিভা। 'কিন্তু কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কার কাছে যাব? আর তো বেশি সময় নেই...ওর রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

'নর্থ রাউন্ডভেল রোডে একটা হসপিটাল আছে, গুড আর্থ। ওখানে ডাক্তার বেঞ্জামিন বারাক নামে একজন সার্জেন আছেন। তিনি কাউকে ফেরত দেন না। ভদ্রলোক ইহুদি। ওঁরা কল পেলেই ছোটেন।'

'আচ্ছা,' বলল অলিভা। 'ঠিক আছে, তাঁর কাছেই যাব। কিন্তু গুড আর্থ হসপিটালটা কোথায় যেন বললেন? ওখানে যাব কীভাবে?'

ওর বাম কবজির ওপর দেড় ইঞ্চি লম্বা দাগটা হঠাৎ দেখতে পেয়েছে মহিলা। চমকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। 'পাঁচ মাইল দূরে ওটা,' বলল সে। 'এসো, তোমাকে আমি ম্যাপ খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'ওহ্, ধন্যবাদ। তবে তাড়াতাড়ি, প্লিজ,' বলল অলিভা। 'ওকে আমার ওখানে ফেলে আসাটাই উচিত হয়নি...'

'এসো, এসো,' বলল মহিলা। 'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকে আমি দেখাব কীভাবে। ভেতরে ঢোকো, আমি আলো

জ্বালি।’

ঘুরে এগোল মহিলা, একটু পরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল প্যাসেজে—সিলিং থেকে ঝুলছে ন্যাড়া একটা বালব। দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে ঢুকল অলিভা।

ওর দিকে ফিরল মহিলা। ‘ওমা, কী সুন্দর লাল চুল তোমার!’ বলল ও, সরু চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করছে। ‘বলে-কয়ে দেখি ডাক্তার তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হন কি না। এসো, ভেতরে এসো। তাঁর শরীর ভাল নয়... তারপরেও যদি... ঠিক আছে, বলে তো দেখি। এখানে যদি একটু বসো তুমি...’

হঠাৎ এতটা পরিবর্তন, বন্ধুত্বের মিথ্যে ভান, অলিভার মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কিছু করবার নেই। যেভাবে হোক দায়ানকে বাঁচাতে হবে ওর। কাজেই মহিলার পিছু নিয়ে ছোট একটা ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়ল।

রুমে গোল একটা টেবিল, তিনটে চেয়ার রয়েছে। টেবিলের উপর পুরানো কয়েকটা ম্যাগাজিন। চারদিকে অযত্নের ছাপ।

‘যাই, ডাক্তার সাহেবকে বলি, বাছা,’ বলল মহিলা। ‘এখানে বসো তুমি। ওঁকে নিয়ে এখনই আমি আসছি।’

‘প্লিজ, দেরি করবেন না,’ অনুরোধ করল অলিভা। ‘আমি ওর রক্ত বন্ধ করতে পারিনি!’

‘এই যাব আর আসব,’ বলে ত্রস্ত পায়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল মহিলা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার অলিভার দিকে, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল অলিভা।

মহিলার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দুদ্দাড় করে উঠে যাচ্ছে। ফাঁদে পড়েছি, এরকম একটা অনভূতি হলো ওর।

শব্দ না করে দরজাটা খুলল অলিভা। ‘হিলসাইডের সেই পাগলীটা—ওই যে, পালিয়েছে!’ শুনতে পেল কাকে যেন বলছে

মহিলা। 'যার খোঁজ দিতে পারলে হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে! নীচে, তোমার ওয়েটিং রুমে বসে আছে সে।'

'কী? জোরে বলো।' রাগের সঙ্গে বললেন এক ভদ্রলোক। 'তুমি সব সময় ফিসফিস করে কথা বলো কেন? হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের কে?'

'পাগলী মেয়েটা...অলিভা কারমেন...যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সবাই...নীচে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলো তুমি...আমি শেরিফকে ডাকছি,' বলল মহিলা। 'জলদি!'

'কিন্তু ওই মেয়ে তো বিপজ্জনক,' ভদ্রলোক বললেন, গলার স্বরে কাঁদুনে একটা ভাব। 'কথা বলতে হয় তুমি বলো। আমি অসুস্থ মানুষ...'

'নামো নীচে!' রেগে উঠে ধমক দিল মহিলা। 'ওকে ধরে দিতে পারলে দশ হাজার ডলার পুরস্কার পাওয়া যাবে। টাকাটা তুমি চাও না?'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, চাই। আমাকে তা হলে নামতে হয় নীচে।'

চোখ বুজল অলিভা। ভাবল, সন্দেহ নেই স্বপ্ন দেখছি আমি। রহস্যময় অনেক স্বপ্নই তো দেখি, এটাও নিশ্চয় সেরকম একটা। তবে এটা আগেরগুলোর মত ঝাপসা নয়। আসলে হয়তো দায়ান আহত হয়নি, হয়তো কালো ড্রেস পরা লোক দুজনও ওর কোনও উদ্ভট স্বপ্নের অংশ মাত্র। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাবে কেবিনে, নিজের বেডরুমে শুয়ে রয়েছে ও—সন্ত্রস্ত, তবে নিরাপদ।

পাগলী...ওই যে, পালিয়েছে...অলিভা কারমেন...যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সবাই...

শিউরে উঠল অলিভা; প্রবলভাবে চাইছে ঘুম থেকে জেগে উঠতে; প্রার্থনা করছে, নিজেকে যেন দায়ানের কেবিনে দেখতে

পায়। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে ছোট্ট ওয়েটিং রুমটাই দেখতে পেল, শুনতে পেল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে সতর্ক পায়ে নেমে আসছে কেউ।

উপর থেকে ভেসে আসছে মহিলার ভোঁতা কণ্ঠস্বর, সম্ভবত টেলিফোনে শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে।

ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন হোক বা যা-ই হোক, এ-বাড়ি থেকে ওকে এক্ষুনি পালাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল অলিভা। এ-বাড়ির লোকজন ওর ক্ষতি করতে চাইছে। ওকে আটকে রাখতে চেষ্টা করবে, ফলে জঙ্গলের ভিতর বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে দায়ান।

কিন্তু এত ভয় পেয়েছে, নিজেও বলতে পারবে না কখন সরে এসে কামরার এককোণে লুকিয়ে পড়েছে অলিভা। এখন আর চেষ্টা করেও একচুল নড়তে পারছে না ও। ধড়ফড় করছে বুক, হাতের তালু ভিজে যাচ্ছে ঘামে।

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকলেন বুড়ো ডাক্তার, যেন ছোটখাট একটা পাহাড়। মাথায় টাক, প্রকাণ্ড বড়শির মত বাঁকা নাক, গোঁফ জোড়া দু'পাশে ঝুলে পড়েছে। তবে অলিভাকে আতঙ্কিত করে তুলল ওঁর ডান চোখ—নোংরা হলুদ মার্বেল পাথর ওটা, কত বছর পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে।

রঙচটা একটা ড্রেসিং গাউন পরে আছেন বৃদ্ধ, এখানে সেখানে ছেঁড়া, ফাঁক দিয়ে নোংরা আন্ডারওয়্যার দেখা যাচ্ছে।

'বেরিয়ে যান! এখান থেকে বেরিয়ে যান!' চেঁচিয়ে উঠল অলিভা। 'আমাকে জাগতে দিন! আমার ঘুম ভাঙতে দিন! খবরদার, কাছে আসবেন না!'

দরজাটা বন্ধ করে কবাটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। পানি বেরুচ্ছে বুঝতে পেরে গাউনের পকেট থেকে রুমাল বের করে বাম চোখটা মুছলেন। ডান চোখের হলুদ পাথরটা যেন একদৃষ্টে দেখছে ওকে।

'শুনলাম একটা সমস্যায় পড়েছ,' প্রায় মেয়েলি সুরে বললেন

বৃদ্ধ। 'ঠিক কী ধরনের সাহায্য দরকার তোমার?'

কোণটায় আরও জড়োসড়ো হয়ে সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করছে অলিভা। 'আপনিই কি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমিই ডাক্তার মিলটন।' রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন।

লোকটাকে আমার ভয়ঙ্কর লাগছে, ভাবল অলিভা। এই লোককে ও দায়ানের কাছে নিয়ে যাবে না। একে বিশ্বাস করা যায় না। 'আমার একটা ভুল হয়েছে,' দ্রুত বলল ও। 'আপনাকে আমার দরকার নেই। এখানে আমার আসাই উচিত হয়নি...'

সিটকে গেলেন ডাক্তার মিলটন। তিনি যে ভয় পাচ্ছেন, পরিষ্কার বুঝতে পারল অলিভা। তাঁর ভয় ওর ভয়কে আরও বাড়িয়ে দিল।

'শোনো, অস্থির হোয়ো না,' বললেন ডাক্তার। 'বুড়ো হতে পারি, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমার সুনাম আছে। আমার চোখটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে? এটা কিন্তু আমার কাজে কোনও ব্যাঘাত ...আরে, দাঁড়িয়ে কেন, তুমি বসো!'

মাথা নাড়ল অলিভা। 'না! আমি চলে যাচ্ছি! বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।' ধীরে ধীরে দেয়াল ছাড়ল, তারপর দরজার দিকে ইতস্তত ভঙ্গিতে এগোল।

'তোমার আসলে কোথাও যাওয়া চলে না,' বললেন ডাক্তার মিলটন। 'আমরা চাই তুমি এখানে থাকো।' প্রকাণ্ড শরীরটাকে পাঁচিলের মত দাঁড় করালেন দরজার সামনে। 'কফি খাও, বাছা,' সুর নরম করলেন তিনি। 'আমার স্ত্রী...কফি ভাল লাগবে তোমার।'

দম আটকে রেখেছে অলিভা, তারপর হঠাৎ চিৎকার শুরু করল, ফুসফুস খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না।

'না, প্লিজ,' বললেন ডাক্তার। 'কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আমরা ভাল মানুষ...শুধু চাই কেউ যেন তোমার কোনও

ক্ষতি করতে না পারে।'

দরজার কাছ থেকে আঁচড়ানোর নরম একটা আওয়াজ ভেসে এল। কবাট খুলে ভিতরে ঢুকছে মহিলা। হঠাৎ করে ঢিল পড়ল বৃদ্ধ ডাক্তারের পেশিতে, মুখটা সাদা চক হয়ে আছে। এক পাশে সরে এসে স্ত্রীকে ঢোকার পথ করে দিলেন।

'কী ব্যাপার?' অলিভাকে জিজ্ঞেস করল মহিলা। 'তুমি বসছ না কেন? আমার স্বামী কি...' ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'ওর সঙ্গে তুমি যাচ্ছ না? কে যেন অসুস্থ...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। 'ও মত পাল্টেছে।' চিবুকের নীচে গলাটা হাত দিয়ে ঘষছেন, কখনও চেপে ধরছেন। 'আমি খুব আপসেট ফিল করছি, লিজা। আমার নীচে নামা উচিত হয়নি। একটু ব্র্যান্ডি হলে, বোধহয়...'

'চুপ করো!' তীক্ষ্নসুরে বলল মহিলা। 'সারাক্ষণ খালি নিজের কথা ভেবো না।'

'আমাকে যেতে হবে,' বলল অলিভা। ইতিমধ্যে টেবিলের পাশে পৌঁছে গেছে ও, চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব। 'আপনাদেরকে ডিসটার্ব করা উচিত হয়নি আমার।'

'কিন্তু ডাক্তার সাহেব কাপড় পরতে দোতলায় যাচ্ছেন,' বলল মহিলা। 'এক মিনিটও লাগবে না। তোমার বন্ধু অসুস্থ, তাই না? ওকে তুমি ভালবাস, ঠিক না?'

অলিভার মনটা আবেগে উথলে উঠল। 'ও, হ্যাঁ। কী জানি কী ভাবছিলাম।' কপালটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। 'হ্যাঁ...ওর ব্লিডিং হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব ওখানে বসে আছেন কেন? উনি কিছুই করছেন না কেন?'

'যাও,' ডাক্তারকে বলল মহিলা। 'কাপড় পরো। মেয়েটাকে আমি এক কাপ কফি বানিয়ে দিই।'

তারপরেও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকলেন ডাক্তার। শ্বাস

নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'ওকে যেতে দাও,' হঠাৎ বললেন তিনি। 'আমি টাকা চাই না। বুড়ো হয়েছি, আমার দরকার নির্জনতা আর শান্তি। খারাপ কিছু একটা ঘটে যাবার আগে মানে মানে ছেড়ে দাও ওকে। ভেবে দেখো, ট্রাক ড্রাইভারের কী অবস্থা করেছে ও। তার আগে স্যানাটোরিয়ামে একজনকে মেরেছে...'

'ওপরে যাও, বুড়ো মিনসে,' খেপে উঠে বলল মহিলা। 'কী বলছ নিজেও জানো না!'

'ওঁকে ডিসটার্ব করবেন না,' বলল অলিভা। 'আমি চলে যাচ্ছি...' আবার ধীরে ধীরে সামনে এগোল ও, চোখে-মুখে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ডাক্তার। মহিলা ইতস্তত করছে, তারপর পিছিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল, চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। 'এখানে তোমার থাকাই দরকার,' বলল সে। 'আমরা জানি তুমি কে।'

দরজাটা খুলে ফেলল অলিভা। তারপর ঘুরে ওদের দিকে তাকাল। 'কী বলতে চাইছেন জানি না,' বলল ও। 'ভেবেছিলাম আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন।' কামরা থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেজ ধরে দ্রুত পায়ে এগোল।

কিন্তু সদর দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। বন করে ঘুরল অলিভা। ওয়েটিং রুমের বাইরে বেরিয়ে এসে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মহিলা। 'দরজাটা খুলে দিন,' বলল ও, রাগে একটু একটু কাঁপছে।

'তুমি শান্ত হও, বাছা,' নরম সুরে বলল মহিলা। 'ভেতরে এসে বসছ না কেন? তোমার জন্যে কফি চড়াই আমি...'

ছুটল অলিভা। মহিলাকে পাশ কাটাল। আরেক দরজার হাতল ধরে টান দিল, ভেবেছে এই পথে বাগানের পিছনে যাওয়া যায়। কিন্তু কবাট খুলল না, এটাতেও তালা দেওয়া।

স্ত্রীর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার, তিনিও দেখছেন

অলিভাকে।

সরু প্যাসেজে, দুই দরজার মাঝখানে আটকা পড়ে স্থির হয়ে গেছে অলিভা; ওর ব্রেন কাজ করছে না।

'দেখলে?' নরম সুরে বলল মহিলা। 'তুমি যেতে পারবে না। ভাল কথা, তোমার বন্ধুরা সব আসছেন। দেখো, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় আরেকটা দরজা দেখতে পেল অলিভা। ছোট একটা দরজা, পরদা দিয়ে অর্ধেকটা আড়াল করা, ওর কাছ থেকে এক কি দেড় গজ দূরে।

ওদের দুজনের উপর থেকে চোখ রেখে, একটু একটু করে ওই ছোট দরজার দিকে সরে যাচ্ছে অলিভা। তারপর ঝট করে হাতলটা ধরে ঘোরাল।

খুলে গেল কবাট। সেই মুহূর্তে মহিলাও ওকে ধরবার জন্য ছুটল। প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অলিভা, পিছন থেকে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলা।

পিঠে ধাক্কা খেয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে গিয়ে একটা সিঁড়িতে পড়ল অলিভা। ধাপের উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচে নামছে। মেঝেতে নামার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ষোলো

পুলিশ স্টেশন। ডেপুটি শেরিফ লেস্টার টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

চোখ মেলে সিধে হওয়ার সময় ভাগ্যকে অভিশাপ দিল লেস্টার, তারপর এক হাতে চোখ রগড়ে অপর হাতটা রিসিভারের

দিকে বাড়াল।

মেইন অফিস থেকে বেশ খানিকটা ভিতরে, ছোট একটা নির্জন কামরায় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন শেরিফ কুপার। এক মিনিট পর দড়াম করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল লেস্টার, শেরিফের কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে, 'স্যর! উঠুন, স্যর!'

'এই, কী হলো, এই,' ভারি গলায় প্রতিবাদ জানালেন শেরিফ। 'তোমরা মানুষকে একটু ঘুমাতেও দেবে না?'

'ওরা তাকে ধরেছে, মিস্টার কুপার!' উত্তেজনায় চড়ে গেল লেস্টারের গলা, চর্বিসর্বস্ব গোল মুখটা শেরিফের চোখের সামনে ঝুলে আছে।

'ধরেছে? কাকে ধরেছে?' জানতে চাইলেন শেরিফ, চোখে এখনও ঘুম লেগে থাকায় চিন্তাশক্তি ফিরে পেতে দেরি হচ্ছে। তারপর হঠাৎ অপলক হয়ে উঠল দৃষ্টি, খপ করে ডেপুটির একটা কবজি চেপে ধরলেন। 'তুমি বলতে চাইছ...অলিভাকে? কে...কে ধরল?'

'ডাক্তার মিলটন... এইমাত্র মিসেস মিলটন ফোন করে খবর দিলেন...'

'কী কাণ্ড! কী সর্বনাশ!' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলেন শেরিফ, দ্রুত হাতে ট্রাউজার পরছেন। 'কবরে এক পা দিয়ে রেখেছেন, হুট করে দশ হাজার ডলার পেয়ে গেলেন! এত টাকা দিয়ে কী করবেন তিনি?' বেসুরো গলায় হাসলেন। 'কিন্তু আমাদের চোখ টাটালে কী হবে, ওঁর কপালে আছে যে! অথচ অলিভাকে খুঁজতে একটা মিনিটও ব্যয় করেননি ভদ্রলোক।'

'মিসেস মিলটন তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন,' বলল লেস্টার, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে ওর। 'তিনি ভয় পাচ্ছেন কিছু না ঘটে যায়।'

'দেখতে পাচ্ছ না, তাড়াহুড়ো করছি?' ধমকে উঠলেন শেরিফ, কোমরে ভারী হোলস্টার ঝোলানো বেল্ট বাঁধছেন। 'লস

অ্যাঞ্জেলেস থেকে মডেস্টোয় এসে হোটেল মিরাকল-এ উঠেছেন সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার, ওঁকে একটা ফোন করে ডাক্তারের ওখানে পৌঁছাতে বলো...কিংবা কী ব্যবস্থা করতে হয় করো।'

'উনি মডেস্টোয়? কবে এলেন?' বিস্মিত হলো ডেপুটি শেরিফ লেস্টার। 'আপনার সঙ্গে কখন কথা হলো?'

'কখন কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সব তোমাকে জানাতে হবে নাকি, লেস্টার?' হঠাৎ থমথমে গলায় প্রশ্ন করলেন শেরিফ ডেভিড কুপার।

'না, মিস্টার কুপার, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি,' বলল লেস্টার। 'প্রশ্নটা এই জন্যে করলাম যে গিলবার্ট সম্পর্কে কেসবুকে লেখা হয়েছে—সলিসিটর ব্লেচার আর ডন মারকাস নাকি অলিভাকে খুন করার জন্য গিলবার্ট আর ব্রুনো হপারকে ভাড়া করেছে...'

'কেসবুকে ও-সব ভুলভাল লেখা হয়েছে,' বিরক্ত হয়ে বললেন শেরিফ। 'আমি নিজে ইন্টারোগেট করেছি গিলবার্টকে। অভিযোগ শুনে আকাশ থেকে পড়েছে সে। সলিসিটর ব্লেচারের সঙ্গেও ফোনে আলাপ হয়েছে। তিনি তো হেসেই খুন, বললেন এ-সব গাঁজাখুরি গল্প আপনারা পান কোত্থেকে!'

'কিন্তু গিলবার্টের সঙ্গে যে রাইফেলটা পাওয়া গেছে?' জানতে চাইল ডেপুটি শেরিফ। 'মিস্টার ফেদেরা যেটা টহল পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন? ওটার কী ব্যাখ্যা?'

'গিলবার্ট বলছে ওটা ওর নয়। ও বলছে পথ ভুলে দায়ান রান্‌শের ওদিকে চলে গিয়েছিল, পাইনবনের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় রাইফেলটা দেখতে পায়।'

কী যেন মনে পড়ে যেতে ডেপুটি শেরিফ জন লেস্টারের চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কিন্তু, স্যর,' শেরিফকে বলল ও, 'গিলবার্ট যে ধোয়া তুলসী পাতা নয় তার প্রমাণ তো আমাদের হাতেই রয়েছে। লেফটেন্যান্ট মিচেল ওকে যখন বলল, স্নাইপার

ব্রুনোকে ফোনে ডাকো, ও তখন না ডেকে চিৎকার করে বলল—ব্রুনো পালাও। এ থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে যায়...'

'না, এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে,' ধমকের সুরে বললেন শেরিফ কুপার। 'গিলবার্ট আমাকে বলেছে ওর ছেলের নাম ব্রুনো। ও ভেবেছিল, ছেলের সামনে ওকে টরচার করা হবে বলে ডাকা হচ্ছে, তাই ...'

প্রতিবাদ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল লেস্টার, বাধা পেয়ে থেমে গেল।

'ভাল কথা,' বললেন শেরিফ, 'একজন ফটো-জার্নালিস্টকে খবর দাও—মিস্টার ফেদেরাকে। হিলসাইডকেও জানাও।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লেস্টার। বাইরে থেকে ওর চিৎকার ভেসে এল, 'আপনার সঙ্গে আমিও যাব?'

'আপনি পরে আসুন। আগে সলিসিটর আর জার্নালিস্টকে ফোন করো, তারপর।' টেবিল থেকে হ্যাটটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন শেরিফ।

ডেপুটি শেরিফ লেস্টারের কাছ থেকে খবরটা পেয়েই লস অ্যাঞ্জেলেসে, মাফিয়া ডন মারিয়ো মারকাসকে টেলিফোন করল সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার।

'কী, উকিল সাহেব,' ব্লেচারের গলা পেয়েই শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলল মারকাস, 'জুয়ায় হেরে মেলা টাকা তো দেনা করে ফেলেছেন, শোধ করবেন কীভাবে? পঞ্চান্ন মিলিয়নের লোভ দেখালেন, কিন্তু কই, সেই পাগলীকেও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না...'

'ওকে পাওয়া গেছে,' মারকাসকে বাধা দিয়ে বলল ব্লেচার। 'সম্ভব হলে ব্রুনো হপারকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন—এখনই!'

ব্ল্যাক পিলারস রেলওয়ে ইয়ার্ডের কাছে সারারাত খোলা থাকে

কাফেটা, জায়গাটার নাম ট্র্যাকিং পয়েন্ট। ওটার সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দশটনী একটা খালি ট্রাক। 'এটাই আমার শেষ গন্তব্য,' বলল ড্রাইভার। 'আপনাদের কিছু সুবিধে হলো?'

ক্যাব থেকে নীচে নামল টোবি ব্রাদাররা। 'শিওর,' বলল ফ্রিম্যান। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।' ওর ডান হাতের কবজির উপরটা রুমাল দিয়ে জড়ানো।

ট্রাক ছেড়ে দিয়ে কাঠের গেট দিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডের ভিতর ঢুকল ড্রাইভার।

'ভাগ্যগুণে লিফটটা পেয়েছিলাম,' বলল ফ্রিম্যান।

চোখ-মুখ কালো করে রেখেছে বাডি, কথা বলছে না।

'গ্যারেজে টেলিফোন করা হলেও, চাকা বদলে ক্যাডিলাকটা ডেলিভারি দিতে আধবেলা লাগিয়ে দেবে ওরা, তাই না?'

'চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল বাডি, রাস্তা পার হয়ে কাফের দিকে হাঁটছে। বেজার মুখে ওর পিছু নিল ফ্রিম্যান।

অচল ক্যাডিলাককে ফেলে আসতে হওয়ায় বাডির মাথা গরম হয়ে আছে। তবে ফ্রিম্যান ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে রাজি নয়। সম্পত্তি আর আরামের প্রতি ওর তেমন দুর্বলতা নেই, শুধু একটা জিনিসই খুব পছন্দ করে—মেয়েমানুষ।

কাউন্টারে বসে কফির অর্ডার দিল ওরা। পরিবেশন করল এক তরুণী। ওর ফিগার নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে হলো ফ্রিম্যানের, তবে জানে বাডির এখন মুড খারাপ।

কাফেতে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েটা কিচেনে ফিরে যেতে চিন্তিত সুরে বাডি বলল, 'জানতে পারলে ভাল হত লোকটা মারা গেছে কি না। আমার গুলিটা যে ওর বুকে লেগেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু লম্বা-চওড়া শরীর ওর, তার ওপর একাই একটা রান্‌শ্‌ চালায়। আমার উচিত ছিল ওর মাথাটাকে টার্গেট করা।'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' বলল ফ্রিম্যান। 'আমি

মেয়েটার কথা ভাবছি। শালী মাল একখানা! ওই লাল চুল..'

ওর দিকে ঘুরে বসল বাড়ি। 'খুনটা দেখেছে ওই লোক,' বলল ও নিচু গলায়। 'এটাই প্রথম সাক্ষী, যে আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারল।' একটু থেমে আবার বলল, 'ইচ্ছে করলেই আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে ও।'

ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে চিন্তা করেনি ফ্রিম্যান। 'ওকে তা হলে খুঁজে বের করতে হয়। কিন্তু কোথায়...?'

'আমাকে ঘুমাতে হবে,' বলল বাড়ি। 'ধ্যাৎ! এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না...আমরা তো আর লোহার তৈরি না। কোথায় শোয়া যায় বলো তো?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো...ও বলতে পারবে,' বলল ফ্রিম্যান, হাত তুলে কিচেনের দিকটা দেখাল।

'হ্যাঁ,' বলল বাড়ি, কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টুল ছেড়ে কিচেনের দিকে এগোল।

টেবিলে বসে নিগ্রো কুকের সঙ্গে গল্প করছে মেয়েটা। দুজনেই ওরা বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল, একটা ঢোক গিলল নিগ্রো।

'শোয়ার জায়গা দরকার,' বলল বাড়ি, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কোথায় পাব?'

'মোড়ের ওদিকে একটা হোটেল আছে, একপাশে পুলিশ স্টেশন, আরেক পাশে জেলখানা,' বলল তরুণী।

'ঠিক আছে,' বলল বাড়ি, টেবিলের উপর এক ডলারের একটা নোট রাখল।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রিম্যানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল বাড়ি। 'চলো, আমার ঘুম পেয়েছে।'

ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটছে ওরা। রেলস্টেশনের মাথায় বড়সড় ঘড়িটায় তিনটে বাজে। 'থানা আর জেলখানার মাঝখানে একটা হোটেল আছে,' বলল বাড়ি।

'যিশুর মেহেরবানিতে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যে,' বলে খিকখিক করে হাসল ফ্রিম্যান। 'ধরে না ভেতরে পুরে দেয়।'

'ওই যে, ওটা,' বাঁক নিয়ে বলল বাডি, তারপর অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে ফ্রিম্যানের অক্ষত কবজিটা ধরে ফেলেছে। 'কী হচ্ছে ওখানে?'

পুলিশ স্টেশনের ধাপ বেয়ে শেরিফ কুপারকে তরতর করে নেমে আসতে দেখে ফ্রিম্যানকে নিয়ে একটু পিছিয়ে এল বাডি। পুলিশ স্টেশনের পাশেই একটা গ্যারেজ, কাঠের বিরাট গেটটা নিজেই খুলছে শেরিফ। অত্যন্ত ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

এক মুহূর্ত পর একটা তোবড়ানো মার্সিডিজ সগর্জনে বেরিয়ে এল, ফাঁকা রাস্তা ধরে ছুটছে।

'শেরিফ এত ব্যস্ত কেন?' বিড়বিড় করল ফ্রিম্যান, হ্যাটটা নাকের উপর নামিয়ে আনল।

'কিছু একটা হচ্ছে,' বলল বাডি। 'চলো, দেখি ব্যাপারটা কী।'

'তুমি না ঘুমাতে চাইছিলে?'

'আগে দেখি।'

রাস্তা ধরে হাঁটা ধরল ওরা; দু'জোড়া হাত একই ছন্দে দুলছে, ওদের পদক্ষেপে হঠাৎ একটা নতুন শক্তি আর চঞ্চলতা যোগ হয়েছে।

মোবাইল ফোনটা বারকয়েক বেজে ওঠার পর ঘুম ভাঙল রানার। সুইচ অন করে সেটটা কানে তুলছে, এই সময় ওর বেডরুমের দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে, ভিতরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি। হাত তুলে আলো জ্বালল সে।

'হ্যালো?'মোবাইল ফোনে কথা বলছে রানা, টিসা ফিনলের দিকে একবার তাকিয়েই সরিয়ে নিল চোখটা। সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে ওর বন্ধুর স্ত্রী, পরনে শুধু একটা স্লিপিং গাউন। 'হ্যাঁ,

জার্নালিস্ট রডরিক ফেদেরাই বলছি ...হোয়াট! কখন? ...কোথায়? ...এখনই আসছি!'

'কী হয়েছে, রানা?' জিজ্ঞেস করল টিসা।

'অলিভা!' লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, খেয়াল নেই পরনে শুধু অন্তর্বাস। চেয়ারের পিঠ থেকে ট্রাউজার টেনে নিয়ে পরছে। 'এক ডাক্তারের বাড়িতে পাওয়া গেছে ওকে!'

'শোনো, রানা, এই সময় আমার মত একটা মেয়েকে দরকার ওর,' বলল টিসা। 'আমি ওকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারব। চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।'

'না, প্রশ্নই ওঠে না,' বলল রানা, শার্টের উপর জ্যাকেট পরে ব্যাকপ্যাকটা পিঠে ঝোলাচ্ছে। 'তোমাকে আমি এক্ষুনি জড়াতে চাই না। তোমার কাজ আছে পরে। এখন প্রধান কাজ বাড়িটা আগলে রাখা—বিশেষ করে জেড যখন এখানে নেই।'

'তোমার এই একই কথা বারবার শুনতে আমার ভাল লাগছে না!' রেগে উঠল টিসা। 'কী ভাবো তুমি আমাকে? আমি একজন সোলযার! জানো, অলিভাকে সাহায্য করার জন্যে তোমার অনুমিত নেয়ার প্রয়োজন নেই আমার?'

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়েই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা। একটু পর নীচ থেকে ওর জিপ স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল।

ঝাড়া বিশ সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল টিসা, চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠছে। তারপর শান্ত পায়ে ফিরে এল নিজের বেডরুমে, নিজেদের রাবার প্ল্যানটেশনে ফোন করে সশস্ত্র দুজন গার্ডকে তৈরি হতে বলল, জানাল রাস্তা থেকে ওদেরকে গাড়িতে তুলে নেবে ও।

এরপর গান র‍্যাক খুলে পিস্তল আর হোলস্টার বের করল টিসা। ওয়ার্ড্রোব খুলে জিনস আর জ্যাকেট বের করে পরল।

সতেরো

ডাক্তার মিলটনের বাড়ি। সদর আর খিড়কি দরজার মাঝখানে, সরু প্যাসেজটায়, লোকজনের ভিড় জমে গেছে।

স্ত্রীকে নিয়ে সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাক্তার মিলটন। সলিসিটর ব্লেচার আসেনি, তবে তার একজন প্রতিনিধি এসেছে, অ্যাডাম ক্লিপটন—ওয়েটিং রুমের দরজায় দেখা যাচ্ছে তাকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাফিয়া ডন মারিয়ো মারকাসের এক প্রতিনিধি, বিল ট্যাফোর্ড—ক্লিপটনের মত সে-ও একজন ব্যারিস্টার। দুটো খবরের কাগজ থেকে এসেছে দু'তিনজন রিপোর্টার ও ফটো জার্নালিস্ট, প্যাসেজের দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

ফেদেরা ওরফে রানা, হাতে ফ্ল্যাশ-গান সহ ক্যামেরা, খিড়কি দরজার গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে।

খানিক আগে মাথার ভিতরে ঝড় বয়ে গেলেও, এখন সম্পূর্ণ শান্ত রানা। ঝড়টা উঠেছিল অলিভার নিরাপত্তার কথা ভেবে। ওর ধারণা, ডন মারকাস শুধু একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, এক-আধজন স্নাইপারকেও নিশ্চয় পাঠিয়েছে—ব্রুনো হপার বা আর কারও গা ঢাকা দিয়ে আশপাশেই কোথাও থাকার কথা।

এরকম পরিস্থিতিতে জার্নালিস্ট-এর ছদ্মবেশ খুলে ফেলে, ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য হওয়ার সুবাদে নিজেকে অলিভার অভিভাবক বলে দাবি করতে পারে রানা, টেলিফোন করে ডেকে নিতে পারে ওর এজেন্সির এক-দেড়শ' অপারেটারকে।

কিন্তু ও চাইলেই অলিভার দায়-দায়িত্ব ওকে নিতে দেবে না পুলিশ। আইনও তা সমর্থন করবে না। তা ছাড়া, পুলিশের

ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই ওর। ওরা যে মাফিয়ার টাকা খাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে নিরাপদ হেফাজতে রাখব বলে জেলখানায় নিয়ে গিয়ে অলিভাকে যদি মাফিয়ার হাতে খুন হওয়ার সুযোগ করে দেয় ওরা, কারও কিছু করবার থাকবে না।

তারপর আছে হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষ। ওদের কাউকে এখনও দেখা না গেলেও, জানা কথা নিজেদের পেশেন্টকে ওরা ফেরত চাইবে। কিন্তু ওদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও মোটেও ভাল নয়, কাজেই অলিভাকে অন্তত হিলসাইডে ফেরত পাঠানো যাবে না।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা—অলিভাকে তার অজান্তে যতটা সম্ভব সাহায্য করবে ও।

দুজন স্টেট পুলিশ বাড়ির সদর দরজা পাহারা দিচ্ছে। শেরিফ কুপার আর ডেপুটি শেরিফ লেস্টার সেলার-এর দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ঠিক আছে, বাছারা,' বললেন কুপার। 'সবাই অ্যালার্ট থাকো। ভুলে যেয়ো না, মেয়েটা ডেঞ্জারাস।' রানার দিকে তাকালেন একবার। 'আমি ওকে বের করে আনছি। ছবিটা যেন ভাল ওঠে, মিস্টার ফেদেরা।'

'আগে বের তো করুন,' বলল রানা। 'হয়তো দেখা যাবে সেলার খালি, ভেতরে কেউ নেই।'

কথাটা কানে না তুলে সেলারের দরজায় নক করলেন শেরিফ। 'আমরা জানি তুমি ভেতরে আছ,' বললেন তিনি। 'আমরা আইনের লোক, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি। এখন তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। লক্ষ্মী মেয়ে, বেরিয়ে এসো।'

সেলারের আরও অন্ধকার কোণে সরে গেল অলিভা।

সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে সেলারের নীচে পড়বার সময় অজ্ঞান হয়ে

গেলেও, একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছে অলিভার। ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে, কঠিন ফাঁদে আটকা পড়েছে ও। সেলারের দেয়াল হাতড়ে জেনে নিয়েছে দরজা ছাড়া এখান থেকে বেরুবার আর কোনও পথ নেই। আর সেই দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে বাইরে থেকে

আহত দায়ান একা জঙ্গলে পড়ে আছে, এই চিন্তাটা মাথায় না থাকলে এতক্ষণ নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিত অলিভা। এখন সে অনুভব করছে, প্রেমের একটা আলাদা শক্তি আছে; নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করল, যেভাবেই হোক দায়ানের কাছে ফিরে যাবে ও, দুনিয়ায় এমন কোনও শক্তি নেই যা বাধা দিয়ে রাখতে পারে ওকে।

অন্ধকারে কয়েক মিনিট হাতড়ানোর সময় একটা ইলেকট্রিক সুইচবোর্ড পেয়েছে অলিভা। ছোট একটা সুইচ অন করে আলো জ্বেলেছে। সেলারটা ছোট, স্যাঁতসেঁতে আর আবর্জনায় ভর্তি। তবে আলোর ফিউজ-বক্স আর মেইন সুইচ আছে এখানে।

আবর্জনার মধ্যে মরচে ধরা একটা লোহার রড দেখল অলিভা। ওটা তুলে মাথার উপর সিধে করে ধরল। শেরিফ কুপার যখন দরজাটা খুলছে, এক পা এক পা করে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল ও, একটা হাত রাখল মেইন সুইচের উপর, অপেক্ষা করছে।

সেলারের আলো আগেই নিভিয়ে দিয়েছে অলিভা। ফলে দরজা ফাঁক করে শেরিফকে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাতে দেখছে ও, কিন্তু তিনি ওকে দেখতে পাচ্ছেন না।

'বেরিয়ে এসো, বাছা,' বললেন শেরিফ, উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওঁর চেহারা; কোনও কারণ ছাড়াই যোগ করলেন: 'জায়গাটা আমরা ঘিরে ফেলেছি।'

অন্ধকার সেলারে কোনও শব্দ হলো না।

'সাহস করে নীচে নামুন আপনি, শেরিফ,' জার্নালিস্ট

ফেদেরাকে বলতে শুনলেন ডেভিড কুপার। 'বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওপরে তুলে আনুন ওকে।'

এখনও অলিভাকে উদ্ধার করবার কোনও বুদ্ধি করতে পারেনি রানা।

'সাহস থাকলে আপনি নামুন না!' কৃত্রিম ঝাঁঝের সঙ্গে ওকে বললেন শেরিফ। কৌতুক করলেও, পাগলাগারদ থেকে পালানো হোমিসাইডাল টেনডেন্সির একটা রোগিণীকে হাতকড়া পরানোর কাজটা ঘাড়ে এসে চাপায় মোটেও খুশি নন। ঘাড় ফিরিয়ে সলিসিটর ব্লেচারের প্রতিনিধি ক্লিপটনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি চান, মেয়েটাকে নিয়ে আসার জন্যে সেলারে নামি আমি?'

'অভকোর্স,' বলে মাথা ঝাঁকাল ব্যারিস্টার ক্লিপটন, মুখে গম্ভীর হাসি। 'তবে আমাদের ক্লায়েন্টের সঙ্গে আপনারা কেউ কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে আমরা মামলা করব।'

বেজন্মা কুত্তা! মনে মনে গালি দিল রানা। খুন করবার জন্য স্নাইপার লাগিয়েছে, অথচ কথা শুনে মনে হচ্ছে দশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ মানবাধিকার কর্মী।

'আপনি সিরিয়াস, শেরিফ?' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে, হাসিমুখে বলল রানা। 'আমি কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি।'

হাতছানি দিয়ে ডেপুটি শেরিফ লেস্টারকে ডাকলেন কুপার।

এক পা পিছিয়ে গেল লেস্টার। 'আমি না, মিস্টার কুপার, প্লিজ। পাগল দেখলেই ভয়ে আধমরা হয়ে যাই। তা ছাড়া, ওখানে অন্ধকার। ট্রাক ড্রাইভারের কী অবস্থা...'

'আসলে এই ব্যাপারটা দেখবে স্যানাটোরিয়ামের লোকজন,' বললেন শেরিফ। 'ওদেরকে কেউ খবর দিয়েছ তোমরা?'

কেউ সাড়া দিল না। হেসে উঠে রানা বলল, 'হয় একা নামুন, নয়তো আমাকে সঙ্গে নিন, এ ছাড়া আপনার কোনও উপায় নেই, মিস্টার কুপার।'

চিন্তা করছেন শেরিফ।

'আমি ভয় পাচ্ছি না,' আবার বলল রানা। 'তবে সামনে থাকবেন আপনি, আমি থাকব আপনার পেছনে।'

বড় করে একটা শ্বাস নিলেন শেরিফ। 'ঠিক আছে, তা-ই চলুন,' বললেন তিনি, ইতস্তত ভঙ্গিতে সেলারের দিকে এক পা এগিয়ে গাঢ় অন্ধকারে উঁকি দিলেন। 'কারও কাছে একটা টর্চ নেই?' ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইলেন।

না, নেই।

ব্যারিস্টার বিল ট্যাফোর্ড, মাফিয়া ডন মারকাসের প্রতিনিধি, শেরিফকে নিজ দায়িত্ব দ্রুত পালন করবার তাগিদ দিল।

নিচু দোরগোড়া পার হওয়ার সময় মাথা নিচু করেছেন শেরিফ, ঠিক তখনি মেইন সুইচ অফ করে দিল অলিভা, তারপর শেরিফের একটা হাত ধরে টান দিল সামনের দিকে।

কান-ফাটানো আর্তনাদ বেরিয়ে এল শেরিফের গলা চিরে, নীচের দিকে খসে পড়ছে ওঁর শরীর।

কী ঘটছে বুঝতে দেরি হয়নি রানার, সিদ্ধান্ত নিল যতটা সম্ভব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সবাইকে ঘাবড়ে দিতে হবে। হঠাৎ এমন আঁতকে উঠল যেন ভূত দেখেছে, তারপর ডাইভ দিল ডেপুটি শেরিফ লেস্টারকে লক্ষ্য করে।

ওর ধাক্কা খেয়ে দুই স্টেট পুলিশের গায়ে ছিটকে পড়ল লেস্টার, কী হচ্ছে বোঝার জন্য অন্ধকারে সামনে এগোবার চেষ্টা করছিল তারা।

'সাবধান, সাবধান!' আতঙ্কিত গলায় বলল রানা। 'পাগলীটা আমাদের সঙ্গে মিশে গেছে!' পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

সিধে হলো লেস্টার, পাগলীর ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—অন্ধকারে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে সে, কাকে লাগল না লাগল গ্রাহ্য করছে না। পথ পরিষ্কার করে দোতলায় ওঠার

সিঁড়ির দিকে যেতে চাইছে ও। পুলিশদের একজন ওর ঘুসি খেয়ে ঢলে পড়ল প্যাসেজের মেঝেতে, তারপর আর নড়ল না।

আরেকজন পুলিশ হাতের লাঠিটা ডান আর বাম দিকে দ্রুতবেগে অনবরত চালাচ্ছে, তবে কাউকে লাগাতে পারছে না। ওদিকে রানার আর্তনাদ এখনও থামছে না।

অলিভার জন্য আর কিছুর দরকার ছিল না। প্যাসেজে উঠে এসেছে ও, শুনতে পেল সদর দরজার ওদিকে চেঁচামেচি আর ধস্তাধস্তির আওয়াজ হচ্ছে। নিঃশব্দে খিড়কি দরজা খুলে বাগানে বেরিয়ে গেল ও।

আবছাভাবে দেখতে পেয়ে ওর পিছু নিল রানা।

বাগানের সরু পথ ধরে অন্ধের মত ছুটছে অলিভা। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ডান দিকে ঘুরে গেল ও। গতি এত বাড়িয়ে দিল, জমিনের উপর দিয়ে যেন একটা হরিণ উড়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে রানা পেরে উঠছে না।

তবে হাল ছাড়ছে না ও, ভাবছে ওদের পিছু নিতে কতক্ষণ সময় নেবেন শেরিফ কুপার।

নিচু পাঁচিল টপকে ঘন একটা জঙ্গলের দিকে ছুটছে অলিভা, এখনও কয়েকশ' ফুট দূরে। ওই জঙ্গলের পিছনে মেইন রোড, চলে গেছে ব্ল্যাক পিলারসের দিকে—তবে ওর তা জানার কথা নয়।

অলিভা ভাবছে জঙ্গলটায় একবার ঢুকতে পারলে গা ঢাকা দিতে কোনও সমস্যা হবে না। আত্মবিশ্বাস অসতর্ক করে তুলল ওকে, ছোটার গতি কমিয়ে আনল। অকস্মাৎ একটা শিকড়ে পা বেধে যাওয়ায় সটান আছাড় খেল মাটিতে, শরীরটা গড়িয়ে গেল খানিক দূর, ফুসফুস খালি হয়ে গেছে।

এক কি দুই মুহূর্ত স্থির হয়ে পড়ে থাকল অলিভা। তারপর যেই উঠে বসতে যাবে, দেখল ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে কে যেন।

রানাকে চিনতে না পারলেও, দায়ানের সঙ্গে ওর কাঠামো আর চেহারার মিল থাকায় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল—মনে পড়ল, দায়ান'স রান্‌শে এই লোকটাই ওদেরকে পালাতে সাহায্য করেছিল।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওরা।

'সব ঠিক আছে,' বলল রানা। 'একটুও ভয় পেয়ো না তুমি। আমি তোমাকে সাহায্য করছি। আমি ওখানে গোলমাল পাকিয়ে তোলাতেই পালাতে পেরেছ...'

ভয় না পেলেও, রানাকে সতর্ক চোখে দেখছে অলিভা। 'কে তুমি? আমার কাছে কী চাও?'

'আমি রডরিক ফেদেরা—ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট। তুমি অলিভা কারমেন, তাই না?'

'আমি জানি না,' বলল অলিভা, মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরল। 'ভুলে গেছি আমি কে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ...স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।' উঠে বসল ও, খপ করে রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল। 'সত্যি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমার দায়ান...মারাত্মক আহত হয়েছে...তুমি আমার সঙ্গে যাবে, প্লিজ?'

বোবা হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কী সর্বনাশ, অলিভা স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে! একে তো পাগল, তার উপর...

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'তুমি সত্যি তোমার অতীত ভুলে গেছ? কিছুই মনে করতে পারছ না?'

'না... তবে, প্লিজ—যদি সাহায্য করতে চাও, সময় নষ্ট কোরো না। ওর আঘাত খুব সিরিয়াস। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? সত্যি আমাকে সাহায্য করবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা, হাত ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে।

'পাহাড়ের ওপরে, হাইওয়ের পাশে, একটা লগিং ক্যাম্প আছে—বাইশ নম্বর। ওখানে রেখে এসেছি ওকে।'

'চিনি জায়গাটা,' বলল রানা, ডানে-বাঁয়ে ভাল করে তাকাল। 'একটু পরেই আলো ফুটবে। কেউ যেন তোমাকে দেখে না ফেলে। আমি গাড়িটা নিয়ে আসি, তুমি এখানে অপেক্ষা করো।'

'এখানে কোথায়? এখানে তো ওরা আমাকে দেখে ফেলবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরিয়েছে...'

'ওই জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে থাকো,' হাত তুলে দেখাল রানা। 'কিছুদূর এগোলেই মেইন রোড দেখতে পাবে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখবে, জঙ্গল থেকে বেরুবে না—একটা জিপে থাকব আমি।'

'সত্যি তুমি আসবে তো, নাকি...'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,' বলল রানা। 'দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসছি।'

'পারলে আরও তাড়াতাড়ি এসো, প্লিজ। ওকে একা ফেলে রেখে এসেছি... রক্ত বন্ধ করতে পারিনি...'

'চিন্তা কোরো না, ওকে আমরা সুস্থ করে তুলব। এখন যাও, জঙ্গলে লুকাও।' ঘুরে দ্রুত পায়ে হাঁটছে রানা, ডাক্তার মিলটনের বাড়িতে ফিরছে।

জঙ্গলের দিকে হাঁটার সময় একা অস্বস্তি বোধ করছে অলিভা। ভোরের আবছা আলো, জমিন থেকে ওঠা ঘোলাটে কুয়াশা, অটল গাছপালা ওর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। মনে হচ্ছে জঙ্গলে ওর জন্য মারাত্মক কোনও বিপদ ওত পেতে আছে। ধড়ফড় করছে বুকের ভিতরটা।

অলিভা ভাবল, ফেদেরার সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হতো। এরকম নিস্তব্ধ বনভূমির চেয়ে অশুভ আর কিছু হতে পারে না। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মেইন রোডটা দেখতে পেয়ে নিজেকে সাহস যোগানোর চেষ্টা করল ও। ওই তো, ওখানেই তো ফেদেরার সঙ্গে আমার দেখা হবে, বিড়বিড় করে বলল নিজেকে। ভয়টাকে দূর করবার জন্য ফাঁকা একটা জায়গা লক্ষ্য করে হাঁটছে

ও।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অলিভা। ওর সামনে কী যেন একটা নড়ে উঠল। দ্রুত দম আটকাল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বড় একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে সামনে, ওটার পিছন থেকে একটা হ্যাটের কারনিস বেরিয়ে এল। পাথর হয়ে গেছে ও, একটা পেশিও নাড়ার শক্তি নেই, এমনকী চোখের পাতাও ফেলতে পারছে না।

কালো ওভারকোট পরা এক লোক, মাথায় কালো হ্যাট, গুঁড়িটাকে ঘুরে সামনে চলে এল, দাঁড়াল সরাসরি অলিভার পথের উপর। টোবি ব্রাদারদের একজন ও—বাডি। 'তোমাকে আমার দরকার,' বলল ও। 'ঝামেলা কোরো না।'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অলিভা, তারপর তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বন্ করে আধপাক ঘুরে অন্ধের মত ছুটল উল্টোদিকে।

কিন্তু পিছনে ছিল ফ্রিম্যান, অলিভাকে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে হাসল।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলিভা। দুই কাকই ওর হাঁপানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

'ঝামেলা পাকিয়ো না,' আবার বলল বাডি, ধীর পায়ে হেঁটে আসছে ওর দিকে।

'না! না!' আঁৎকে উঠে পালাবার পথ খুঁজছে অলিভা। 'আমাকে ছোঁবেন না... প্লিজ, চলে যান... আমি একজনের অপেক্ষায় আছি... ওর সাহায্য ছাড়া আমার চলবে না... এখনই চলে আসবে ও... প্লিজ, আপনারা চলে যান...'

'কোনও ঝুট-ঝামেলা চাই না,' বলল বাডি, ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল। 'এসো। তোমাকে আমাদের দরকার।'

পিছু হটল অলিভা, তারপর হঠাৎ ঘুরে ফ্রিম্যানের দিকে ছুটল। ঠোঁটে স্থির হাসি নিয়ে ওকে দেখছে ফ্রিম্যান, হাত দুটো দু'দিকে লম্বা করে দিয়ে পথ আটকাল ওর।

আবার আধপাক ঘুরল অলিভা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'দায়ান কোথায়?' জানতে চাইল বাডি।

'আমি জানি না,' বলল অলিভা। 'আমি কিছুই জানি না।'

'জানবে,' নরম সুরে বলল বাডি। 'কাকে কীভাবে কথা বলাতে হয় আমরা জানি। কোথায় ও?'

'জানি না...' বলল অলিভা, বন্যপ্রাণীর মত চারদিকে চোখ বুলাল, তারপর চিৎকার শুরু করল।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ফ্রিম্যান, মোটা আঙুল দিয়ে অলিভার চুল খামচে ধরে মাথাটাকে পিছন দিকে নোয়াল। 'মারো শালীকে!' বাডিকে বলল ও।

এগিয়ে এল বাডি। ওর ঘুসিটা নাক বরাবর ছুটে আসতে দেখে আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলল অলিভা, আবার চিৎকার জুড়ে দিল। হাত দুটোকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল বাডি, তারপর হাড়সর্বস্ব চারটে আঙুলের গিঁট দিয়ে ওর চোয়ালটা যেন গুঁড়িয়ে দিল সে।

আঠারো

হঠাৎ গায়েব হয়ে কোথায় গিয়েছিল, ডেপুটি শেরিফের এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য একটা জবাব দিতে বেশ অনেকটা সময় ব্যয় হলো রানার। ওদের সঙ্গে ওখানে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হলো ওকে, তা না হলে সবার মনে ওর আচরণ সম্পর্কে সন্দেহ জাগত।

ওদেরকে রানা জানাল: অলিভার পিছু নিয়েই বাগানে বেরিয়েছিল ও। ভয়-ডর নেই, সোজা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে পাগলী মেয়েটা, তারপর মেইন রোডে পৌঁছে একটা ট্রাক থামিয়ে কিং'স

ক্যানিয়ানের দিকে চলে গেছে। অনেকটা পিছনে ছিল ও, দূর থেকে দেখেছে, বাধা দেওয়ার সুযোগ পায়নি।

রানা দেখল শেরিফকে ইতিমধ্যে সেলার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আসলে নিজেই তিনি উঠে এসেছেন। তেমন কোনও আঘাত পাননি, এক-আধটু চামড়া ছড়ে গেছে মাত্র।

এক সময় ডাক্তার মিলটনের কাছ থেকে বিদায় নিতে শুরু করল সবাই। সুযোগ পেয়ে রানাও নিজের জিপে এসে চড়ল।

ঘুরপথে জিপ চালিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ও। ডাক্তার মিলটনের বাড়ির পিছনদিক এটা, ছোটখাট জঙ্গলটার শেষ প্রান্ত। মনটা আশঙ্কায় দুলছে, ওর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে দেখে অলিভা চলে যায়নি তো? কোনও বিপদ হওয়াও বিচিত্র নয়।

জিপের গতি কমাল রানা। গাছপালার ফাঁকে চোখ বুলাচ্ছে। কিন্তু অলিভাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

এক সময় জিপ ছেড়ে রাস্তায় নামতে হলো রানাকে। তারপর জঙ্গলের ভিতরেও ঢুকতে হলো। বেশ কয়েকবার ওর নাম ধরে ডেকেও কোনও লাভ হলো না। অলিভা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

আধঘণ্টা পর ক্লান্ত, হতাশ আর উদ্বিগ্ন হয়ে জিপে ফিরে এল রানা। ধরে নিচ্ছে ওর ফিরতে দেরি দেখে দায়ানের কাছে চলে গেছে অলিভা। আবার এমনও হতে পারে, টোবি ব্রাদাররা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে ওকে।

হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। 'হ্যালো?'

'টিসা,' জবাব এল। 'পুলিশ স্টেশনের উঠান থেকে বলছি। শুনলাম অলিভাকে তোমরা ধরে রাখতে পারনি।'

'আমিই দায়ী,' ভাবল রানা। বলল, 'ওখানে কী করছ তুমি?'

'চেষ্টা করে দেখছি মেয়েটিকে কোনও সাহায্য করতে পারি কি না,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল টিসা। 'তুমি কোথায়, রানা?'

'আমি দায়ানকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'বাইশ

নম্বর লগিং ক্যাম্পের কাছে কোথাও একা পড়ে আছে ও, যদি না এতক্ষণে মারা গিয়ে থাকে।' টিসাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

ড্যাশবোর্ড থেকে এলাকার একটা ম্যাপ বের করে চোখ বুলাল রানা। পরিত্যক্ত লগিং ক্যাম্পটা এখান থেকে বিশ মাইল দূরে।

নতুন চাকা লাগানো হয়েছে, একটা সাইড রোড ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলেছে প্রকাণ্ড কালো ক্যাডিলাক। স্টেট হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছে সরু রাস্তাটা, গভীর বেত ও বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে।

সকালের রোদ এরইমধ্যে বেশ তেতে উঠেছে। গা থেকে ওভারকোট খুলে পাশাপাশি বসে আছে টোবিরা। গাড়ি চালাচ্ছে বাডি, স্পিড তুলল সত্তরে।

ওদের পিছনের মেঝেতে, একটা তেরপলের উপর শুয়ে রয়েছে অলিভা, প্রায় অচেতন। ওর হাত আর পা নাইলন কর্ড দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মুখটা অ্যাডহিসিভ টেপ দিয়ে বন্ধ করা।

ব্ল্যাক পিলারস থেকে ইতিমধ্যে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ছোটখাট জনবসতি এড়িয়ে মডেস্টো আর মার্সেড শহরের মাঝামাঝি, প্ল্যানটেশন এরিয়ায় পৌঁছাবার চেষ্টা করছে। জায়গাটার নাম গেটওয়ে।

বাডি প্রায় কোনও কথাই বলছে না। ও শুধু দায়ান বার্নেটকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। দায়ান যদি কোর্টে কথা বলবার অনুমতি পায়, ওদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। নিজের লক্ষ্যভেদ সম্পর্কে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ও, জানে দায়ানের জখম খুবই মারাত্মক, এতক্ষণে যদি মারা গিয়ে না থাকে, তার আর দেরিও নেই। তবে সত্যি মারা গেছে কি না নিশ্চিত হতে হবে ওদেরকে।

যাই হোক, ভাবল ও, আপাতত বেশ কটা দিন সাক্ষী হিসাবে

ওকে আদালতে হাজির করা সম্ভব নয়।

প্রথম কাজ মেয়েটাকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা, তারপর তার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে ফিরে গিয়ে দায়ানের ব্যবস্থা করা।

গভীর বনভূমিতে ঢাকা বিরাট একটা উপত্যকায় পৌঁছাল ওরা, চারদিকে মাথা তুলে আছে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। ভাঙাচোরা একটা প্ল্যানটেশন হাউসের সামনে থামল ওদের ক্যাডিলাক। চারদিকে বিশ মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র বাড়ি। দরজা খুলে নীচে নামল টোবিরা।

কাঠের তৈরি দোতলা, বারান্দাটা চওড়া। বাড়ির ডান দিকে আগাছায় ভর্তি ছোট একটা ফাঁকা মাঠ, এককালে ওখানে চাষবাস করা হত। চারপাশে কিছু ফলের গাছ রয়েছে। এখানে যে মানুষ বাস করে তার প্রমাণ: এক ঝাঁক হাঁস-মুরগি চরে বেড়াচ্ছে।

গাড়ির আওয়াজ শুনে যে লোকটা বারান্দায় বেরিয়ে এল তার বয়স ষাট-বাষট্টির কম না। লম্বা কাঠামো, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু, একরত্তি বাড়তি মেদ নেই শরীরে। সরু মুখ, চিবুকে অল্প একটু কাঁচা-পাকা দাড়ি। গায়ে একজোড়া নোংরা ওভারঅল, খালি পা। লোকটা, ডম পেড্রো, ওদের পুরানো বন্ধু।

সার্কাস পার্টির রিং মাস্টার ছিল ডম পেড্রো। টোবি ব্রাদারদের মতই স্বাধীনচেতা, নিজের তৈরি আইনে জীবনযাপন করতে পছন্দ করে। টোবিরা সার্কাস ছেড়ে চলে আসবার ছ'মাস পর সে-ও কেটে পড়েছিল ওখান থেকে। বর্তমানে বিখ্যাত সব কোম্পানির নানা ধরনের প্রোডাক্ট নকল করে বাজারে বিক্রি করে।

কিছুদিন লুকিয়ে থাকার জন্য গেটওয়ের এই প্ল্যানটেশন আদর্শ মনে হওয়ায় পেড্রোকে ওরা আগেই কথাটা বলে রেখেছিল—কখন কী পরিস্থিতি হয় বলা যায় না, বিপদে পড়লে তোমার এখানে দিন কয়েকের জন্য মেহমান হতে পারি আমরা।

অলিভাকে নিয়ে কী করা হবে তা ওরা পরে ঠিক করবে।

আপাতত কিছুদিন এখানে লুকিয়ে রাখবে ওকে। ওদের ইচ্ছে হলো অসৎ আর লোভী কোনও উকিলকে ধরে এনে কিছু ডকুমেন্ট তৈরি করাবে, অলিভাকে দিয়ে সই করাবে সে-সব কাগজে, যাতে করে পাগলী মেয়েটার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার পথ খুলে যায়, সেই সঙ্গে ওর বাকি সব সয়-সম্পত্তিও ওদের দখলে চলে আসে। ডম পেড্রো কঠিন পাত্র, ওর কাছ থেকে অলিভা পালাতে পারবে না।

'হ্যালো, বয়েজ,' বলল পেড্রো, বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে ওদেরকে দেখছে, চোখে সন্দেহে ভরা সতর্ক দৃষ্টি। 'হঠাৎ কী মনে করে?'

জবাব না দিয়ে ক্যাডিলাকের পিছনের দরজা খুলল বাডি, অলিভাকে ধরে সাবধানে বের করে আনল সকালের ঝলমলে রোদে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল পেড্রো। 'কী এটা? কিডন্যাপিং?' জিজ্ঞেস করল, থাম ছেড়ে পিছিয়ে গেল এক পা, কোমরে আঁটো করে বাঁধা কর্ডের ভিতর বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বড়শির মত বাঁকা করল।

'না,' বলল বাডি, অলিভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বারান্দার দিকে হেঁটে আসছে। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় জানতে চাইল, 'মিস হিলি কোথায়?'

'বাগানেই কোথাও আছে,' বলল পেড্রো, ঘরে ঢোকার পথটা আগলে রেখেছে। 'আমি কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়াব না, বাডি—দুঃখিত। ওটার সাজা মৃত্যুদণ্ড।'

'এটা কিডন্যাপিং নয়,' সংক্ষেপে বলল বাডি। 'আগে একে নামাই, তারপর কথা বলি।'

'ভেতরে নয়,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল পেড্রো, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। 'ওই চেয়ারটায় বসাও ওকে। গন্ধটা কিডন্যাপিঙের মত লাগছে আমার নাকে।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে ভাঙাচোরা বেতের চেয়ারটায় অলিভাকে

নামাল বাডি। অলিভা সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করতে মচ্‌মচ্‌ করে উঠল ওটা। ওর মুখে হাত রেখে এত জোরে ধাক্কা দিল বাডি, ওকে নিয়ে বারান্দার মেঝেতে উল্টে পড়ল চেয়ারটা।

'ওর ওপর নজর রাখো,' ধাপ বেয়ে ফ্রিম্যানকে উঠে আসতে দেখে বলল বাডি, তারপর পেড্রোর বাহুটা ধরে বারান্দার আরেক মাথার দিকে এগোল।

অলিভাকে টেনে তুলল ফ্রিম্যান, তারপর চেয়ারটা খাড়া করে ওকে আবার বসাল তাতে। 'চুপচাপ থাকো, সুন্দরী,' সাবধান করে দিল। 'এখানে কেউ যদি তোমার বন্ধু থাকে তো সে একমাত্র আমি। বাডি মেয়েমানুষ পছন্দ করে না, কিন্তু আমি করি। আমি দেখব তোমার যাতে কোনও ক্ষতি বা কষ্ট না হয়।' মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ছোট একটা চিরনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। 'আমার পছন্দের মেয়ে হতে কেমন লাগবে তোমার? বাডিকে সব কথা জানাবার দরকার নেই।'

'কে ওই মেয়ে?' ওদিকে বাডিকে প্রশ্ন করছে পেড্রো। 'যিশুর কিরে, বাডি, তুমি যদি আমাকে কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করো...'

'চেঁচিয়ো না,' বলল বাডি, চোখে রাগ। 'তোমার এখানে দিন কয়েকের জন্যে মেহমান হতে পারি, এটা তোমাকে আমরা আগেই জানিয়ে রেখেছি। সেজন্যে ফি বছর বেশ কিছু টাকাও দেয়া হয় তোমাকে। কাজেই জায়গাটা এখন আমরা ব্যবহার করব। না, ওকে আমরা কিডন্যাপ করে আনিনি।'

'তা হলে?'

'একটা মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়েছে। বিপদ থেকে রক্ষা করছি ওকে আমরা। এটাকে তুমি কিডন্যাপিং বলো?'

চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল পেড্রো, মাথা চুলকাচ্ছে। 'তুমি বলতে চাইছ মেয়েটা অলিভা কারমেন?'

হাসল বাডি। ঠাণ্ডা, চতুর, সেই সঙ্গে হিংস্রও বটে ওর নিঃশব্দ

হাসিটা। 'ও, আচ্ছা, তুমি তা হলে শুনেছ।'

'শোনেনি আবার কে! আমি কাগজ পড়ি। তা ওকে নিয়ে কী করছ তোমরা?'

'লোকজন ওকে খুন করতে চাইছে, ওর টাকা আর সম্পত্তি মেরে খাওয়ার জন্যে,' বলল বাডি। 'আর আমরা ওকে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করছি, এক সময় ও যাতে নিজের সবকিছু বুঝে নিতে পারে।'

'এই যুগে এমন ফেরেশতাও আছে!' বারান্দার আরেক মাথার দিকে তাকাল পেড্রো। 'ওভাবে বেঁধে রেখে?'

'পাগল যে, নিজের কীসে ভাল তা-ও তো বোঝে না,' বলল বাডি। 'তার ওপর অতীতের কথা ওর কিছু মনেও নেই। পাগলদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহারই করা হয়। ওদেরকে শুধু খেতে দাও, তাতেই ওরা কৃতজ্ঞ বোধ করবে।'

'পাগলদের সম্পর্কে তুমি বেশি কিছু জানো বলে মনে হচ্ছে না,' বলল পেড্রো, থুথু ফেলার জন্য রেইলিং ধরে বাইরের দিকে ঝুঁকল। 'যাই হোক, সেটা তোমাদের ব্যাপার। এর মধ্যে আমার কী স্বার্থ?'

'আমরা যা আয় করব, তার চারভাগের একভাগ পাবে তুমি।'

'সেটা মেলা টাকা হতে পারে, আবার ঘোড়ার ডিমও হতে পারে,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল পেড্রো। 'দেখো, সব না এলোমেলো হয়ে যায়।'

'ধ্যাৎ, চুপ করো তো,' বলল বাডি, হাতের দস্তানা খুলে পকেটে ভরল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে আগাছার উপর দিয়ে দূরে তাকাল। মেজাজটা হালকা হয়ে এসেছে ওর।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে পেড্রো, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'সবাই বলছে, মেয়েটা বিপজ্জনক,' বলল ও। 'হোমিসাইডাল।'

হেসে উঠল বাডি। 'ভেড়া সেজো না, পেড্রো। তুমি না

সিংহের খাঁচায় ঢুকে খেলা দেখাতে, ভুলে গেছ? তুমি আর হিলি খুব সহজেই সামলাতে পারবে ওকে।'

পেড্রোর মুখের চামড়া টান টান হলো। 'হিলির কথা বাদ দাও, ওর কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। আজকাল উদ্ভট সব কাজ করছে, শেষ পর্যন্ত সে-ও না পাগল হয়ে যায়।'

'কারও সাহায্য তোমার দরকারও নেই,' বলল বাডি। 'তেমন কামরা আছে, যেখানে তালা দিয়ে রাখা যায় মেয়েটাকে? নিরাপদ কোথাও?'

'আছে ওপরতলায় একটা। জানালায় গরাদ লাগানো। ওটা নিতে পার তোমরা।'

'ঠিক আছে, এখনই ওখানে রেখে আসা যাক ওকে,' বলল বাডি। 'আমাদের তাড়া আছে।'

অবাক হলো পেড্রো। 'তোমরা এখানে থাকছ না?'

'আমাদের কাজ আছে, একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে,' বলল বাডি। চোখা, হলুদ দাঁত দেখা গেল মুহূর্তের জন্য। 'দিন দুই পর ফিরব।' পেড্রোকে নিয়ে বারান্দার আরেক দিকে যাচ্ছে ও, ফ্রিম্যানকে বলল, 'ওর মুখ থেকে টেপটা খুলে নাও। হাত-পাও খুলে দাও।'

অলিভার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে রয়েছে ফ্রিম্যান, চেয়ারের হাতলে রেখেছে মাথাটা, ঢুলু ঢুলু চোখে দুনিয়ার স্বপ্ন আর মায়া। তবে বাডি কাছে চলে আসছে বুঝতে পেরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও, কাজ দেখাবার জন্য টেপের একটা প্রান্ত ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে অলিভার মাথাটা ঝট করে ডান দিকে ঘুরে গেল।

ব্যথায় ককিয়ে উঠল অলিভা, সিধে হয়ে টোবি ব্রাদারদের মুখোমুখি বসল।

'ঠিক আছে, এবার কথা হোক,' বলল বাডি। 'দায়ান কোথায়? তাকে তুমি কোথায় রেখে এসেছ?'

'জানি না...মনে নেই...আমাকে নিয়ে আপনারা যা খুশি করতে পারেন,' বলল অলিভা।

হাসল বাডি। 'তার মানে জানো তুমি, মনেও আছে, কিন্তু বলতে চাইছ না।' কিছু বুঝতে না দিয়ে, হঠাৎ, ঠাস করে অলিভার গালে একটা চড় কষল ও। পটকা ফাটার মত আওয়াজ হলো। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা।

চেয়ারটা আবার উল্টে যেত, কিন্তু ফ্রিম্যান ধরে থাকায় পড়ল না। 'আরও মারো,' খিকখিক করে হেসে উঠে বাডিকে উৎসাহ দিল ও। 'আমি ধরে আছি।'

অলিভার আরেক গালে চড় মারল বাডি, এটা আগের চেয়েও জোরে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অলিভা।

ওর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে ফ্রিম্যান, ফিসফিস করে বলল, 'বাডির বিশ্বাস অর্জনের জন্যে তোমার ওপর একটু অত্যাচার করছি, সহ্য করো, লক্ষ্মীটি!'

এই সময় বারান্দার ধাপে নরম শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল ওরা। বারান্দায় উঠে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে এক মহিলা—আসলে মেয়েদের কাপড় পরা একটা ফিগার। পরনের স্কার্টটা কতদিন ধোয়া হয়নি কে জানে। ব্লাউজটা এখানে-সেখানে ছেঁড়া। ওর গালে নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। 'মহিলা'-র বয়স পঁয়তাল্লিশ হলেও, দাড়ির একটা চুলও পাকেনি।

নিঃসঙ্গ জীবন ক'বছর আগে পর্যন্ত সার্কাসেই কেটেছে ওর। টোবিরা চলে যাওয়ার পর কোম্পানির আয় কমে যায়, দাড়ি দেখিয়ে দর্শকদের হাসির খোরাক হওয়ার চাকরিটাও তাই আর থাকেনি ওর। আপনজন বলতে এমন কেউ নেই যার কাছে আশ্রয় নেবে, তাই বাধ্য হয়ে পেড্রোর সঙ্গে ভিড়ে গেছে, ওর রান্নাবান্না করে দেওয়ার বিনিময়ে থাকছে এখানে।

হিলিকে দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠল অলিভা, তারপর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সেটা থামতে খিকখিক করে হাসল ফ্রিম্যান। 'তোমার বিশেষ আকর্ষণ ওর মন জয় করতে পারছে না, হিলি,' বলল ও, দেখল অলিভার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে পিছিয়ে যাচ্ছে সে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে মেমোরি থেকে একটা বিশেষ নম্বর বের করছে বাডি।

দু'পা পিছিয়ে থামল হিলি, চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে অলিভার দিকে। তারপর পাশে দাঁড়ানো পেড্রোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কে ও? ওরা ওকে এখানে নিয়ে এসে মারধর করছে কেন? ব্যাপারটা কী?'

পেড্রো জানে টোবি ব্রাদারদের দু'চোখে দেখতে পারে না হিলি। 'চুপ! ওদের ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'তা ঘামাবার কোনও ইচ্ছেও নেই আমার,' হিসহিস করে বলল হিলি। 'তবে এটাও মনে রেখো, এখানে কোনও মেয়ের ওপর অত্যাচার হলে সেটা আমি সহ্য করব না।'

'এই চুপ!'

নম্বরটা পেয়ে ডায়াল করছে বাডি, আড়চোখে অলিভার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কে, বার্টন?...এই তো...শোনো, হে, আমার হয়ে আশপাশের সবগুলো প্রাইভেট ক্লিনিকে খবর নাও, বুকে বুলেট নিয়ে কেউ চিকিৎসা নিচ্ছে কি না...না, আরও একটা কাজ করতে হবে তোমাকে...আহত একজন লোককে জঙ্গলের ভেতর কোথাও লুকিয়ে রাখা হতে পারে...বিশেষ করে খোঁজ নিতে হবে তিন, আট আর বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে...'

'বাইশ নম্বর' শুনেই অলিভাকে শিউরে উঠতে দেখল বাডি। অপলক হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি, তারপর উল্লাসে চকচক করে উঠল চোখ দুটো।

'...কারণ হাইওয়ের ধারে ওই লগিং ক্যাম্পগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে... ঠিক আছে, হ্যাঁ, বাইশ নম্বরটা এখান থেকে কাছে, ওখানে আমরাই যাচ্ছি।'

অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে হিংস্র বাঘিনীর মত বাডিকে লক্ষ্য করে লাফ দিল অলিভা। ওর চোখ দুটোকে টার্গেট করে খামচি দিয়েছিল, কিন্তু বাডির ভাগ্য ভাল নাগালের মধ্যে পেল না—ও লাফ দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঝট করে একপাশে সরে গেছে সে।

বাডি আর ফ্রিম্যান ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকাল অলিভাকে, তারপরেও ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পেরে উঠছে না। বাধ্য হয়ে ওদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পেড্রো। তিনজন মিলে টেনে-হিঁচড়ে সিঁড়ির মাথায় তুলল ওকে, তারপর একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

দোতলা থেকে নীচে নেমে একটা ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল বাডি, ওর পিছু নিয়ে ফ্রিম্যানও। দরজা বন্ধ করে মিনিট দশেক থাকল ওরা ওখানে। তারপর বেরিয়ে এল নতুন সুট, নতুন জুতো, নতুন টাই পরে।

ক্যাডিলাকে চড়ল ফ্রিম্যান। ওটাকে চালিয়ে বাড়ির পিছনে, গোলাঘরে নিয়ে গেল।

বারান্দার ধাপে বসে সিগারেট ধরাচ্ছে বাডি। ওর পিছনে এসে দাঁড়াল পেড্রো, জিজ্ঞেস করল, 'এখনই চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' বলল বাডি। পরিষ্কার একটা রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। 'বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে আছে ও। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

কে আছে তা আর জানতে চাইল না পেড্রো। গোলাঘরের ভিতর থেকে শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। এক মুহূর্ত পর গাঢ় নীল রঙের বড়সড় একটা বুইককে বাঁক ঘুরতে দেখল ওরা, সাবলীল ভঙ্গিতে বাডির পাশে এসে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে ফ্রিম্যান বলল, 'আমি রেডি।'

নতুন পোশাক আর নতুন গাড়ির উপর একবার চোখ বুলিয়ে পেড্রো জানতে চাইল, 'তোমরা কি বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'আগে গেছি, এরকম একটা জায়গায় আবার যাচ্ছি আমরা,' গাড়িতে ওঠার সময় বলল বাডি। 'একই গেট-আপ দু'বার ব্যবহার করা কি ঠিক?'

'ফিরতে দেরি হবে?' জিজ্ঞেস করল পেড্রো।

'না। আজ, না হলে কাল,' বলল বাডি। 'পেড্রো?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল পেড্রো। 'বলো।'

'ওকে দেখে রেখো, পেড্রো। দেখে রেখো মানে... দেখে রেখো। ফিরে এসে যদি দেখি ও নেই, তা হলে তুমিও থাকবে না।'

'ও থাকবে,' সংক্ষেপে বলল পেড্রো। 'আমিও।'

'থাকলেই ভাল,' বলল বাডি। 'গাড়ি ছাড়ো,' নির্দেশ দিল ফ্রিম্যানকে।

উনিশ

জিপ ছুটিয়ে বিশ মাইল পার হতে আধঘণ্টা লেগে গেল রানার। আরও দশ মিনিট লাগল পরিত্যক্ত লগিং ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতে।

বনভূমির মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে হাইওয়ে। জঙ্গল লাগোয়া একটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল সামনে, পরিত্যক্ত লগিং ক্যাম্প পর্যন্ত বিস্তৃত। ওটার গায়ে লেখা নম্বরটা পরিষ্কার পড়া গেল: ২২। থামল না রানা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে আরও সামনে এগোল।

একটু পর জিপটাকে জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে রেখে প্রথমে চারদিকটা দেখে নিল, নীচে নেমে ব্যাক-প্যাকটা পিঠে ঝুলাল, তারপর পায়ে হেঁটে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগোল। পিছনদিক থেকে লগিং ক্যাম্পে পৌঁছাচ্ছে। কয়েকটা আধ ভাঙা কুঁড়েঘর পড়ল ওর সামনে, এক সময় ওখানে কাঠুরেরা থাকত।

দূর থেকে, ওগুলোর পাশে, খোলা জমিনের উপর দায়ানকে পড়ে থাকতে দেখল রানা। এরইমধ্যে ওকে ঘিরে ফেলেছে এক ঝাঁক মাছি।

হতাশা আর দুঃখে ভরে উঠল ওর মন—এই ক্ষতি অনেক বড় আঘাত হয়ে বাজবে অলিভার বুকে। সাবধানে, চারদিকে চোখ রেখে এগোচ্ছে ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা। সত্যি মারা গেছে কি না নিশ্চিত হতে হবে ওকে।

দূরে কোথাও ইঞ্জিনের আওয়াজ হলো। তবে দৃষ্টিসীমার ভিতর কিছু নড়ছে না। অন্য কোনও শব্দও নেই। ধীরে ধীরে দায়ানের কাছে পৌঁছে গেল রানা।

প্রথমেই খেয়াল করল বুকটা ওঠানামা করছে না। অস্ত্রটা বেল্টে গুঁজে রেখে ওর পাশে হাঁটু গাড়ল, এক হাতে বুকের ক্ষত থেকে মাছি তাড়াচ্ছে, আরেকটা হাত দায়ানের গলার পাশে রেখে পালস্ দেখছে।

হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। পালস্ আছে! তবে এত ক্ষীণ যে না থাকারই মত। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে এখনও হয়তো ওকে বাঁচানো সম্ভব।

দ্রুত আরেকবার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। না, কারও সাহায্য পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে আর দেরি করল না, দায়ানকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে জিপের দিকে সাবধানে এগোল ও।

বিশ পা-ও এগোয়নি, অকস্মাৎ দুটো গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানার পথ আটকাল টোবি ব্রাদাররা, দুজনের

হাতেই পিস্তল।

ওদেরকে দেখে চমকে উঠলেও, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা—কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করছে ও, ভাবছে, ওরা ওদিক থেকে আসায় ওর অবাক লাগছে কেন! ওদিক থেকে আসায় কী যেন ঠিক মিলছে না।

তারপর মনে পড়ল ওর—ইঞ্জিনের আওয়াজটা ওদিক থেকে আসেনি।

'যিশুর দয়া,' বলল বাড়ি। 'দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে গেলাম।'

খিকখিক করে হেসে উঠল ফ্রিম্যান। 'আর কেমন বেকায়দা অবস্থায়!'

হাত দুটোর উপর ভারী বোঝা থাকায় সম্পূর্ণ অসহায় রানা, জানে আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই করতে পারবে না—দায়ানকে বাঁচানো তো আরও অসম্ভব। কিন্তু তা-ই বলে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। 'শেষবার যখন দেখি, কালো ড্রেস পরে ছিলে তোমরা,' বলল ও, তারপর জানতে চাইল, 'তোমরাই কি সেই বিখ্যাত টোবি ব্রাদার?

'হ্যাঁ—জন বাড়ি আর ফ্রেড ফ্রিম্যান,' বলল বাড়ি। 'আমরাও তোমাকে চিনি—ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট, রডরিক ফেদেরা। খামোখা ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে নিজের প্রাণটা খোয়াচ্ছ।'

'তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই,' বলল রানা, আলাপটা যতটা সম্ভব দীর্ঘ করে সময় পেতে চাইছে ও। 'আমি অলিভার অভিভাবক, সেই সূত্রে দায়ানের শুভানুধ্যায়ী।' ওদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেলেই চোখের কোণ দিয়ে দু'দিকে নজর বুলাচ্ছে।

'ও-সব দায়-দায়িত্ব থেকে এখনই রেহাই দিচ্ছি তোমাকে,' বলে রানার মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল বাড়ি। দেখাদেখি ফ্রিম্যানও—তবে, ও টার্গেট করেছে রানার বুক।

ওদেরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত করবার একটা আইডিয়া

এইমাত্র বাতিল করে দিল রানা। অকস্মাৎ দায়ানকে ওদের গায়ে ছুঁড়ে দিতে পারলে কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা টেনে নিতে পারত, কিন্তু না, তা সম্ভব নয়—প্রচণ্ড ঝাঁকি আর ধাক্কা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে দায়ান, কিংবা ওদের কারও গুলি খেয়ে। 'কিন্তু দায়ানের অপরাধটা কী?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল ও।

'আমরা এসেছিলাম ওর ভাই যোসেফের খোঁজে,' বলল বাডি। 'যিশুর দয়ায় তাকে আমরা পেয়েও যাই। কিন্তু ওর কপাল মন্দ, তাকে নিয়ে আমরা কী করেছি ও তা দেখে ফেলেছে।'

'তাতে কি? ওটা তো ওর অপরাধ হতে পারে না।'

'আমরা নিজেদের কাজের কোনও সাক্ষী রাখি না,' বলল বাডি, 'সেজন্যেই আজও বেঁচে-বর্তে আছি।'

মরিয়া হয়ে ওদের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার একটা উপায় খুঁজছে রানা। 'শুধু দেখে ফেলার জন্যে একজনকে মেরে ফেলতে হবে...আমার ধারণা, ডন ব্লুমফিল্ড এ-কথা শুনলে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্টই হবেন।'

বাডি আর ফ্রিম্যান চট করে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'ডন ব্লুমফিল্ড?' বলল বাডি, বেশ অবাক হয়েছে ও। 'ওঁর কথা এখানে উঠছে কেন? তুমি জানলে কীভাবে...'

'সব শুধু তোমরা জানবে, তা তো হতে পারে না,' বলল রানা। 'সাংবাদিক হলে ব্লুমফিল্ডের সঙ্গে যখন খুশি দেখা করতে পার তুমি...'

'এই, বাডি,' এই প্রথম মুখ খুলল ফ্রিম্যান, 'তুমি টের পাচ্ছ না, আমাদেরকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ও!'

'তা কী আর পাচ্ছি না,' বলল বাডি, নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। 'গেট রেডি, ডিয়ার জার্নালিস্ট! ওয়ান...টু...'

রানা দেখল ওদের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসছে।

এই সময় অকস্মাৎ কেউ ডাকল: 'ম্যাডাম, ওদিকে!'

পরমুহূর্তে রানার ডান দিক থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল।

গলার আওয়াজটা তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, তার আগেই ডাইভ দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল টোবিরা।

ক্ষিপ্রতা নয়, সতর্কতা অবলম্বনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পিছাতে শুরু করেছে রানা, কাউকে সমুচিত সাজা দেওয়ার চেয়ে এই মুহূর্তে দায়ানের নিরাপত্তার দিকটাকে বড় করে দেখছে ও।

'রানা, গেট ডাউন!' ডান পাশ থেকে টিসা ফিনলের চিৎকার ভেসে এল।

যত দ্রুত সম্ভব বিশ পা পিছিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে দায়ানকে সাবধানে শোয়াল রানা, তারপর ক্রল করে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসবার সময় বেল্ট থেকে টেনে নিল ওয়ালথারটা।

কিন্তু গুলি করবার কোনও সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রটা ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে সরে গেছে। ওদিক থেকে শুধু রাইফেল নয়, একের পর এক পিস্তলের আওয়াজও ভেসে আসছে।

মিনিট দুয়েক পর থেমে গেল যুদ্ধটা। আবার নীরব হয়ে গেল জঙ্গলের পরিবেশ।

আরও ক'মিনিট পর দুজন সশস্ত্র গার্ডকে নিয়ে লগিং ক্যাম্পে ফিরছে টিসা, পথে দেখা হয়ে গেল রানার সঙ্গে—দায়ানকে দু'হাতের উপর নিয়ে জিপের দিকে চলেছে।

'ধরতে পারলাম না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল টিসা। 'এমন জায়গায় বুইকটা লুকিয়ে রেখেছিল, টেরই পাইনি। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল...'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, টিসা,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল রানা; থামেনি ও, দ্রুত পায়ে নিজের পথে হাঁটছে। 'তোমরা ঠিক ওই সময় না এসে পৌঁছালে...'

পাশে চলে এসে রানার দিকে কটাক্ষ হানল টিসা। 'কেউ

ব্যাকআপ হিসেবে দায়িত্ব দিলে আমি তাকে হতাশ করি না,' বলল ও। ওর দুই গার্ড ওদেরকে অনুসরণ করছে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফোনে যখন বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পের কথা বললে, তখনই বুঝতে পারি আমাকে তুমি ব্যাক-আপ টিম হিসেবে চাইছ।'

ব্যাপারটা ঠিক তা না হলেও, এ নিয়ে আর তর্ক করল না রানা, বলল, 'তবে এখন আমি তোমাকে ব্যাক-আপ নয়, মূল টিমের অংশ হিসেবে দেখতে চাইছি, টিসা।'

'মাই প্লেযার,' বলল টিসা, তারপর জানতে চাইল, 'দায়ানের কী অবস্থা?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

রোদে গরম হয়ে আছে বারান্দা, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পা দুটো সামনে লম্বা করে দিল রানা, ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে। পাশের চেয়ার থেকে ওকে দেখছে টিসা।

'কিছু দেব তোমাকে, রানা?' জানতে চাইল ও।

'ব্র্যান্ডি মেশানো ব্ল্যাক কফি হলে ভাল হয়,' একটা হাই তুলে বলল রানা। 'দরকার আসলে লম্বা একটা ঘুম। কিন্তু শেরিফের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একবার দেখা না করলেও নয়।'

'কফি দিচ্ছি, কিন্তু কোথাও যাবার আগে ডাক্তার ফ্লেচার কী বলেন শুনে যাও। আর ওই দুই খুনি সম্পর্কে কী জানো বলো আমাকে।'

'ওরা টোবি ব্রাদার্স—মানিকজোড়—পেশাদার খুনি,' বলল রানা। 'কয়েক ডজন লোককে খুন করেছে, পেছনে কোনও ক্লু বা সাক্ষী রাখে না। তবে এই প্রথম একটা ভুল করেছে। খুন হয়েছে যোসেফ, সেটা দেখে ফেলেছে ভাই দায়ান।'

'এত সব তুমি জানলে কীভাবে?'

'কিছু আগেই জানতাম, কিছু দায়ানের মুখে শুনলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে এইমাত্র আমাকে বলল ও,' জবাব দিল রানা। 'আদালতে ও সাক্ষী দিলে টোবি ব্রাদারদের নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড হবে। কাজেই ওরা এখন খুন করার জন্যে পাগলের মত খুঁজবে ওকে। সেজন্যেই কোনও হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে এখানে এনেছি।

'কোর্টে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ওকে আমি আমার এজেন্সির একটা সেফ হাউসে লুকিয়ে রাখব। কিন্তু কাছাকাছি সেফ হাউসটাও একশো মাইল দূরে হওয়ায় আপাতত তোমার এখানে তুলেছি ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল টিসা। 'আমি চাই এখানেই থাকুক ও,' বলল সে। 'ডাক্তার ফ্লেচারও নিশ্চয় চাইবেন না রোগীকে বেশি নাড়াচাড়া করা হোক।'

'তবে ঝুঁকি...'

'কীসের ঝুঁকি?' জিজ্ঞেস করল টিসা। 'দায়ানের সঙ্গে আমার কি কোনও কানেকশন আছে যে এখানে ওকে খুঁজতে আসবে খুনিরা? এবার অলিভার কথা বলো, কী হয়েছে ওর?'

অসহায় বোধ করছে রানা, চোখে-মুখে তারই ছায়া পড়ল। 'অনেক পরে জানতে পেরেছি ডাক্তার মিলটনের বাড়ির কাছাকাছি কালো একটা ক্যাডিলাক পার্ক করা ছিল। আমার মনে হচ্ছে টোবিরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'শুনলাম ট্র্যাকিং পয়েন্ট পুলিশ স্টেশনে ফাঁসি দেয়ার আয়োজন করা হচ্ছে, পুরানো আমলের কী একটা নাটক মঞ্চস্থ করা হবে,' বলল টিসা। 'চেষ্টা করে দেখলে হয়: ওখানেই টোবি ব্রাদারদের ঝোলানা যায় কি না।'

'তার আগে ধরে বিচার করতে হবে না!'

'বাকিটা পরে শুনব, তোমাদের জন্যে কফি নিয়ে আসি,' বলে কিচেনের দিকে চলে গেল টিসা।

টিসা চলে যেতেই হাজির হলেন ডাক্তার ফ্লেচার।

'রোগীর অবস্থা ভাল নয়,' সরাসরি বললেন তিনি। 'যখন তখন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। তিনদিন পর বলতে পারব কতটুকু কী আশা করা যাবে। এই মুহূর্তে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।'

'ওর জন্যে সেটা নিরাপদ নয়,' বলল রানা। 'শেরিফের সঙ্গে এখনই আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে যাচ্ছি, মিস্টার ফ্লেচার। কোথায় আছে জানতে পারলে আবার হামলা হবে ওর ওপর। আপনার সমস্ত বিল রানা এজেন্সি দিচ্ছে, কাজেই ওর চিকিৎসার ব্যাপারে কোনও রকম কার্পণ্য করার দরকার নেই। আপনি কি রোগীর সঙ্গে থাকতে পারবেন, ডক্টর ফ্লেচার?'

'তা সম্ভব নয়,' বললেন ডাক্তার। 'তবে প্রতিদিন দু'বার এসে দেখে যাব আমি। নার্স কার্লা জানে কখন কী করতে হবে। গোটা ব্যাপারটা আসলে এখন নির্ভর করছে রোগীর স্ট্যামিনা-র ওপর—ভালই মনে হয়েছে আমার। তবে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। ঘটনাটা আমাকে রিপোর্ট করতে হবে, মিস্টার ফেদেরা।'

'চলুন, কফি খেয়ে নিয়ে একসঙ্গেই বেরুই,' বলল রানা।

বিশ

শেষ বিকেলের দিকে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুলো হিলি, চুল আর দাড়িতে চিরনি চালাল, তারপর পরিষ্কার এক সেট নতুন কাপড় পরল।

ওকে ওর কামরা থেকে বেরুতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল পেড্রো। 'তোমার ব্যাপারটা কী?' কঠিন সুরে জানতে চাইল সে।

‘ওকে দেখতে যাচ্ছি,’ দৃঢ়কণ্ঠে বলল হিলি। ‘একজন মেয়েমানুষের যত্ন দরকার ওর।’

‘নিজেকে তুমি মেয়েমানুষ বলো, কুৎসিত কাকতাড়ুয়া?’ খেঁকিয়ে উঠল পেড্রো। ‘তোমাকে দেখে ভয়েই না মরে যায় ও!’

মৃদু ঝাঁকি খেল হিলি। ‘আমি যাচ্ছি,’ বলল ও, এগিয়ে এসে পেড্রোর সামনে থামল। ‘চাবি দাও।’

‘ঠিক আছে, যাও,’ বলল পেড্রো, পকেট থেকে রিংসহ একটা চাবি বের করে ধরিয়ে দিল হিলির হাতে। ‘তবে কোনও রকম আইডিয়া মাথায় খেললে, সেটা বাদ দাও। বাডি কী বলে গেছে শুনেছ তো।’

‘আমার করার আছেটা কী? দুটো কথা বলব, দুঃখী মেয়েটার মন যাতে একটু ভাল হয়।’

‘কামরা থেকে বেরিয়ে দরজায় আবার তালা লাগাতে ভুলো না,’ বলল পেড্রো। ‘ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।’ বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির গেটের দিকে চলে গেল ও।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল হিলি। তালা খুলে দোরগোড়া থেকে কামরাটার ভিতরে তাকাল। ছোট একটা কামরা, ছোট দুটো জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ভিতরে। ফার্নিচার বলতে লোহার একটা বেড, কাঠের মেঝের সঙ্গে পায়াগুলো কবজা দিয়ে আটকানো, একটা হাতলভাঙা চেয়ার, ওয়াশ স্ট্যান্ড আর এক গামলা পানি—পানির উপর ধুলোর পুরু আস্তরণ জমেছে।

দোরগোড়ায় হিলিকে দেখে বিছানার এককোণে সরে গেল অলিভা, চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ।

‘ভয় পেয়ো না, মা,’ নরম সুরে বলল হিলি, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। ‘তোমার কী লাগবে না লাগবে জানতে এলাম।’

ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছে অলিভা। ‘না, আপনি যান! প্লিজ, আর এগোবেন না...’

‘আমি তোমার মতই একজন মানুষ। সার্কাসে ছিলাম...

ফ্রিম্যান আর বাড়ির সঙ্গে।'

'যান, প্লিজ...'

'বেশ তো। কফি খাবে? আমি তোমার জন্যে এক কাপ কফি বানিয়ে আনি? নাকি চা খাবে?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল হিলি। 'তোমার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত... আমরা মেয়েরা ...পুরুষদের জন্যে সব সময় আত্মত্যাগ করে আসছি। এখানে তোমাকে আনা উচিত হয়নি ওদের...'

হঠাৎ মেরুদণ্ড সিধে করে বসল অলিভা। 'কে আপনি?' তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করল ও। 'আমার কাছে কী চান?'

এক পা পিছাল হিলি। 'আমি আসলে একজন শিল্পী—বিখ্যাত বিয়ার্ডেড লেডি। তোমার কাছে কিছুই চাই না। এসেছি একটু সহানুভূতি জানাতে... আমরা মেয়েরা যদি পরস্পরকে সাহায্য না করি...'

ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল অলিভা। 'ওরা বুঝে ফেলেছে দায়ান কোথায়...ওকে ওরা এখন মেরে ফেলবে...'

'শান্ত হও, আমি তোমাকে এক কাপ চা করে দিই...'

'চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আপনি যদি আমাকে এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেন।' ফুঁপিয়ে উঠে বিছানায় উঠে বসল অলিভা। 'প্লিজ, আমাকে বাঁচান! তা না হলে দায়ানকে আমি...'

হিলির চোখে-মুখে হতচকিত ভাব ফুটে উঠেছে। 'না, তা কী করে হয়!' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'আমি তো এ-সব ব্যাপারে নাক গলাই না। কষ্ট হলে আরামের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু কোনও ঝামেলায় জড়াই না। তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দিলে, ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিলে, ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে ওরা আমার ওপর। ওরা তো মানুষ না!'

দু'হাতে মুখ ঢাকল অলিভা। 'দায়ানকে আমি ভালবাসি... ওরা ওকে মেরে ফেলবে...'

'আহা, বেচারি! ভালবাস?' ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজাটা

একবার দেখে নিল হিলি। ‘এখানে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা বলাটা সাংঘাতিক বোকামি হয়ে যাচ্ছে। যাই, তোমার জন্যে চা করে আনি।’ আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে দরজাটা দেখল। ‘মেইন রোড কিন্তু এখান থেকে বেশ দূরে। বাইরে বেরিয়ে ডান দিকে যেতে হয়,’ আপাতদৃষ্টিতে কোনও কারণ ছাড়াই কথাটা বলল ও। ‘হল-স্ট্যান্ডে টাকা আছে...’ ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, দরজা বন্ধ করে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

নড়ছে না, চুপচাপ বিছানায় বসে আছে অলিভা। তারপর হঠাৎ বুকের ভিতর ছোট্ট একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ডটা। *তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ তো পায়নি ও!*

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল অলিভা। পা দুটো অসম্ভব দুর্বল লাগছে। কষ্ট হচ্ছে দম নিতে। পিতলের হাতলটা ধরে ঘোরাল ও। ঘুরল ওটা। দরজার কবাট খুলে গেল।

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল অলিভা, বিশ্বাস করতে পারছে না, ওকে এখান থেকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে ওই বিকট চেহারার মহিলা।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি মাথায় এসে দাঁড়াল ও। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কিচেনটা বোধহয় সিঁড়ির নীচেই, ওদিক থেকে কাপ-পিরিচের আওয়াজ ভেসে আসছে।

ধাপ বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল অলিভা।

ট্র্যাকিং পয়েন্ট পুলিশ স্টেশন। মেইন অফিস রুমের ডেস্কে পা তুলে দিয়ে বসে রয়েছেন শেরিফ কুপার, দু’সারি দাঁতের ফাঁকে চুরুট।

সলিসিটার ব্লেচারের প্রতিনিধি ব্যারিস্টার অ্যাডাম ক্লিপটন এইমাত্র বিদায় নিয়ে চলে গেছে। টক-ঝাল-মিষ্টি টাইপের আলাপ—কখনও উপভোগ করেছেন শেরিফ, কখনও ভয় পেয়েছেন, আবার মাঝে-মধ্যে লোভী হয়ে ওঠায় নিজেকে শালা-

বানচোত বলে গালমন্দ করতেও ছাড়েননি।

ঠিক এই সময় রডরিক ফেদেরাকে অফিসে ঢুকতে দেখে গম্ভীর হাসি ফুটল শেরিফের মুখে। 'ট্রাস্টি দুজনের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করছেন, আপনিই নাকি পাগলীটাকে পালাতে সাহায্য করেছেন, মিস্টার ফেদেরা।'

'স্বেচ্ছায় নয়,' বলল রানা, একটা চেয়ার টেনে বসল। 'আমার হয়তো খানিকটা ভুল হয়েছে, মিস্টার কুপার, কিন্তু আপনার লোকজনও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি।'

'ব্যারিস্টার ক্লিপটন এরকমও সন্দেহ করছেন, আপনি সম্ভবত ভুয়া সাংবাদিক।' রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছেন শেরিফ।

'ওদেরকে বলবেন, ফেডারেল পুলিশ কিংবা এফবিআই গিলবার্টকে ইন্টারোগেট করলে থলের বিড়াল ঠিকই বেরিয়ে আসবে। আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি, অলিভাকে খুন করার জন্যে ব্রুনো আর গিলবার্ট, এই দুই স্নাইপারকে ভাড়া করেছে সলিসিটর ব্লেচার আর ডন মারকাস। উদ্দেশ্য অলিভার সমস্ত টাকা-পয়সা আর সয়-সম্পত্তি মেরে দেয়া।'

'এ-সব কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ,' বললেন শেরিফ। 'প্রমাণ করা সহজ নয়। তা ছাড়া, ভুলবেন না, প্রতিপক্ষ প্রতিশোধ নিতে পারে।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন, শেরিফ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এক মুহূর্ত পর জবাব দিলেন শেরিফ, 'আইনের একজন রক্ষক হিসেবে আপনাকে সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শ দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। ও, আরেকটা ইনফরমেশন দিই আপনাকে,' বলল ও। 'টোবি ভাইদের কথা শুনেছেন কখনও?'

'কেন শুনব না, তবে ওটা তো নেহাতই রূপকথা। টোবি

ব্রাদারদের কোনও অস্তিত্ব নেই। যে-কোনও অমীমাংসিত মার্ডার কেসে ওই দুই কাল্পনিক চরিত্রকে অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'

'ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেবেন না,' বলল রানা, নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। 'ওদের যে শুধু অস্তিত্ব আছে তা-ই নয়, ওরা এখন এই এলাকাতেই। কাল রাতে দায়ানের ভাই যোসেফকে আগুনে পুড়িয়ে খুন করেছে ওরা, গুলি করে মারাত্মক জখম করেছে দায়ানকেও।'

'দায়ানের আবার ভাইও আছে? কই, কখনও শুনিনি তো!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল শেরিফের।

'ছিল, এখন নেই,' বলল রানা। 'নিউ ইয়র্কের ডন ব্লুমফিল্ডের কাজ করত যোসেফ, তার ব্যাঙ্কলুটের টাকা মেরে দিয়ে দায়ানের কাছে এসে লুকিয়েছিল। ওকে মারার জন্যে বাডি আর ফ্রিম্যানকে পাঠিয়েছিল ব্লুমফিল্ড।'

'কী কাণ্ড! কী সর্বনাশ!'

'এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে,' বলল রানা। 'টোবিরা আসার এক হপ্তা আগে উল্টে পড়া একটা ট্রাকের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে অলিভাকে নিজের রান্‌শে নিয়ে যায় দায়ান। সেই থেকে ওখানেই ছিল মেয়েটা।'

'হোয়াট!' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন শেরিফ।

'ভুলে যাবেন না আপনার ব্লাডপ্রেশার আছে,' বলল রানা, ওর ঠোঁটে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'দায়ানের কোনও ধারণা ছিল না মেয়েটা কে, যোসেফ ওকে রান্‌শ্ থেকে বেরুতে দেয়নি। আর সম্ভবত মাথায় আঘাত পাওয়ায় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে অলিভা। নিজেকে সে চিনতে পারছে না।'

'গল্প শুনতে তো মন্দ লাগছে না, কিন্তু এত কথা আপনি জানলেন কীভাবে?' শেরিফের চোখে তীব্র সন্দেহ।

'দায়ানকে খুঁজে পেয়েছি আমি,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে

আমার কথা হয়েছে। রান্‌শ্‌ থেকে অলিভাকে নিয়ে পালাবার সময় বাড়ি ওর বুকে গুলি করে। আহত দায়ানকে বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে রেখে ডাক্তার মিলটনকে নিতে এসেছিল মেয়েটা।'

'কী কাণ্ড! তারপর?' জানতে চাইলেন শেরিফ। 'পাগলীটা এখন কোথায়?'

'আমার ধারণা টোবিরা ধরে নিয়ে গেছে ওকে,' বলল রানা। 'আমি চাই ওদেরকে ধরার জন্যে হান্ট শুরু করবেন আপনি। এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার এই একটা সুযোগ আপনার।'

'হুম।' ঠিক উদ্বিগ্ন নয়, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে শেরিফকে।

'আরেকটা কথা, ফিনলেদের প্ল্যানটেশনে পুলিশ প্রোটেকশন দরকার। দায়ান ওখানে আছে, এটা কারও জানার সুযোগ নেই, তবে কোনওভাবে জানতে পারলে ওকে খুন করার জন্যে ওখানে ঠিকই হানা দেবে ওরা।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন শেরিফ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার ফেদেরা,' বললেন তিনি। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দিন আপনি। লেফটেন্যান্ট মিচেলকে ফিনলে প্ল্যানটেশনে পাঠাচ্ছি, সঙ্গে দুজন কনস্টেবল থাকবে। টোবি ব্রাদারদের ধরার জন্যেও চারদিকে জাল ফেলছি।'

নীচের বারান্দায় নেমে এসে কোথাও কাউকে দেখল না অলিভা। কিচেন থেকে এখনও কাপে চামচ নাড়াচাড়া করবার আওয়াজ ভেসে আসছে—চা বানাতে অস্বাভাবিক দেরি করছে দাড়িঅলা মহিলাটি। প্রকৃতির কী উদ্ভট খেয়াল, ভাবল ও; কিন্তু মানুষটা অসম্ভব ভাল—মানবতার খাতিরে নিজের বিপদ হবে জেনেও ওকে পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

ধীর পায়ে হলরুমের দিকে যাচ্ছে অলিভা, দরজাটা আধ খোলা দেখতে পাচ্ছে। হল-স্ট্যান্ডের পাশে থামল ও, ওটার উপর

বিশ ডলারের নোংরা একটা নোট পড়ে রয়েছে। ওটা নিল ও, শুকনো আর ভঙ্গুর লাগল ওর নার্ভাস আঙুলে।

ঘুরতেই হিলিকে দেখতে পেল অলিভা, হাতে ট্রে নিয়ে কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে সে, হাত দুটোর সঙ্গে ট্রেটাও কাঁপছে, মৃদু ঠনঠন আওয়াজ করছে পিরিচের উপর রাখা কাপ।

হঠাৎ আরেকটা আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল অলিভা—আশপাশের জঙ্গলে গাছ কাটছে কেউ।

হিলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ছুটল অলিভা, বারান্দা থেকে উঠানে নেমেও থামছে না। সামনে একটা কাঠের সাদা গেট দেখা গেল, একটু ঘুরে সেদিকে যাচ্ছে ও।

পার হয়ে এল গেট। নীরব, শেষ বিকেলের শান্তিময় পরিবেশটাকে নষ্ট করছে শুধু গাছ কাটার আওয়াজটা। কোন্‌দিকে যাবে বোঝার জন্য থামল অলিভা, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। মনে পড়ল হিলি ওকে বলেছে—*মেইন রোড কিন্তু এখান থেকে বেশ দূরে। বাইরে বেরিয়ে ডান দিকে যেতে হয়।*

হঠাৎ খেয়াল করল অলিভা, জঙ্গলের ভিতরটা এখন একদম নীরব, গাছ কাটার শব্দ এখন আর হচ্ছে না। সরু পথ ধরে দ্রুত পায়ে ডানদিকে হাঁটা ধরল ও। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর গাছপালার ফাঁকে পাকা রাস্তা দেখতে পেল।

সেদিকেই যাচ্ছে, এমনি সময়ে বামদিকের সরু পথের বাঁক ঘুরে হঠাৎ বেরিয়ে এল পেড্রো, হাতে কুঠার—ওর থেকে পাঁচ হাত দূরে থমকে দাঁড়িয়েছে ওকে দেখে। চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস, ভাব দেখে মনে হলো চোখ রগড়াতে যাচ্ছে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মেয়ে, কোথায় যাচ্ছ? এখানে কী করে এলে? যাও, নিজের ঘরে যাও!'

'খবরদার!' বলল অলিভা। 'আমাকে ছোঁবেন না! আমি চলে যাচ্ছি...আপনি আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবেন না...'

‘কোথাও তোমার যাওয়া চলবে না,’ হাতের কুঠার ছেড়ে দিয়ে বলল পেড্রো, অলিভার দিকে হেঁটে আসছে। ‘আমি তোমাকে ওদের মত মারধর করতে চাই না, কিন্তু কথা না শুনলে বাধ্য হব...’

আবার মার খাওয়ার কথা শুনে শিউরে উঠল অলিভা। তারপর হঠাৎ টের পেল, ভয়ে হাত-পা নাড়তে পারছে না ও।

এগিয়ে এসে ওর একটা কবজি খপ করে ধরল পেড্রো।

লোকটার ছোঁয়া পেতেই অলিভার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বন্দি বাঘিনীর মত ধস্তাধস্তি শুরু করল ও। কিন্তু ওর চেয়ে পেড্রোর গায়ের জোর অনেক বেশি, দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে ওকে।

সুযোগ পেয়েও পালাতে ব্যর্থ হয়েছে ও, ভাবল অলিভা, এ জন্মে দায়ানের সঙ্গে আর বোধহয় ওর দেখা হলো না।

হঠাৎ অনুভব করল পেড্রোর পেশিতে ঢিল পড়ছে। কী ব্যাপার? পেড্রোর দৃষ্টি অনুসরণ করে একপাশে তাকাল ও। দেখল হিলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে—হাতে একটা ডাবল-ব্যারেল শটগান, প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সরাসরি পেড্রোর মাথার দিকে তাক করা।

‘ওকে ছেড়ে দাও,’ হিসহিস করে বলল হিলি। ‘প্লিজ, ডম, ছেড়ে দাও ওকে।’

‘সরে দাঁড়াও, হিলি!’ খেঁকিয়ে উঠল পেড্রো। ‘তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে?’

অকস্মাৎ ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে পেড্রোর কুঁচকিতে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল অলিভা। ওকে ছেড়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে গেল পেড্রো। পরমুহূর্তে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল ধরবে বলে।

ঘুরে তীর বেগে রাস্তার দিকে ছুটল অলিভা। শুনতে পেল হুমকি দিয়ে হিলি বলছে, ‘থামো, ডম, তা না হলে গুলি করতে বাধ্য হব আমি...’

তারপর গোটা বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল শটগানটা।

একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে পাকা সাইড রোডে উঠে এল অলিভা, রোডসাইন দেখে হাইওয়ের দিকে ছুটছে।

একুশ

দু'তিনবার লিফট নিয়ে দশ মাইল পার হলো অলিভা, কিন্তু বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে পৌঁছাতে হলে আরও দশ মাইল যেতে হবে ওকে। মুশকিল হলো, সন্ধে হয়ে যাওয়ায় হাইওয়ের গাড়িগুলোকে হাত দেখিয়ে আর থামানো যাচ্ছে না।

রাতে একজন পুরুষ যদিও বা লিফট পায়, কোনও মেয়ে পাবে না, বিশেষ করে তাকে দেখে যদি বন্য বা মানসিক প্রতিবন্ধীর মত দেখায়।

রাস্তার ধারে এক ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অলিভা। গাড়ির হেডলাইট দেখলেই হাত তুলছে, কিন্তু একটাও থামছে না, শাঁ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার।

তারপরেও হাল ছাড়ছে না অলিভা, ভাবছে কেউ না কেউ অবশ্যই থামবে। বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে ফিরে সেখানে আর

দায়ানকে পাবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, তবে প্রথমে ওকে ওখানেই যেতে হবে। কে জানে, ও পালিয়েছে জেনে টোবিরা হয়তো ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে।

ওদের ফাঁদে ধরা দিতে ওর কোনও আপত্তি নেই, কারণ ধরা দিলে ওর জানার সুযোগ হবে দায়ানকে মেরে ফেলা হয়েছে কি না। আর মেরেই যদি ফেলে তা হলে ওর ধরা পড়া বা না পড়ায় কী এসে যায়!

দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর একজোড়া হেডলাইট ছুটে আসছে দেখে হাত তুলল অলিভা। অবশেষে বোধহয় থামতে যাচ্ছে একটা গাড়ি। বড়সড় ওয়াগান বলে মনে হলো, ধীরে ধীরে স্পিড কমিয়ে ওর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হাই,' অন্ধকার ক্যাব থেকে বলল ড্রাইভার। 'তোমার বোধহয় লিফট দরকার?'

চোখে হেডলাইটের আলো পড়ায় ভাল দেখতে পাচ্ছে না অলিভা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' ভাবল, এই সুযোগ হাত ছাড়া করা চলবে না। লগিং ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারলে এখনও হয়তো দায়ানকে দেখতে পাবে সে।

ক্যাব থেকে নীচে নেমে কয়েক পা হেঁটে এল ড্রাইভার, অলিভার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। অলিভা লক্ষ করল সাদা কোট পরে আছে লোকটা।

'আজ আমার বৃহস্পতি তুঙ্গে,' হেসে উঠল ড্রাইভার, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। অলিভার ডান কবজিটা চেপে ধরে সামান্য মোচড় দিয়ে পিঠের কাছে নিয়ে গেল, ঘোরাল ওকে, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে।

ওয়াগানের পিছনে নিয়ে এল ওকে, বলল, 'ভেতরে আরেক পাগল আছে, তবে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। খবরদার, দুজনে আবার মারামারি বাধিয়ে দিয়ো না।'

অলিভার জানার কথা নয় লোকটা আসলে হিলসাইড মেন্টাল

স্যানাটোরিয়ামের ড্রাইভার। ওর নাম হ্যাকাবি। এক রোগিণীকে আনার জন্য ফ্রেযনোতে গিয়েছিল। ওকে মাতাল মনে করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল অলিভা।

'অ্যাই, চেঁচামেচি করবে না!' হাসিমুখে তিরস্কার করল হ্যাকাবি, দরজার তালা খুলে ম্লান আলোয় কিছু দেখবার চেষ্টা করল, তারপর অ্যামবুলেন্সের ভিতরে ঠেলে দিল অলিভাকে।

দরজা বন্ধ করে ক্যাবে উঠল ও, ছেড়ে দিল গাড়ি। শিস দিচ্ছে খুশিতে।

অ্যামবুলেন্সের মেঝেতে আধ-বসা অবস্থায় পড়ে থাকল অলিভা কিছুক্ষণ। সিধে হয়ে বসতে যাবে, চরম আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল ও।

স্ট্রেচারে এক মহিলা শুয়ে রয়েছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে! দেখতে সাধারণ, এলোমেলো একরাশ কালো চুল স্তূপ হয়ে আছে কাঁধের দু'পাশে। ওর শরীরের উপর দিকটা স্ট্রেইট-জ্যাকেট পরিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে স্ট্রেচারের সঙ্গে। পা দুটোও স্ট্রেচার-রেইলের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। পাগলী!

কীসের যেন একটা উত্তেজনা আছে ট্র্যাকিং পয়েন্টে। মেইন রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় টোবি ব্রাদাররা অনুভব করছে ব্যাপারটা। তবে চারদিকে চোখ বুলিয়েও উত্তেজনাকর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না ওরা।

অন্ধকার কালো চাদরের মত ঢেকে রেখেছে ট্র্যাকিং পয়েন্টকে; বার, কাফে আর ওষুধের দোকান ছাড়া আর কোথাও আলো নেই। কিন্তু উত্তেজনা আছে: রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ঝুলছে—দেখতে পাওয়া না যাক, অনুভব করতে পারছে ওরা।

বিষয়টা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বাড আর ফ্রিম্যানকে, তবে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনও আলাপ করছে না ওরা—কারণ কিছুটা সন্দেহ আছে ব্যাপারটা ওদের কল্পনা কি না।

সুযোগ পেয়েও নিজেদের ভুলে বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পে দায়ানকে খুন করতে পারেনি ওরা। ওখান থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে এদিকে। তবে হার মানতে রাজি নয় কিছুতেই, নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার তাকে খুঁজতে বেরুবে। ওদের এখন ঘুম দরকার, নিদেনপক্ষে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

ফ্রিম্যান গাড়ি চালাচ্ছে। মেইন রোড থেকে সাইড রোডে ঢুকল ও, পুলিশ স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছে।

থানার পঞ্চাশ গজ দূরেই জেলখানা, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওটার গেটের সামনে লোকজনের ছোট একটা জটলা দেখে বুইকের স্পিড কমাল ফ্রিম্যান।

নিজের অজান্তেই যেন বাডির হাত শোল্ডার হোলস্টারে পৌঁছে গেল, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল শ্যেনপাখির মত তীক্ষ্ণ। তবে লোকজন একবার শুধু ওদের গাড়ির দিকে তাকাল, তারপর আবার জেলখানার দিকে ফিরল।

'কী হচ্ছে?' নিচু গলায় প্রশ্ন করল ফ্রিম্যান।

'অস্থির হবার মত কিছু নয়,' বলল বাডি। 'হোটেলের পেছন দিক এটা, গ্যারেজটা কোথায় খুঁজে নিয়ে গাড়িটা লুকাও।'

গ্যারেজে গাড়ি রেখে হোটেলের সামনের দিকে যাচ্ছে ওরা। ছায়ার ভিতর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে, তবে জটলার লোকগুলো কিছু একটা নিয়ে এত বেশি মগ্ন, ওদের দিকে তাকালই না। তাদের কারও কারও হাতে দু'একটা প্ল্যাকার্ড আর ব্যানারও দেখতে পেল ওরা। তবে ওগুলোয় কী লেখা আছে পড়বার সুযোগ হলো না।

রিসেপশন ডেস্কে খর্বকায় এক লোক বসে আছে, হাতে কোনও কাজ না থাকায় চওড়া গোঁফে মোম লাগাচ্ছে। কলম আর খাতাটা বাডির দিকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একটা ডাবল রুম, নাকি দুটো সিঙ্গেল?'

'ডাবল,' বলে খাতায় দুজনের নাম লিখল বাডি। সই করল।

কলমটা নিল ফ্রিম্যান, কাল্পনিক নাম দুটো দেখল, তারপর দ্বিতীয়টার নীচে সই করল।

'কাল সকাল সাড়ে আটটায় কফি আর গরম রোলস পাঠাবেন,' রিসেপশনিস্টকে বলল বাডি। 'সঙ্গে খবরের কাগজ।'

একটা কাগজে নোট নিয়ে বেল বাজাল রিসেপশনিস্ট।

বেল-বয়ের বয়স বেশি না হলেও চোখের নীচে কালি জমেছে, তবে ওর হ্যাটটা দেখে বাডির মনে হলো কোনও ফ্যাশন শো-তে অংশ নিতে যাবে। ওদের পেটমোটা ব্যাগটা নিয়ে মান্ধাতা আমলের এলিভেটরের দিকে এগোল সে। ওটার দরজায় কবাট নেই, তার বদলে গ্রিল দিয়ে ঘেরা।

এলিভেটরে চড়ে উপরতলায় উঠছে ওরা, কাঠের উপর হাতুড়ি ঠোকার ভোঁতা আওয়াজ শুরু হলো কোথাও—ভেঙে খান খান হয়ে গেল হোটেলের নীরবতা।

'মঞ্চ বানাচ্ছে,' বেল-বয় বলল, উত্তেজনায় চকচক করছে ওর চোখ দুটো।

'কীসের মঞ্চ?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান।

'ঝোলানোর জন্যে,' বলল বেল-বয়। এলিভেটর থামতে গ্রিল সরিয়ে করিডরে নামল। 'আপনারা শোনেননি?'

সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা দুজন, তারপর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। স্কাই-ব্লু পা'জামা আর সাদা সিল্ক টপ পরা একটা মেয়ে ওদেরকে পাশ কাটাল, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে—ওদের দিকে তাকাল ও, চোখে নীরব হাসি।

ফ্রিম্যান ওকে দেখতেই পেল না। 'কী ঝোলানোর জন্যে?' বেল-বয়কে প্রশ্ন করল ও।

'আমাদের রুম কোন্‌টা?' জানতে চাইল বাডি, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। 'এই, রুমটা দেখাও।'

করিডর ধরে আরেকটু এগিয়ে এসে একটা কামরার সামনে দাঁড়াল বেল-বয়, তালা খুলে আলো জ্বালল। মাঝারি আকারের

একটা কামরা। দু'পাশে দুটো বেড, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। একপাশে বাথরুমের দরজা।

'কী ঝোলানো হবে?' আবার জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান, কামরার দরজা বন্ধ করছে।

ট্রাউজারের পিছনে হাত ঘষল বেল-বয়, ওর চোখ-মুখ বলছে ভাল কোনও খবর দিতে যাচ্ছে। 'আপনারা ইস্কাপনের টেক্কার নাম শোনেননি?' জানতে চাইল ও। 'বিখ্যাত সিরিয়াল কিলার গার্থ-এর কথা বলছি। তাকে নিয়ে লেখা বইও পড়েননি? সতেরজন টিন-এজার মেয়েকে রেপ করে সে, তারপর মেরে ফেলে। প্রতিটি লাশের সঙ্গে একটা করে ইস্কাপনের টেক্কা রেখে যেত গার্থ। ওই সূত্র ধরেই তাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ, তারপর ফাঁসিতে ঝোলায়।'

'ফাঁসিতে ঝোলানো হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান, হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে। 'তা হলে আবার কীসের মঞ্চ তৈরি হচ্ছে?'

'আরে, ধ্যাত, আমিও যেমন!' নিজেকে তিরস্কার করল বেল-বয়। 'আসল কথাটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। কাল রাতে গার্থকে নিয়ে লেখা একটা নাটক মঞ্চস্থ করা হবে জেলখানার ভেতরে—পুলিশ ও কয়েদীরা অভিনয় করবে তাতে, বুঝলেন!'

'কিন্তু ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড হাতে জেলখানার সামনে লোকজন ভিড় করেছে কেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান।

'ওদের যত ঢং!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল বেল-বয়।

'মানে?'

'ওরা মানবাধিকার কর্মী, মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে,' জবাব দিল বেল-বয়। 'ভেবে দেখুন কী আবদার, বলছে—কোনও মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে, এই দৃশ্য এমনকী মঞ্চ-নাটকেও দেখানো যাবে না—বিশেষ করে কোনও জেলখানায়। আমি তো বলি এ-ধরনের অপরাধীকে শেয়াল-

কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো উচিত...'

'বেরিয়ে যাও,' ওর দিকে না ফিরেই বলল বাডি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল বেল-বয়। 'আমি কোনও ভুল করেছি, স্যর?'

'তুমি যাও!' সুর নরম করল বাডি।

ত্রস্ত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল বেল-বয়, খানিক ইতস্তত করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। দুজনেই দেখছে ওকে; ওদের সতর্ক, অপলক দৃষ্টি বেশ ভয় পাইয়ে দিল ছেলেটাকে—ওর অনুভূতি হলো, যেন কোনও অন্ধকার কবরস্থানে পথ হারিয়ে ফেলেছে; বেরোবার গেট খুঁজে পাচ্ছে না।

বেল-বয় চলে যাওয়ার পর ব্যাগটা তুলে বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিল বাডি।

কামরার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রিম্যান। হাতুড়ি পেটার ভোঁতা আওয়াজটা এখনও ওর মনোযোগ ধরে রেখেছে। 'ভাবছি ফাঁসিতে ঝুলতে কেমন লাগে,' হঠাৎ করে বলল ও।

'এ নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি আমি,' বলল বাডি, ব্যাগের ভিতর ঢোকানো হাতটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল।

'ফাঁসি হোক আর ইলেকট্রিক চেয়ার,' বলল ফ্রিম্যান, 'প্যাসেজ ধরে একসময় নিতে আসবে তোমাকে, অথচ তোমার কিছু করার থাকবে না। তখন তুমি খাঁচায় বন্দি একটা জানোয়ার ছাড়া কিছু নও।'

কাপড় পাল্টাচ্ছে বাডি, কিছু বলছে না।

'এই অবস্থায় আমরাও পড়তে পারি, বাডি,' বলল ফ্রিম্যান, ঘেমে ওঠায় কপালটা চকচক করছে।

'শুয়ে পড়ো,' বলল বাডি।

বিছানায় না ওঠা পর্যন্ত আর কোনও কথা হলো না। আলো নিভিয়ে দিল বাডি, তারপর অন্ধকার থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভাবছি ফেদেরাকে কোথায় পাওয়া যাবে। জানতে হবে

দায়ানকে কোথায় লুকিয়েছে সে, আর দায়ান মুখ খুলেছে কি না।'

ফ্রিম্যান কিছু বলছে না, এখনও হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ শুনছে। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'এই আওয়াজটা কি থামবে না?'

ওর গলার কাঁপুনিটা টের পেল বাডি। 'কাজটা শেষ হলেই থামবে,' বলল ও। 'তুমি ঘুমাও।'

কিন্তু ফ্রিম্যানের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। শব্দটা না শুনে পারছে না ও। প্রতিটি হাতুড়ির বাড়ি কানে নয়, যেন ওর স্নায়ুতে আঘাত করছে। বাডির শ্বাস-প্রশ্বাসের হালকা ছন্দও প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে ওর মনে। বাডির উপর রাগ হচ্ছে ওর, ভাবছে এরকম পরিবেশে কেউ ঘুমায় কীভাবে! রাগ হচ্ছে নিজের উপরও—ভয় পাওয়ায়, ওর স্নায়ু বাডির মত অত শক্ত নয় বলে।

হঠাৎ একসময় বন্ধ হয়ে গেল হাতুড়ির আওয়াজ। কিন্তু তারপরেও ঘুমাতে পারছে না ফ্রিম্যান। খানিক পর অকস্মাৎ বিকট একটা শব্দ হতে ঝট্ করে বিছানায় উঠে বসল ও, হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালল। 'কী হলো...কীসের শব্দ?' ফিসফিস করল।

ঘুম ভেঙে গেল বাডির। সম্পূর্ণ সজাগ ও, এতটুকু বিচলিত নয়। 'ওরা ট্র্যাপটা টেস্ট করে দেখছে,' শান্তভাবে বলল ও।

'ও, হ্যাঁ,' বলল ফ্রিম্যান। 'আমি বুঝতে পারিনি।' আলোটা নিভিয়ে দিল ও।

এবার টোবি ব্রাদারদের কেউই ঘুমাতে পারছে না।

অতীতে ফিরে গেল ফ্রিম্যান। যে-সব মানুষকে খুন করেছে তাদের চেহারা অন্ধকারে ভেসে বেড়াতে দেখছে। ঘিরে ফেলছে ওকে। ক্রমশ ছোট করে আনছে বৃত্তটাকে।

বাডি ঘুমাতে পারছে না ফ্রিম্যানের কথা ভেবে। বেশ কিছুদিন হলো ওকে বিশেষভাবে লক্ষ করছে সে। বাইরে কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও, তার সন্দেহ, ধীরে ধীরে সাহস হারাচ্ছে

ফ্রিম্যান। মন বলছে, পার্টনার হিসাবে ওকে আর খুব বেশিদিন সঙ্গে রাখা যাবে না।

চিন্তাটা বিরক্ত করছে বাড়িকে, কারণ বহু বছর ধরে ফ্রিম্যানকে চেনে ও। সেই স্কুল-জীবন থেকে একসঙ্গে ছুরি ছুঁড়তে শিখেছে ওরা।

তবে খানিক পর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে ঘুমও ভাঙল সাড়ে আটটায়, ঠিক যখন রুম সার্ভিস ওদের জন্য ব্রেকফাস্ট আর খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে।

কফি শেষ করে শাওয়ার সারল বাড়ি, দাড়ি কামিয়ে কাপড়চোপড় পরল, কামরা থেকে বেরুবার আগে বলল, 'একটু পরেই ফিরব। তুমি কোথাও যেয়ো না।'

বিছানায় বসে নাস্তা খাওয়ার পর আবার শুয়েছে ফ্রিম্যান। কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল।

জিপটা রাস্তার ধারে পার্ক করল রানা, ধাপ বেয়ে পুলিশ স্টেশনে উঠতে যাচ্ছে। এই সময় ওকে দেখতে পেয়ে রাস্তার ওপার থেকে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির মালিক জন ম্যাক ডাকল : 'মিস্টার ফেদেরা!' রাস্তা পার হয়ে দ্রুত ওর কাছে চলে এল লোকটা। নিশান জিপটার বদলে আরও ভাল একটা গাড়ি নেবার জন্য সাধছে ওকে।

হোটেলের পিছন থেকে বেরিয়েই বাড়ি শুনতে পেল—'মিস্টার ফেদেরা!' সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে একটা ট্রাকের পিছনে দাঁড়াল ও।

গাড়ি বদলাতে রাজি হলো না রানা; ম্যাকের কাছ থেকে বিদায় নিল, ধাপ বেয়ে থানায় ঢুকছে।

রাস্তা পার হয়ে নিজের অফিসে ফেরত আসছে ম্যাক, তার দিকে এগোল বাড়ি।

'এইমাত্র যার সঙ্গে কথা বললেন, ভদ্রলোক মিস্টার রডরিক

ফেদেরা না?’ জানতে চাইল ও।

থমকে দাঁড়িয়ে বাডিকে ভাল করে দেখল ম্যাক, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘হ্যাঁ,’ বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

‘ধন্যবাদ,’ বলল বাডি, তারপর ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এল।

ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে ফ্রিম্যান, ধাক্কা দিয়ে ওকে ওঠাল বাডি। ‘ওঠো, জলদি!’

‘কী হলো?’ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ফ্রিম্যান।

ওয়ার্ড্রোব থেকে ব্যাগ বের করে ভিতরটা হাতড়াচ্ছে বাডি। হোমিং ডিভাইস সহ খুদে একটা ব্লিপার বের করল, ফ্রিম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল শুধু ব্লিপারটা। ‘থানার সামনে একটা তোবড়ানো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ব্লিপারটা ওর ভেতর কোথাও লুকিয়ে রেখে এসো।’

‘কেন, কার জিপ ওটা?’ বিছানা থেকে নেমে দ্রুত কাপড় পরছে ফ্রিম্যান।

‘ফেদেরার,’ সংক্ষেপে জবাব দিল বাডি। ‘ওর পিছু নিলে জানা যাবে কোথায় আছে দায়ান।’

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ফ্রিম্যান।

‘এই যে, মিস্টার ফেদেরা—আসুন।’

‘নতুন কোনও খবর আছে, মিস্টার কুপার?’ পুলিশ স্টেশনের মেইন রুমে ঢুকে শেরিফকে জিজ্ঞেস করল রানা, একটা চেয়ার টেনে বসল।

‘আছে, তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়,’ বললেন শেরিফ। ‘মডেস্টো পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়ে ট্রাস্ট-এর প্রথম সাক্ষী ডক্টর পেরি প্রেসটন আর সদস্য মাসুদ রানা সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার আর মারিয়ো মারকাসের বিরুদ্ধে প্রতারণা আর জালিয়াতির অভিযোগ এনে মামলা করেছেন।’

যেহেতু নিজে জড়িত, সবই জানে রানা। 'গুরুত্বপূর্ণ নয় বলছেন কেন?' বলল ও। 'মারকাসকে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করার জন্যে সাক্ষীদের ভুল বুঝিয়ে সই আদায় করেছে ব্লেচার। একজন মাফিয়া ডন ওই বোর্ডের বৈধ সদস্য হতে পারে না, অথচ ওর সই ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক থেকে অলিভার টাকা তুলে নিচ্ছিল। সেটা তো বন্ধ হলো।'

'বন্ধ হলো মানে?' বিস্মিত দেখাল শেরিফকে।

'ও, আপনি শোনেননি!' বলল রানা। 'ওই দুই সদস্যের উকিলরা কোর্ট থেকে স্টে অর্ডার আদায় করে নিয়েছেন, অর্থাৎ, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অলিভার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে আর তুলতে পারবে না ওরা।'

'হুম,' একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন শেরিফ। 'তবে ব্যাঙ্ক থেকে ইতিমধ্যে কম টাকা তোলেননি...আর মেয়েটার যা কিছু আছে সব একসময় ওঁরাই পেয়ে যাবেন—কারণ ওই মেয়ে যদি বেঁচেও থাকে, কখনও সুস্থ হবে বলে তো মনে হয় না।'

'ওর সঙ্গে কথা বলে আমার কিন্তু ওকে পাগল বলে মনে হয়নি,' বলল রানা। 'কখনও যদি শোনা যায় ওর ভুল চিকিৎসা হয়েছে, একটুও আশ্চর্য হব না। যাই হোক, টোবি ব্রাদারদের কোনও খবর পেলেন?'

মাথা নাড়লেন শেরিফ। 'ওদের কালো ক্যাডিলাকটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পাগলীটারও কোনও হদিস নেই। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে, বুঝলেন! টোবিরা যদি মেয়েটার সন্ধান পেয়ে থাকে, ওকে কি তারা বাঁচিয়ে রাখবে? হয়তো দায়ানকে না পাবার আক্রোশ মেটাবে ওর ওপর।' চুরুট ধরাবার সময় রানার দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন তিনি।

রানা বলল, 'শুনলাম কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গেছে গিলবার্ট।'

'হ্যাঁ।'

‘পুলিশই দায়ী,’ শান্ত সুরে বলল রানা। ‘কারণ কেসটা আপনারা ভালভাবে সাজাতে পারেননি।’

‘সেজন্যে পুলিশকে আপনি দোষ দিতে পারেন না,’ বললেন শেরিফ। ‘কেস তো পুলিশ লড়ে না, লড়েন সরকারী উকিল।’

‘উকিলকে লড়তে হয় পুলিশী তদন্ত থেকে পাওয়া তথ্য আর এভিডেন্সকে পুঁজি করে,’ বলল রানা। ‘সে-সব যদি অসম্পূর্ণ বা দুর্বল হয়, তাঁর কিছু করার থাকে না। আমার কানে এসেছে, গিলবার্টের কাছ থেকে রাইফেল উদ্ধার করার ব্যাপারটা আপনাদের তদন্ত রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়নি, তারই সুযোগ নিয়ে গিলবার্টের উকিল বলতে পেরেছে, পুলিশ ওর কাছ থেকে কোনও রাইফেল উদ্ধার করেনি।’

এক মুহূর্ত পর শেরিফ বললেন, ‘কাজ করতে গেলে ভুলভাল হতেই তো পারে।’

‘কোনও খবর পেলে জানাবেন, ফোন নম্বর তো আছেই,’ বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

পুলিশ স্টেশনের বাইরে বেরুতেই পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জটলা দেখতে পেল রানা। প্রাণদণ্ড বিরোধী মানবাধিকার কর্মীরা আজও জেলখানার ভিতরে ফাঁসির মঞ্চ তৈরির প্রতিবাদ জানাতে এসেছে।

বাইশ

নিজেদের হোটেল রুমে টোবিরা যখন ঘুমাবার চেষ্টা করছে, হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের ড্রাইভার হ্যাকাবি তখন অন্ধকার রাস্তা ধরে অ্যামবুলেন্স ছুটিয়ে ফিরে আসছে মডেস্টো শহরে।

আনন্দ আর উল্লাসে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে ওর অন্তর।

নির্জন রাস্তা ধরে আসার পথে হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ মেয়েটার মাথায় লাল চুল দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি হ্যাকাবি। তারপর ভেবেছে এরকম লাল চুল দশলাখ মেয়ের মধ্যে মাত্র একজনের থাকে, ও নিশ্চয়ই হিলসাইড থেকে পালানো পাগলী অলিভা না হয়ে যায় না।

তালা দেওয়া অ্যামবুলেন্সের ভিতরে রয়েছে মেয়েটা, তবু অকারণে সন্দেহ হচ্ছে ওর, ভাগ্যটা কী সত্যিই এত ভাল? এ যেন মাতা মেরি নিজ হাতে ঝপ্ করে ওর কোলে দশটি হাজার ডলার ছুঁড়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ করে হ্যাকাবির মনে হলো, অলিভাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে না রাখাটা বোকামি হয়ে গেছে ওর। পাগলরা কত রকমের চালাকি যে জানে! কত কী যে খেলে ওদের মাথায়!

হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামে মেইল নার্স হিসেবে বেশ কয়েক বছর চাকরি করেছে হ্যাকাবি। কিন্তু কাজটার প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হওয়ায় কিছুদিন আগে ওটা ছেড়ে দিয়ে অ্যামবুলেন্স চালাবার চাকরিটা নিয়েছে। বিপজ্জনক পাগলদের মোটেও ভয় পায় না, ওদেরকে কীভাবে সামলাতে হয় ভালভাবেই শেখা আছে ওর।

ইতস্তত করছে হ্যাকাবি; সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না অ্যামবুলেন্স থামিয়ে অলিভাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধবে, নাকি সোজা হিলসাইডে গিয়ে থামবে।

কান পাতল হ্যাকাবি। না, পিছন থেকে কোনও শব্দ আসছে না। সিদ্ধান্ত নিল—থাক, সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, তারচেয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মডেস্টোয় পৌঁছাই।

কিন্তু অ্যামবুলেন্সের ভিতর চাপাস্বরে কী আলাপ চলছে তা তো আর হ্যাকাবির জানার কথা নয়।

অ্যামবুলেন্সের ভিতর অলিভার সঙ্গে যে পাগল মহিলা রয়েছে তার

নাম কিথ লিয়োনোরা। বহু বছরের পুরানো রোগী সে, বাড়িতে রাখতে এতদিন কোনও অসুবিধে হয়নি; হঠাৎ করেই ওর মধ্যে হোমিসাইডাল টেনডেন্সি দেখা দেওয়ায় চিকিৎসার জন্য হিলসাইডে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিভাবকরা, কারণ তাঁরা জানেন হিলসাইডের স্টাফ বিপজ্জনক পাগলদের খুব দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে পারে।

লিয়োনোরাকে দেখামাত্র অলিভা বুঝতে পারল, ওকে একটা পাগলীর সঙ্গে আটকে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ওর শরীরের রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেল।

'আরে, বাহ্, ওরা তা হলে তোমাকে ধরে ফেলেছে!' ফিসফিস করে বলল লিয়োনোরা, তারপর হেসে উঠল। 'রাস্তায় দেখতে পেয়ে তুলে নিল, তাই না? সত্যি, ভারি চালাক ওরা—দেখামাত্র চিনে ফেলেছে তোমাকে।'

অ্যামবুলেন্সের মেঝেতে নিতম্ব ঘষে পিছু হটল অলিভা। মহিলার ছোট আকৃতির চোখ, চোখের চতুর দৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ করে ওর বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার সেই অনুভূতিটা হলো ওর—ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে ও।

'হিলসাইডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাকে,' বলে চলেছে লিয়োনোরা। 'ওখানে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে আটকে রাখা হবে। ওই জায়গা সম্পর্কে জানি আমি। আমাকেও ওখানে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ বাড়ির লোকজন আর নার্স আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না, ভয় পাচ্ছে।' মাথাটা একটু তুলে অলিভাকে ভাল করে দেখল ও। 'তাই বলে আমাকে তুমি ভয় পেয়ো না,' বলে হেসে উঠল। 'হিলসাইড মন্দ না, তবে তালা দিয়ে রাখলে আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ব। তখন কী হবে, জানি না। আমি স্বাধীন থেকে মন যা বলে তা-ই করতে চাই।'

হিলসাইড! ভাবল অলিভা। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে

শব্দটা, অথচ অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছে না কোথায় শুনেছে। শব্দটার সঙ্গে নীল রঙের একটা দেয়াল আর সাদা ড্রেস পরা একজন নার্সের কী যেন একটা সম্পর্ক আছে, ওর দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলছে সে।

'আমি পালাব,' হঠাৎ মনের কথাটা বেরিয়ে এল অলিভার মুখ থেকে। 'যত তাড়াতাড়ি পারি, দায়ানের ভালমন্দ কিছু হয়ে যাবার আগেই, পালাতে হবে আমাকে...' টলতে টলতে সিধে হলো, হেঁটে এল অ্যামবুলেন্সের বন্ধ দরজার সামনে, কিন্তু মসৃণ দরজায় ধরবার মত কিছু পেল না।

'ওরা তোমাকে পালাতে দেবে না,' উত্তেজনায় বেসুরো গলায় হেসে উঠল লিয়োনোরা। 'তুমি তো আমার চেয়েও বড় পাগল—এরইমধ্যে মানুষজনকে মেরে ফেলেছ। ওরা তোমাকে পালাতে দেবে না।'

'আমি পাগল নই,' চেঁচিয়ে উঠল অলিভা, মোচড় খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল, দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

'না, তুমি পাগল,' বলল লিয়োনোরা। 'আমি জানি। খুব চালাক তো, তাই বেশিরভাগ লোকের কাছ থেকে ব্যাপারটা তুমি লুকিয়ে রাখতে পার, কিন্তু আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'কিন্তু সত্যি আমি পাগল নই, বিশ্বাস করুন!' বলে গভীর দুঃখে আর অসীম বেদনায় দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অলিভা। 'আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী...আমার নিয়তি! নিয়তি আমার কপালে ভালবাসা দেয়নি। কেউ আমাকে ভালবাসে না, কেউ না! আমি যদি কাউকে ভালবাসি, নিয়তি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় তাকে...'

'যতকিছুই বলো, তুমি পাগলই,' জেদের সুরে বলল লিয়োনোরা। 'এটাও তোমার নিয়তি, কেউ বদলাতে পারবে না।'

'না!' প্রবলবেগে মাথা নাড়ল অলিভা। 'আমি পাগল নই!' মনে মনে ভাবছে, আমি কিছু মনে করতে পারি না কেন? নিজের

পরিচয় কেন জানি না? এগুলোর সঙ্গে কি পাগলামির সম্পর্ক আছে? মাথার ভেতর অদ্ভুত যে আওয়াজটা হয়, সেটাই বা কী!

'আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছ?' জানতে চাইল লিয়োনোরা, ওকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে। 'না, আশা কখনও ছাড়তে নেই। আমি আসলে তোমার মনটা খারাপ করে দিতে চাইনি।'

'আপনি চুপ করুন!' আবার ঘুরে দরজার গায়ে ঘুসি মারতে শুরু করল অলিভা।

'এই, বোকা, শান্ত হও!' বলল লিয়োনোরা। 'অস্থির হয়ে কোনও লাভ নেই। হিলসাইডে না পৌঁছালে এখান থেকে তোমাকে বের করবে না ও। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি পালাতে চাও?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অলিভা। 'পালাতে আমাকে হবেই...'

'সম্ভব, যদি দুজন মিলে চেষ্টা করি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল লিয়োনোরা। 'ওই লোক বুদ্ধিমান, তবে নিজের ওপর বিশ্বাসটা একটু বেশি। প্রথমে তুমি আমার শরীর থেকে এই জ্যাকেটটা খুলে নাও।'

'কী...না!' কুঁকড়ে গেল অলিভা।

'আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?' হেসে উঠল লিয়োনোরা। 'আমরা তো একই জাত। পরস্পরকে আমরা আঘাত করি না।'

শিউরে উঠল অলিভা। 'ওভাবে কথা বোলো না, প্লিজ! আমি পাগল নই। আমাকে পাগল বলাটা নিষ্ঠুরতা।'

'ঠিক আছে, উত্তেজিত হয়ো না,' বলল লিয়োনোরা। 'এখন কী বলি শোনো। যদি পালাতে চাও, আমার এই জ্যাকেট তোমাকে খুলতে হবে। আর জলদি, এখনই! স্যানাটোরিয়াম আর বেশি দূরে নয়। একবার ওটার ভেতরে ঢুকলে, জীবনে আর বেরুতে পারবে না।'

ধীর পায়ে হেঁটে এল অলিভা, ঝুঁকে তাকাল লিয়োনোরার দিকে। 'তোমাকে না হয় মুক্ত করলাম, কিন্তু তারপর আমি

কীভাবে পালাব?' জিজ্ঞেস করল ও, মহিলার উজ্জ্বল চোখে ধূর্ত চাহনি দেখে শিরশির করে উঠল ওর গা।

'জ্যাকেটটা খুলে দিয়ে,' ফিসফিস করল লিয়োনোরা, 'গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি শুরু করবে, আর দমাদম লাথি মারবে দরজায়। কী হচ্ছে দেখার জন্যে দরজা খুলবে ও। খুলতে বাধ্য, কারণ আমার ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব ওকেই দেয়া হয়েছে। তারপর, ও যখন তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি। দুজন মিলে ঠিকই কাবু করে ফেলব ওকে আমরা।'

হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম আর এক মাইল দূরে, এই সময় অ্যামবুলেন্সের ভিতর থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনে চমকে উঠল হ্যাকাবি। শুধু চিৎকার নয়, সেই সঙ্গে দরজায় ধুপধাপ আওয়াজও হচ্ছে।

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গাড়ি থামাল হ্যাকাবি। চায় না অলিভা জখম হোক। ওর ইচ্ছে, ডক্টর প্রেসটনের হাতে অক্ষত রোগিণীকে তুলে দেবে, পুরস্কারের টাকা নিয়ে যাতে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি না হয়।

ক্যাব থেকে নীচে নেমে অন্ধকার পিছন দিকটায় চলে এল হ্যাকাবি। তালা খুলে অ্যামবুলেন্সের দরজা ফাঁক করল, উঁকি মেরে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। ভিতরে আলো খুব কম, তবে অলিভাকে দেখতে পেল—পিছনদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একটানা চেঁচাচ্ছে।

দ্রুত একবার লিয়োনোরার উপর চোখ বুলাল হ্যাকাবি। চাদরের তলা থেকে মুখ বের করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মহিলা, উত্তেজনায় খিকখিক করে হাসছে, তবে দেখে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই মনে হলো।

অ্যামবুলেন্সে উঠল হ্যাকাবি, দরজা একটু টেনে নিল, তবে পুরোপুরি বন্ধ করল না। এগিয়ে এসে অলিভাকে ধরল ও, একটা

হাত মুচড়ে শিরদাঁড়ার কাছে টেনে আনল। 'শান্ত হও, লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল ও। 'এসো, শোও এখানে। তুমি খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।'

দক্ষ হাতের প্যাঁচে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল অলিভা। হঠাৎ তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ধস্তাধস্তি করছে।

কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। হ্যাকাবি ওকে প্রায় অনায়াসেই একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে ফেলল, লিয়োনোরার উল্টোদিকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছিল ওটা।

'ছাড়ুন!' হাঁপাচ্ছে অলিভা। 'যেতে দিন আমাকে!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো,' নরম সুরে বলল হ্যাকাবি। 'তুমি শুয়ে পড়লেই হবে, দেখো কেমন তোমার আরামের ব্যবস্থা করে দিই।'

শক্ত হাতে অলিভার একটা কবজি চেপে ধরল হ্যাকাবি, হঠাৎ ঝুঁকে হাঁটুর পিছনটা ধরে শূন্যে তুলে নিল ওকে, তারপর শুইয়ে দিল স্ট্রেচারে।

ঠিক এই সময় গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসল লিয়োনোরা। দেরিতে হলেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিল হ্যাকাবিকে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল ও।

সেই মুহূর্তে দু'হাত দিয়ে ওর পাঁজরে ধাক্কা মারল লিয়োনোরা। ছিটকে পড়ল হ্যাকাবি, মাথাটা ঠুকে গেল অ্যামবুলেন্সের দেয়ালে। ওকে পাশ কাটিয়ে আধ খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিল মহিলা, চোখের পলকে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

চোখ-মুখ কুঁচকে মাথার ব্যথাটা সহ্য করছে হ্যাকাবি, টলতে টলতে সিধে হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। রাস্তায় কোনও যানবাহন নেই, অ্যামবুলেন্সের পিছনে গভীর অন্ধকার। কয়েক সেকেন্ড বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল ও, ভাবছে মহিলা গেছে যাক, অলিভাকে পালাতে দেয়া যাবে না...

বন করে ঘুরল হ্যাকাবি, দেখল অ্যামবুলেন্স থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামছে অলিভা। তবে নাগালের মধ্যেই, খপ করে ওর লাল চুল ধরে ফেলল ও।

কাছেই, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিয়োনোরা। নিঃশব্দে হাসছে, পা টিপে টিপে এগিয়ে এল। ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে ভারী একটা পাথর। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে হ্যাকাবির মাথার পিছনে মারল ওটা দিয়ে।

দুপুর। ফেয়ারফিল্ড প্ল্যানটেশনের বড়সড় তিনতলা কাঠের বাড়িটা কেমন যেন ঝিম মেরে আছে।

টেরেসে বসে রয়েছে লেফটেন্যান্ট শন মিচেল, হ্যাটটা ঝুলে পড়েছে মাথার পিছনদিকে, ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলছে। প্রাণের উপর ঝুঁকি নিয়ে ক্রিমিনালদের পিছনে ছুটোছুটি করবার চেয়ে ফিনলে প্ল্যানটেশনে ডিউটি দেওয়া কোটিগুণ ভাল, ভাবল ও। হোস্টেস ভদ্রমহিলা, মিসেস টিসা ফিনলে যেমন সুন্দরী, তেমনি সদয়—ওদের খাওয়াদাওয়া আর যত্ন-আত্তির কোনও ত্রুটি রাখছেন না।

মজাটা হলো, এখানে ওদেরকে কোনও কাজ করতে হচ্ছে না। রাইফেল হাতে বসে থাকো, কফি খাও, সিগারেট খাও।

ওদেরকে এই ডিউটিতে পাঠানোর সময় শেরিফ কুপার বলে দিয়েছেন, টোবি ব্রাদাররা এখানে হামলা করতে পারে, করলে সেটাকে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু টোবিদের আসলে কোনও অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে না মিচেল।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা হাই তুলল ও। আরামে ঘুম চলে আসছে চোখে।

রোদে বসে সময়টা এভাবে উপভোগ করতে পারত না মিচেল, যদি জানত মাত্র দুশো গজ দূর থেকে ওকে দেখছে টোবিরা।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে লম্বা ঘাসের ভিতর শুয়ে আছে বাডি আর ফ্রিম্যান, চোখে বিনকিউলার। বাড়িটার কোথায় কী হচ্ছে সব খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ওরা।

'আমার ধারণা, এখানেই আছে ও,' বলল বাডি, ঠোঁট প্রায় নড়লই না। 'তা না হলে গার্ড কেন?'

'এরপর কী করতে চাও তুমি?' জানতে চাইল ফ্রিম্যান। রোদে পুড়ে যাচ্ছে ওর পিঠ, গলাও খুব শুকিয়ে গেছে।

'কিছুই না, আপাতত শুধু নজর রাখি,' বলল বাডি। 'জানতে হবে সব মিলিয়ে কজন গার্ড।'

তেইশ

বড়সড় বাড়ির ভিতরটা ঠাণ্ডা আর নীরব। দোতলার সিটিং রুমে একা বসে রয়েছে রানা, হাতে হাইবল।

একটু পরেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল টিসা, সিটিং রুমে রানাকে বসে থাকতে দেখে হাসিমুখে ভিতরে ঢুকল। 'কখন এলে? সব খবর ভাল?'

'এই তো,' বলে মাথা নাড়ল রানা। 'দেখতে এলাম দায়ান কেমন আছে। নার্স কার্লা বলল, রাতটা বেঘোরে ঘুমিয়েছে। তার মানে কি খবর ভাল?'

'হ্যাঁ, অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা ভাল,' বলল টিসা।

'অলিভার কোনও খোঁজ নেই?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার মাথা নাড়ল রানা। 'টোবিরাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'লেফটেন্যান্ট শন মিচেল বিশ্বাসই করে না টোবি ব্রাদার্স বলে কেউ আছে,' বলল টিসা, রানার সামনের একটা সোফায় বসল।

'আরেকটা কাজে এসেছি,' বলল রানা।

'বলো,' ওর দিকে তাকিয়ে আছে টিসা।

'তোমাদের একটা রাইফেলটা নিয়ে জিপে রাখব, কখন কী কাজে লাগে। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না, কীসের আপত্তি।'

হঠাৎ রানার পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সেটটা বের করল ও। 'হ্যালো...হ্যাঁ...বলুন...' প্রায় এক মিনিট কোনও কথা না বলে শুনে গেল, তারপর বলল, '...ধন্যবাদ, মিস্টার কুপার।'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল টিসা, চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। 'অলিভার কোনও খবর?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আরেক পাগল মহিলা পালিয়েছে,' তিক্ত সুরে বলল ও। 'কাল রাতে ফ্রেযনো থেকে হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে আসা হচ্ছিল ওকে, কীভাবে যেন নিজেকে মুক্ত করে অ্যাটেনডেন্টকে মেরে ফেলেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অ্যাটেনডেন্টের মুঠোয় ক'গাছি লাল চুল পাওয়া গেছে।'

'ওহ্, গড!' আঁৎকে উঠল টিসা। 'ওখানে, ওই অ্যামবুলেন্সে অলিভা কোত্থেকে আসবে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলে সোফা ছাড়ল রানা।

'কী খবর পাও ফোন করে জানাবে আমাকে।' টিসাও দাঁড়াল।

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমি চলে গেলে

দায়ান একা হয়ে যায়...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, বেরিয়ে এল টেরেসে, পিছু নিয়ে টিসাও। 'ডিউটিটা বেশ আরামের, তাই না?' মিচেলকে জিজ্ঞেস করল ও।

এক চোখ খুলে তাকাল মিচেল, মাথা ঝাঁকাল। 'জী, স্যর।' তারপর আরেক চোখ খুলে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে বসল। 'প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব সুন্দর।'

'হ্যাঁ, সুন্দর, তবে ওখানে বিষাক্ত সাপও লুকিয়ে আছে,' বলল রানা। 'কাজেই সাবধান, তুমি যেন ঘুমিয়ে পোড়ো না।'

'জী-না, স্যর, ঘুমাব না,' তাড়াতাড়ি বলল সে।

'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো, এখানে ওরা আসবে?' রানা জিপে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করল টিসা।

'না, তবু আমাদের সাবধান থাকা উচিত,' জবাব দিল রানা। 'ওরা বোধহয় এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। আসি, টিসা। রাতে দেখা হতে পারে।'

রানাকে চলে যেতে দেখল টোবিরা।

'মালটা ভাল,' বলল ফ্রিম্যান, চোখে বিনকিউলার, টেরেস থেকে বাড়ির ভিতর ফিরে যেতে দেখছে টিসাকে। 'ফেদেরা একা মজা লুঠবে, এটা আমার ভাল লাগছে না।'

বাড়িটা কাদের, তাদের পরিচয়, প্ল্যানটেশনটা কত দূরে, বাড়ির কর্তার অনুপস্থিতি—ইতিমধ্যে সব খবরই জেনে নিয়েছে ওরা।

লেমোনেডের একটা বোতল বের করে ছিপি খুলল বাডি। ওটা থেকে সরাসরি কয়েক ঢোক গিলল। 'মনটাকে ওদিক থেকে সরিয়ে আনো,' বলল ও, বোতলটা ধরিয়ে দিল ফ্রিম্যানের হাতে। 'কাজের সময় মেয়েমানুষ নিয়ে ভেবো না।'

'কিছু একটা তো ভাবতে হবে,' বলল ফ্রিম্যান। খানিক পরে জানতে চাইল, 'তুমি ওই লোকটাকে খুন করবেই করবে?'

'সে যদি এখানে থাকে, অবশ্যই তাকে মারব আমরা,' শান্ত সুরে বলল বাডি। 'এছাড়া উপায় নেই। মানে, যদি আমরা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে না চাই আরকী।'

'হুম।'

'হুম নয়, প্রস্তুতি হিসেবে আরও কিছু কাজ সেরে রাখতে হবে,' বলল বাডি। 'বার্টনকে ফোন করো, বলো: এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে হঠাৎ বিশ-পঁচিশজন লোক দরকার হতে পারে আমাদের, অস্ত্রসহ। সে যেন অ্যালার্ট থাকে।'

'এত লোক দিয়ে কী হবে?' ফ্রিম্যান অবাক।

'ফিনলেদের প্ল্যানটেশনে দুশো লেবার আছে, ভুলে গেলে?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল বাডি। 'ও, আরেকটা কথা,' বলে চুপ করে গেল ও।

'শুনছি,' একটু পর বলল ফ্রিম্যান।

কী যেন চিন্তা করছে বাডি। তারপর বলল, 'যেরকম ব্যস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ফেদেরা, জরুরি কোনও খবর পেয়ে বোধহয় পুলিশ স্টেশনে গেল ও। বার্টনকে বলো, খুব ভাল হয় তার লোকজন যদি ফেদেরার মোবাইল ফোনটা ছিনতাই করতে পারে।'

'ঠিক আছে,' বলল ফ্রিম্যান।

'মিসেস ফিনলের কাছেও মোবাইল আছে,' বলল বাডি। 'আর বাড়িতে আছে ল্যান্ডফোন। ও দুটোর ব্যবস্থা আমি করব।'

ফ্রিম্যানের মুখটা দুমড়েমুচড়ে গেল। 'এই কেসটার পর এ-সব আমরা ছেড়ে দিলেই পারি,' নিচু গলায় বলল ও। 'বহু বছর হয়ে গেল ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছি আমরা। প্রচুর কামিয়েছি। এখনই ছাড়ার সময়।'

আপনমনে হাসল বাডি। 'এখনও সময় হয়নি,' বলল ও।

'আসলে আমার সময় বোধহয় হয়ে গেছে,' বলল ফ্রিম্যান।

দীর্ঘ বিরতি শেষই হতে চাইছে না। 'আইডিয়াটা আমার

মাথাতেও এসেছিল, ব্যাপারটা গুছিয়েও এনেছি বেশ কিছুটা,' অবশেষে নরম সুরে বলল বাডি। 'শুরুটা যেহেতু আমাকে দিয়ে হয়েছে, শেষটাও তা-ই হতে হবে। কিন্তু শেষ হবার সময় এখনও হয়নি।'

ফ্রিম্যান আর কিছু বলল না। তবে ওর চোখ-মুখ কুঁচকে আছে। লেফটেন্যান্ট মিচেলকে দেখছে ও, টেরেসের চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছে।

বিকেল চারটে। ট্র্যাকিং পয়েন্ট পুলিশ স্টেশন।

খুনি পাগলী আর অলিভার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠানো হলেও, কোথাও ওদেরকে পাওয়া যায়নি। নিজেও একবার বেরিয়েছিলেন শেরিফ, কোনও লাভ হয়নি, ক্লান্ত শরীরে এইমাত্র ফিরে এসে অফিসে ঢুকছেন।

ওঁর পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল।

মর্গে গিয়ে অ্যাটেনডেন্ট কাম ড্রাইভারের মুঠোটা পরীক্ষা করেছে ওরা। রানার ধারণা, ওই লাল চুল অবশ্যই অলিভার।

চেয়ারে বসতে যাবেন শেরিফ, ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি। 'ট্র্যাকিং পয়েন্ট পুলিশ স্টেশন, শেরিফ বলছি।'

বসতে যাচ্ছিলেন, অপরপ্রান্তের কথা শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওঁর। 'হোয়াট! কোথায়?...রাউন্ডভেল সাউথ স্ট্রিট, ইমপালস্ বার...ঠিক আছে, এবার শুনুন। ও কিন্তু বিপজ্জনক মেয়েলোক; কোনভাবেই ওকে ঘাঁটাবেন না। যা বলে শুনুন, যা চায় দিন, তবে কাছাকাছি যাবার সময় সাবধান...হ্যাঁ, এখনই আসছি আমরা...'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে দ্রুত আবার ডায়াল করছেন তিনি, মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাগল মহিলাকে একটা বারে পাওয়া গেছে।' সংযোগ পেতে রিসিভারে বললেন,

'হিলসাইড স্যানাটোরিয়াম? আমি শেরিফ বলছি। একটা ঠিকানা দিচ্ছি, লিখে নিন। আপনাদের দ্বিতীয় রোগিণী মিস কিথ লিয়োনোরাকে পাওয়া গেছে ওখানে। এখনই একজন ডাক্তার আর অন্তত দু-তিনজন অ্যাটেনডেন্টকে পাঠিয়ে দিন ওখানে। ওই খুনি পাগলীকে সামলানো পুলিশের কাজ নয়।'

রানাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন শেরিফ, ক্ষোভের সুরে বলছেন, 'আসলটার খবর নেই, নকলটাকে নিয়ে ছুটোছুটি!'

রাউন্ডভেল সাউথ স্ট্রিট, ইমপালস্ বার।

ভিতরটা প্রায় খালি, জানালার ধারের একটা টেবিলে বসে রাম ভর্তি গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে লিয়োনোরা, পরনে খাকি শর্টস আর সাদা টি-শার্ট। নির্জলা রাম সব সময় খুব পছন্দ ওর, হ্যাকাবির লাশ সার্চ করে বেশ কিছু টাকাও পেয়েছে, গলা ভেজাবার নেশাটা দমন করতে পারেনি।

কাপড়চোপড়ে শুকনো রক্ত লেগে থাকলেও, হাসি হাসি মুখ করে ম্যানেজার ও বার-ওয়েটারদেরকে কীভাবে কী হলো, সে-গল্প শোনাচ্ছে লিয়োনোরা। সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চেহারা। হাতের রক্তমাখা পাথরটা দেখাল ওদেরকে, বলল, 'এটা দিয়েই তো ড্রাইভারের মাথাটাকে ছাতু বানিয়েছি।'

'কেন?' নরম সুরে জানতে চাইল বারের ম্যানেজার, লিয়োনোরার টেবিল থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। 'কী করেছিল সে?'

হি-হি-হি করে হাসল লিয়োনোরা। তারপর বলল, 'কাল রাতে রাউন্ডভেল থেকে কয়েক মাইল দূরে ড্রাইভার লিফট দেয় ওকে, বুঝলেন?'

'লিফট দেয়? কাকে লিফট দেয়?'

'কাকে আবার, সবাই যাকে খুঁজছে,' বলল মহিলা।

'অলিভাকে। মেয়েটা আমাকে বলল: দায়ানকে ভালবাসে, তা-ই পালাতেই হবে। ওকে পালাতে সাহায্য করার জন্যেই তো বেচারা ড্রাইভারকে খুন করতে হলো আমার।'

চোখ মিটমিট করল ম্যানেজার। 'নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে না?' ঠোঁটের কোণ দিয়ে পাশে দাঁড়ানো হেড ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করল।

'অলিভার চেহারার যে বর্ণনা দিল, একদম নিখুঁত,' নিচু গলায় বলল হেড ওয়েটার। 'টিভিতে আমি ওর ফটো দেখেছি।'

'অলিভার সঙ্গে আপনার ছাড়াছাড়ি হলো কখন?' লিয়োনোরাকে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

আবার হি-হি-হি করে হাসল পাগলী। বলল, 'ড্রাইভারকে খুন করার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখি, ও মা, কেউ কোথাও নেই! ওর জন্যে মানুষ মারলাম, অথচ আমার জন্যে একটু অপেক্ষাও করল না। অন্ধকারে আর আমি খুঁজিওনি।'

'তারমানে অলিভাও স্যানাটোরিয়ামের কাছাকাছি কোথাও আছে!' ফিসফিস করল ম্যানেজার, পুরস্কারের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় একটা ঢোক গিলল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল হেড ওয়েটার।

উপস্থিত সবাইকে ওর উপর খেয়াল রাখতে বলে বার থেকে বেরিয়ে গেল ম্যানেজার, শেরিফকে ফোন করবে।

ম্যানেজারকে বার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে সবজান্তার মত মাথা ঝাঁকাল লিয়োনোরা। 'আমি জানি, পুলিশকে খবর দেয়া হচ্ছে। পুলিশ নয়, প্রথমে হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামে খবর দাও তোমরা। ওখানকার ডাক্তারদের একটা সুযোগ দিয়ে দেখতে চাই আমি—ওরা আমাকে ভাল করতে পারে কি না...'

কেউ কিছু বলছে না।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়োনোরা। হাতের পাথরটা টেবিলে রাখল। 'খবরদার!' ধীরে ধীরে সবার দিকে

তাকিয়ে চোখ রাঙাল ও। 'ভুলেও আমার অস্ত্রটা কেউ ধরবে না, ফিরে এসে ঠিক যেন এখানেই পাই এটা।' তারপর জানতে চাইল, 'টয়লেটটা কোনদিকে?'

হাত তুলে করিডরে বেরুনোর দরজাটা দেখিয়ে দিল হেড ওয়েটার। 'ওদিকে। শেষ মাথায়।'

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে বার থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল লিয়োনোরা। ওখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই, কাজেই কেউ ওর পিছু নিল না।

বারের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ম্যানেজার। প্রথমে একটা পুলিশ ভ্যানকে আসতে দেখল ও, রাস্তার ওপারে থামল সেটা, ঝপাঝপ নীচে নামছে বিশ-বাইশজন সশস্ত্র কনেস্টবল। ওটার পিছু নিয়ে এল শেরিফ আর সাংবাদিকদের কয়েকটা গাড়ি।

এক মিনিট পরেই হাজির হলো হিলসাইড স্যানাটোরিয়ামের অ্যামবুলেন্স, একজন ডাক্তার আর সাদা কোট পরা দুজন অ্যাটেনডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে।

শেরিফের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা সেরে নিলেন ডাক্তার। কাছে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনডেন্টরাও শুনল। পুলিশ এমনভাবে পজিশন নেবে, বার থেকে বেরুলেই যাতে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা যায় লিয়োনোরাকে। তবে ওকে তারা ধরবে না। মহিলা যেহেতু হিলসাইডের পেশেন্ট, ওর দায়িত্ব অ্যাটেনডেন্ট আর ডাক্তারই নেবেন।

বার থেকে বের করে এনে সরাসরি অ্যামবুলেন্সে তোলা হবে লিয়োনোরাকে। না, সাংবাদিকরা ছবি তুলতে পারেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে বার থেকে খবর এল, লিয়োনোরা বাথরুমে ঢোকার পর বারো মিনিট পার হয়ে গেছে, এখনও বেরুচ্ছে না।

আরও পাঁচ-সাত মিনিট পর ডাকাডাকি শুরু করল হেড

ওয়েটার, কিন্তু বাথরুমের ভিতর থেকে সাড়া দিচ্ছে না লিয়োনোরা।

উদ্বেগ বাড়তে লাগল। অনেকেই ধারণা করল আত্মহত্যা করেছে মহিলা।

রিপোর্ট পেয়ে বারে ঢুকল পুলিশ, সঙ্গে বাকি সবাই। শেরিফের নির্দেশে বাথরুমের দরজা ভাঙা হচ্ছে।

দরজাটা তখনও পুরোপুরি ভাঙা হয়নি, তার আগেই খবর পাওয়া গেল, বাথরুমের জানালা খুলে পালিয়েছে অলিভা।

বেশি কিছু করতে হয়নি ওকে, কয়েকটা স্ক্রু খুলে ফ্রেমসহ কাঁচের কবাটটা একপাশে নামিয়ে রেখেছে, তারপর নিচু গোবরাটে চড়ে লাফ দিয়ে পড়েছে পাশের বাড়ির বাগানে। ওখান থেকে পাঁচিল টপকে একটা গলি হয়ে মেইন রোডে পৌঁছাতে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি ওর।

ক্লান্ত ও হতাশ হলেও, অলিভা কাছাকাছি কোথাও আছে বুঝতে পেরে নতুন শক্তি অনুভব করলেন শেরিফ। ওঁর মোবাইলে কোথাও থেকে একটা কল আসতে সেই শক্তি যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

'সন্ধে হতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি,' বললেন তিনি। 'আশপাশের থানা থেকে আরও পুলিশ আনিয়ে গোটা এলাকায় নিশ্ছিদ্র জাল ফেলার ব্যবস্থা করো, লেস্টার। এবার যেন মেয়েটা ধরা পড়ে...আমাদের ভাবমূর্তি বলে কিছু আর থাকছে না।'

মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি শেরিফ জন লেস্টার।

'আমি দেখি এক-আধটা কপ্টার যোগাড় করতে পারি কি না,' আবার বললেন শেরিফ, সবার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন মোবাইল ফোনে কথা বলছেন।

চব্বিশ

ফেয়ারফিল্ড প্ল্যানটেশন।

শুধু পিছনদিকটা বাদে ফিনলেদের বাগানবাড়ি প্রায় ঘিরে ফেলেছে টোবি ব্রাদার্স ও তাদের লোকজন। সংখ্যায় এখন ওরা বিশজনের কম নয়; সবাই সশস্ত্র, রাইফেল ছাড়াও পিস্তল, ছুরি, এমনকী গ্রেনেডও আছে সঙ্গে।

তিনতলা বাড়িটার পিছনদিকে গভীর জঙ্গল আর লেক; শুধু ডাঙায় নয়, জলেও সাপের খুব উপদ্রব। বাধ্য না হলে ওদিকটায় ওরা কেউ যাবে না।

'প্ল্যানটা হলো,' সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে ব্রিফ করবার সময় বলল বাডি, 'খাটনির কাজটা ফেদেরা করুক, আমরা তার সুফল ভোগ করব।'

'সেটা কীরকম?' জানতে চাইল মাইকেল টেরেল, নতুন আসা লোকগুলোর লিডার।

'অলিভাকে যদি খুঁজে বের করতে পারে ফেদেরা, ওকে নিয়ে নির্ঘাত এখানে একবার আসবে সে,' ব্যাখ্যা করল বাডি। 'কেন? এইজন্যে যে, এখানে দায়ান আছে। এতদিনে সবাই জানে, দায়ানকে অসম্ভব ভালবাসে পাগলীটা।'

'দায়ান এখানে সত্যি আছে?' জিজ্ঞেস করল টেরেলের সহকারী ম্যাথিউ।

'সত্যি আছে কি না জানি না,' নরম সুরে বলল বাডি। 'তবে তিনতলার জানালায় সাদা হেডড্রেস পরা এক মেয়ের মাথা দেখেছি আমি। একবারই দেখেছি, তবে তা-ই যথেষ্ট। দৃষ্টি যদি বেঈমানী না করে থাকে, ওই মাথাটা কোনও প্রাইভেট নার্সের।'

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফ্রিম্যানের, ভাবল—না, বুদ্ধি

আছে বাড়ির। 'একটা বাড়িতে নার্স কখন থাকে? যখন সেখানে কোনও পেশেন্ট থাকে, তাই না?'

রাত সাড়ে আটটা।

গোটা রাউন্ডভেল আর আশপাশের এলাকার প্রতিটি ইঞ্চিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে, দুই পাগলীর কারও ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি। ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আজ রাতের মত জাল গুটিয়ে নিচ্ছে পুলিশ। তবে রুটিন টহল আজও চলবে।

নাওয়া-খাওয়া ভুলে সেই দুপুর থেকে ছুটোছুটি করছে রানা, অবসন্ন শরীর নিয়ে ফেয়ারফিল্ড প্ল্যানটেশনে ফিরছে, শাওয়ার আর লম্বা একটা ঘুম দরকার।

অর্ধেক পথও পেরোয়নি, ট্রাউজারের পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। সেটটা বের করল ও, এক হাতে ড্রাইভ করছে। 'কী খবর, মিস্টার শেরিফ?' নাম দেখে জানতে চাইল।

'ভাড়া করে একজোড়া হেলিকপ্টার আনিয়েছি, মিস্টার ফেদেরা,' বললেন শেরিফ। 'সার্চলাইটের আলোয় সারারাত তল্লাশি চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা। ভাবলাম আপনিও হয়তো আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইবেন।'

একটু অবাকই লাগছে রানার, ভাবল—এত এনার্জি কোত্থেকে পান ভদ্রলোক? মেশিনও হার মানবে ওঁর কাছে, এতটুকু ক্লান্ত হতে জানেন না। 'ধন্যবাদ, মিস্টার কুপার। তবে না, আমি খুবই ক্লান্ত,' বলল রানা। 'আপনারও খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার, তা না হলে...

রানার কথা শেষ হয়নি, শেরিফ বললেন, '...জ খরচে কপ্টার দুটো আনিয়েছি, বিশ্রাম নিই কী করে বলুন...'

'কী বললেন?' খটকা লাগায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি নিজের খরচে দুটো কপ্টার আনিয়েছেন?'

হকচকিয়ে যাওয়ায় এক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না

শেরিফ। তারপর যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, 'কী? কখন বললাম নিজের খরচে? আপনার শুনতে ভুল হয়েছে, মিস্টার ফেদেরা। দেখা যাচ্ছে সত্যি আপনি খুব ক্লান্ত, কাজেই আপনার বিশ্রাম নেয়াই উচিত।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

রানা বুঝল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়; লোভে হোক বা ভয়ে—শেরিফ সম্ভবত হাত মিলিয়েছে সলিসিটর ব্লেচার আর ডন মারকাসের সঙ্গে। জিপ ঘুরিয়ে নিল ও, ফিরে যাচ্ছে ট্র্যাকিং পয়েন্টে।

এরপর নিজ এজেন্সির মডেস্টো শাখায় ফোন করল রানা।

'জী, বলুন, মাসুদ ভাই,' জানতে চাইল নঈম মাহমুদ।

'শেরিফ কুপার মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে, নিজের পয়সায় দুটো কপ্টার ভাড়া করে অলিভাকে খুঁজছে। ব্যাপারটা এই মুহূর্তে রিপোর্ট করো এফবিআই-কে,' বলল রানা। 'বলো, সন্দেহ করছি ডন মারকাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে লোকটা। শেরিফের আজ রাতের গতিবিধির ওপর নজর রাখা দরকার।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

'সাজেশন দাও: এফবিআই নিজস্ব স্যাটেলাইট থেকে কপ্টার দুটোর ওপর নজর রাখতে পারে। ওগুলো মডেস্টো আর মার্সেড শহরের আশপাশে চক্কর মারবে—রাউন্ডভেল, সিগনাল পয়েন্টস্, ট্র্যাকিং পয়েন্টস্ আর ব্ল্যাক পিলারস্ এলাকায়।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

দু'মিনিট পর আবার একটা ফোন পেল রানা। শেরিফই করেছে।

'মিস্টার ফেদেরা?' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে শেরিফ। 'এইমাত্র খবর পেলাম দুই পাগলীকে এক সঙ্গে দেখা গেছে বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পের কাছাকাছি হাইওয়েতে। হেলিকপ্টার নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা। নিউজটা কাভার করার ইচ্ছে থাকলে আপনিও ওখানে হাজির হতে পারেন।'

জিপটা আবার ঘোরাতে হলো রানাকে। বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্প এখান থেকে খুব একটা কাছে নয়। স্পিড বাড়িয়ে সত্তরে তুলল ও, চেষ্টা করে দেখছে কপ্টারগুলোর আগেই ওখানে পৌঁছানো যায় কি না।

মনটা খুঁতখুঁত করছে রানার। শেরিফ ডেভিড কুপারের মারাত্মক একটা দুর্বলতা ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে, এই অবস্থায় সে যদি বিশেষ কোথাও ওকে ডেকে পাঠায়, মনে সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক।

সতর্ক থাকতে হবে ওকে।

পাঁচ মাইল পেরুল রানা, আরও মাইল পাঁচেক এগোতে হবে, এই সময় মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল একজোড়া কপ্টার। সার্চলাইট জ্বলছে না, তবে হাইওয়েতে জিপটাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেল পাইলটরা। শেরিফ কুপারের অন্তত বোঝার কথা যে এই তোবড়ানো জিপটায় ফেদেরা আছে, কারণ হাইওয়েতে অসংখ্য ট্রাক আর দু'চারটে প্রাইভেট কার ছাড়া অন্যান্য যানবাহন না থাকারই মত।

আরও আট মিনিট পর জিপের স্পিড কমাল রানা। ওর হিসাবে বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছে জিপ। হাইওয়ের ডানদিকে চোখ বুলাচ্ছে, হেডলাইটের আভায় ফাঁকা জায়গাটা দেখলেই চিনতে পারবে।

মিনিটখানেক পর দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে হাইওয়ে থেকে মেঠোপথে নামল রানা, দূরে লগিং ক্যাম্পের কুঁড়েগুলো দেখা যাচ্ছে।

এখানেই আসবার কথা ছিল অলিভার, ভাবল ও। আরও অনেক আগে। কাল রাতের অর্ধেকটা, তারপর আজ সারাটা দিন কোথায় ছিল বা কী করেছে আল্লাহই জানে।

অ্যামবুলেন্স থেকে দুজন দু'দিকে পালিয়েছিল, তারপর আবার

এক হলো কীভাবে তা-ই বা কে বলবে!

একটা কুঁড়ের পিছনে জিপ থামাল রানা, ঠিক যেখানে দায়ানকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেয়েছিল। আলো নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে নামল না—একটা ব্যাগ খুলে নাইটগ্লাস বের করে চোখের সামনে তুলল, অপর হাতে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা টেনে বের করল।

জিপ থেকে নেমে দরজায় তালা দিল। ওখানে দাঁড়িয়েই চোখ বুলাল চারদিকে। হাইওয়ের কোনও আলো এদিকে আসছে না, তবে দ্রুতগতি যানবাহনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

নাইটগ্লাস চোখে থাকায় সবকিছু হালকা সবুজ লাগছে ওর কাছে। জঙ্গল স্থির হয়ে আছে, কোথাও কিছু নড়ছে না। ফাঁকা জায়গাতেও নেই কেউ, অন্তত মানুষের কোনও আকৃতি দেখা যাচ্ছে না।

শেরিফের কথা ভোলেনি রানা, অলিভা আর লিয়োনোরাকে লগিং ক্যাম্পের কাছাকাছি হাইওয়েতে দেখা গেছে, লগিং ক্যাম্পে নয়। কথাটা শুনেই ওর মনে হয়েছে, ক্যাম্পে একবার আসবে অলিভা, দায়ানকে যেখানে শুইয়ে রেখে গিয়েছিল সেই জায়গাটা দেখে যাবে।

এমন হতে পারে এরইমধ্যে জায়গাটা দেখে হাইওয়েতে ফিরে গেছে অলিভা, এই সময় কোনও গাড়ি থেকে ওদের দুজনকে দেখেছে ড্রাইভার, মোবাইল ফোন অন করে রিপোর্ট করেছে শেরিফকে।

ওর তা হলে এখন হাইওয়েতে যাওয়া দরকার। জিপের বনেট খুলে উইনচেস্টার রাইফেলটা বের করছে, মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা কপ্টার, সার্চলাইটের আলো একটুর জন্য ওর জিপের নাগাল পেল না। তবে হাইওয়ের দিকে নয়, গভীর বনভূমির দিকে ছুটছে ওটা।

ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা, দৃষ্টিপথের শেষ

প্রান্তে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নীচে তাকাল ও। অনেকটা দূরে, গাছপালার ফাঁকে, কিছু একটা নড়ছে। সবই হালকা সবুজ, তবে সচল জিনিসটা তারই মধ্যে একটু যেন গাঢ়।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একজন মানুষের আকৃতি, চারপেয়ে কোনও জন্তুর নয়।

কুঁড়েগুলোকে পিছনে ফেলে সাবধানে এগোল রানা, রাইফেলটা কাঁধে ঝুলছে।

শুরু হলো শিকার আর শিকারির খেলা।

ডন মারকাসের ভাড়া করা স্নাইপার ব্রুনো হপার জানে না ওর পিছনে ফেউ লেগেছে।

এক নম্বর কপ্টারে বসা শেরিফ কুপারের সঙ্গে টু-ওয়ে একটা রেডিওর সাহায্যে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে হপার। শেরিফ এই মাত্র ওকে জানিয়েছে, সামনের পাহাড়ের ঢালে পাগলীদের একজনকে পাওয়া গেছে—অলিভাকে। 'ওকে মারাটাই আমাদের কাজ,' বলল ও, পাইলট মারকাসের লোক হওয়ায় কোনও রকম রাখ-ঢাক না করেই কথা বলতে পারছে। 'কাজেই সময় নষ্ট না করে সেরে ফেলো।'

'কীভাবে বুঝলেন ও-ই অলিভা?' জিজ্ঞেস করল হপার। 'জঙ্গলের মাথা থেকে নীচে সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে?'

'সব হয়তো দেখতে পাচ্ছি না, তবে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তা-ই যথেষ্ট। গাঢ় রঙের একটা ড্রেস পরে আছে মেয়েটা,' বলল শেরিফ। 'দেখে মনে হচ্ছে উলের তৈরি। স্যানাটোরিয়াম থেকে পালাবার সময় অলিভার গায়ে এটাই ছিল।'

অলিভার গায়ে ওটা ছিল ঠিকই, কিন্তু লিয়োনোরা প্রস্তাব দেওয়ায় তার সঙ্গে নিজের কাপড়চোপড় বদলে নিয়েছে অলিভা।

লিয়োনোরার যুক্তি: আমি মানুষ খুন করেছি, কাজেই পুলিশ আমাকে দেখামাত্র গুলি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু অলিভা আমার মত বিপজ্জনক নয়, কাজেই তাকে ওরা দেখামাত্র গুলি করবে না।

অলিভা যদি আমাকে ফেলে পালাতে পারে, আমি কেন তাকে পুলিশের টার্গেট করতে পারব না?

'ওর পায়ে উঁচু হিল লাগানো জুতোও দেখতে পাচ্ছি,' শেরিফের পাশের সিট থেকে বলল গিলবার্ট। 'দৌড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর।'

'আর দ্বিতীয় পাগলী কী পরে আছে?' জিজ্ঞেস করল হপার।

'খাকি শর্টস আর টি-শার্ট,' বলল শেরিফ। 'কিন্তু তাকে আমরা আশপাশে কোথাও দেখছি না।'

'ঠিক আছে,' বলল হপার। 'এবার বলুন, কোন্ দিকে যাচ্ছে মেয়েটা?'

'তুমি রয়েছ পুবে, আমরা রয়েছি পশ্চিমে,' বলল শেরিফ। 'আমাদের ডানে পাহাড়, বাঁয়েও তা-ই, তবে একটু দূরে। অলিভা আমাদের নীচে রয়েছে, একটা প্রকাণ্ড রেডউড গাছের আড়ালে। এমনভাবে লুকিয়ে আছে, আমাদের বুলেট ওর ধারেকাছেও যাচ্ছে না। জোরে দৌড়ালে মিনিট দুয়েকের মধ্যে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে ওকে তুমি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

মানুষের আকৃতিটাকে রানা এখন নাইটগ্লাস ছাড়াই দেখতে পাচ্ছে, ব্রুনো হপারকে দেখে চিনতেও কোনও অসুবিধে হলো না।

এক নম্বর কপ্টার এখন সরাসরি হপারের মাথার উপর, জমিন থেকে দেড় কি দুশ' ফুট উঁচুতে স্থির হয়ে আছে; সার্চলাইটের

আলোটা তাক করা হয়েছে হুপারের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ সামনে, আকাশছোঁয়া কয়েকটা রেডউড গাছের গোড়ায়।

রানা এখনও গাঢ় অন্ধকারে, হুপারের দেখাদেখি এইমাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘন একটা ঝোপের পাশে। সার্চলাইটের আলোর আভা ওর নাগাল পায়নি, তবে হুপারকে আলোকিত করে রেখেছে: স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা হাতের রাইফেল কাঁধে তুলছে স্নাইপার।

ঠিক এই সময় রেডউড গাছগুলোর আড়াল থেকে একটু বেরিয়ে এল হুপারের টার্গেট, হাসিমুখে কী যেন বলতে চেষ্টা করছে ওকে, কিন্তু রোটরের আওয়াজে তার একটা শব্দও ওদের কারও কানে ঢুকছে না।

ঝোপ-ঝাড়ের বাধা থাকায় হুপারের টার্গেটকে রানা দেখতে পাচ্ছে না।

'আরে, বোকারা, তোমরা আমাকে কেন মারতে চাইছ, আমি তো লিয়োনোরা নই—আমি অলিভা!' চিৎকার করে বলছে লিয়োনোরা। 'খুঁজে দেখো, আশপাশেই কোথাও আছে সে... সে-ই তো তোমাদের টার্গেট...'

হুপারকে লক্ষ্যস্থির করতে দেখে পিছন থেকে রানাও রাইফেল তুলে ওর খুলিটাকে টার্গেট করল।

এই সময় হঠাৎ পাশের ঝোপটা নড়ে ওঠায় রানার মনোযোগ ছুটে গেল। ডালপালা সরানোর খসখস আওয়াজ হচ্ছে। রাইফেল নামিয়ে সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই অন্ধকারের ভিতর আরও কালো, আরও গাঢ় কী যেন একটা দেখতে পেল ও। শির শির করে উঠল ওর গা।

ঝোপের ভিতর থেকে পিছু হটে বেরিয়ে আসছে কী যেন। তারপর আভাস পাওয়া গেল, মানুষের আকৃতি। একটা নারীমূর্তি!

ওদিকে গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লিয়োনোরা, মাথার উপর হাত তুলে সারাক্ষণ বকবক করছে: 'আমি

লিয়োনোরা নই, অলিভা! তোমরা লিয়োনোরাকে মারতে এসেছ, আশপাশেই কোথাও আছে সে...

ইঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজকে চাপা দিয়ে গর্জে উঠল একে-ফোরটিসেভেন। শুনতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক, যদিও দেখতে পাচ্ছে না কাকে গুলি করা হয়েছে।

এক গুলিতেই লিয়োনোরার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে হপার।

কপ্টারকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে আনছে পাইলট, ফলে সার্চলাইটের আলোটা এলোমেলো ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ছুটল কয়েক সেকেন্ড।

একবার রানার গায়েও পড়ল সেই আলো। মাত্র এক হাত দূরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও প্রথমে চিনতে পারল না অলিভা, ভয়ে আঁৎকে উঠল ও, গলা চিরে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'এই মেয়ে, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?' বলল রানা, ওর পরনে শর্টস দেখে বিস্মিত। 'আমি ফেদেরা, সাংবাদিক। ভুলে গেলে ডাক্তার মিলটনের বাড়ি থেকে তোমাকে আমি পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম?'

চিৎকার থামিয়ে ওর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল অলিভা।

'তারও আগে, মনে নেই,' আবার বলল রানা, 'দায়ান আর তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দিই রানশ্ থেকে?'

এতক্ষণে, আলোটা সরে যাওয়ার পর, রানাকে চিনতে পারছে অলিভা। কাছে সরে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরল ও। 'দায়ান!' তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'আমার দায়ানকে কি মেরে ফেলেছে ওরা?'

'না, কে বলল!' জবাব দিল রানা। 'দায়ান আমার কাছে আছে। চলো...'

সার্চলাইটের আলো এবার স্থির হলো লিয়োনোরার লাশের উপর। মুখটা দেখতে পেয়ে চমকে উঠল শেরিফ, বলল, 'আরে, ও তো অলিভা নয়! সর্বনাশ, তার মানে দুই পাগলী ড্রেস বদল করেছে!'

কথাটা এক কানে ফিট করা রেডিওর খুদে রিসিভার থেকে শুনতে পেল হপার, সেই সঙ্গে শুনতে পেল অলিভার আর্তচিৎকারও। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, হাতের রাইফেল কাঁধে তুলতে যাচ্ছে—চিৎকারের উৎসকে দেখামাত্র নিজের ভুলটা সংশোধন করে নেবে।

শেরিফের নির্দেশে কপ্টারের সার্চলাইট আবার ঘুরে গেল, আলোটা এবার ফোকাস করা হলো রানা আর অলিভার উপর।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে রানা আর অলিভাকে পঞ্চাশ গজ দূরে দেখতে পাচ্ছে হপার। ওর জন্য এটা সামান্য দূরত্ব, পর পর দুটো গুলি করে এখনই ফেলে দিতে পারে দুজনকে। কিন্তু মাঝখানে কিছু ঝোপ আর গাছপালা থাকায় কাজটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে।

সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে হপার। প্রথমে অলিভাকে মারবে।

'হপার,' খুদে রিসিভার থেকে শেরিফের নির্দেশ ভেসে এল। 'ফেদেরাকে ফেলে দাও, কারণ ওই ব্যাটা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারে। অলিভাকে পরে মারো, তার তো আর পালাবার কোনও উপায় নেই।'

নতুন করে লক্ষ্যস্থির করছে হপার, এবার ওর টার্গেট সাংবাদিক ফেদেরা ওরফে রানা। হঠাৎ চমকে উঠল ও—এ কি, সাংবাদিকের হাতে রাইফেল কেন!

দুটো রাইফেল গর্জে উঠল একই সঙ্গে।

একটা ঝাঁকি খেল রানা, হপারের বুলেট গাছের পাতায় লেগে কিছুটা দিকভ্রান্ত, বুকে না লেগে ওর ট্রাউজারের পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রানা টার্গেট করেছিল কপ্টারের সার্চলাইটকে, কারণ জানে আলো নিভে গেলে হপার গুলি করতে পারবে না।

কিন্তু হপারের মত সে-ও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে, গুলিটা কপ্টারের সার্চলাইটে লাগল না। তা না লাগলেও, রোটরের একটা ব্লেড ভেঙে দিয়েছে ওই বুলেট।

পেটে শেরিফ আর গিলবার্টকে নিয়ে বনভূমির মাথার উপর প্রথমে অলসভঙ্গিতে মাতলামি শুরু করল যান্ত্রিক ফড়িংটা, তারপর চরকির মত উন্মত্তবেগে পাক খেতে খেতে নেমে এল জমিনে—তবে তির্যক একটা পথ ধরে, যেন ওটার নিজস্ব ইচ্ছে শক্তি আছে, ধাওয়া করছে ব্রুনো হপারকে।

বিকট শব্দে ঝোপ-ঝাড় আর জমিনের উপর বিধ্বস্ত হলো কপ্টারটা। হপারের কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি, ধাওয়া করে ওর পিঠের উপরই আছড়ে পড়েছে ওটা। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো কমলা রঙের শিখা।

দ্বিতীয় কপ্টার আর পানিভর্তি ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ি চলে আসার আগেই অলিভাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে রানাকে। দ্রুত জিপের কাছে ফিরে এল ও, শক্ত হাতে কবজি ধরে আছে মেয়েটার। এই মুহূর্তে রানার মানসপটে বারবার ভেসে উঠছে প্রিয় বন্ধু লিয়ন কারমেনের মুখটা। বোনকে ওর জিম্মায় রেখে মারা গেছে ওর বন্ধু।

হাইওয়েতে না উঠে একটা সাইড রোড ধরল রানা, বেশ খানিকটা ঘুর পথ ধরে ফেয়ারফিল্ড প্ল্যানটেশনে ফিরছে।

জানে না ওখানে ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।

পঁচিশ

‘মেয়েটা সত্যি খুব ভালবাসে ওকে,’ বড়সড় লাউঞ্জে ঢুকে বলল টিসা, দেখল অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে রানা। ‘মাত্র এক মিনিটের জন্যে দায়ানকে দেখল। দায়ান ঘুমাচ্ছে, কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই অলিভার মুখটা কী এক আশ্চর্য আলোয় ভরে উঠল। তুমি যদি দেখতে কী রকম আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে...’

‘ভাল আছে তো?’

‘একটু শুধু বিশ্রাম দরকার, ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে,’ আশ্বস্ত করল টিসা।

‘কী করছে?’

‘শাওয়ার নিচ্ছে,’ বলল টিসা। ‘কিছু খাইয়ে ওকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব। তুমি চাও ডাক্তার এসে একবার দেখে যান?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ওকে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখছি, কাজেই এখন ওষুধ খাওয়ানো ঠিক হবে না। ডাক্তার দেখাবার কথা পরে ভাবা যাবে।’

‘বেশ। টোবিদের কোনও খবর পেয়েছ?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘যাই, মিচেলের সঙ্গে একটু কথা বলি।’

টোবি ব্রাদাররা ওদের লুকানোর জায়গা থেকে দেখল টেরেসে বেরিয়ে এল রানা, মিচেলের পাশের খালি চেয়ারটায় বসল।

ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে বাড়ি, দায়ান এখানেই আছে। এমনকী কোন্ ঘরে রাখা হয়েছে তা-ও জানে। সাদা ইউনিফর্ম পরা নার্সটাকে তিনতলার জানালার সামনে মুহূর্তের জন্য আবার একবার দেখেছে ও।

কিন্তু এত লোককে নিয়ে কড়া পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও, ওরা কেউ রানাকে ফিরতে দেখেনি। মিচেলসহ তিন পুলিশ আর

প্ল্যানটেশনের দুজন প্রহরীও জানে না বাড়িতে অলিভাকে আনা হয়েছে।

সবার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাড়ির পিছনের জলপথ ধরে এসেছে রানা। অলিভাকে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকায় তুলে নিজেই বৈঠা চালিয়েছে ও। বাড়ির খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে ডাঙায় নামিয়েছে অলিভাকে, তারপর ডুবিয়ে দিয়েছে ডিঙ্গিটাকে। কোনও প্রমাণ রাখেনি।

'আজ রাতেই অপারেশন শুরু করব আমরা,' বলল বাডি, ঘাসের ভিতর পা লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'গার্ডগুলো কোনও কম্মেরই নয়, তা না হলে কী টেরেলের লোকেরা কিচেন থেকে খাবার আর মোবাইল চুরি করতে পারত? ওদের ব্যবস্থা করতে দু'মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'কাজটা যদি এতই সহজ, তা হলে বিশ-বাইশজন লোক যোগাড় করার কী দরকার ছিল?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান।

'তোমাকে আগেই বলা হয়েছে কেন ওদেরকে আনা হয়েছে,' বলল বাডি। 'প্ল্যানটেশন থেকে লেবাররা ছুটে এলে তাদের সামলাবে ওরা। বাড়ির ভেতর ঢুকে আমরা দুজনই যদি কাজ সারতে পারি, ওদের সাহায্য নেব না।'

'বাড়ির ভেতর ঢুকে কী করব আমরা?' জানতে চাইল ফ্রিম্যান। 'ওদের সবাইকে খুন করব?'

'সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর,' বলল বাডি। 'তবে অপারেশনটা হতে হবে পরিষ্কার। ভুলভাল করলে এটাই হবে আমাদের শেষ কাজ।'

একটানা ষোলো ঘণ্টা ঘুমিয়ে সন্ধের দিকে জাগল অলিভা। বিছানার উপর ঝট করে উঠে বসল, সন্ত্রস্ত বোধ করছে, প্রথম কয়েক সেকেন্ড মনে করতে পারল না এত দামি সব ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ঘরে কীভাবে এল ও।

তারপর স্মরণ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত চিন্তা-চেতনা দখল করে নিল দায়ান। বড়সড়, আরামপ্রদ বিছানায় আবার শুলো ও, চোখ বুজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অলিভা জানে, দায়ানের জন্য যা কিছু করবার ছিল সবই করা হয়েছে। রডরিক ফেদেরার মধ্যে একজন আদর্শবান মানুষকে আবিষ্কার করেছে ও—কোনও পরমানুষ নিঃস্বার্থভাবে এভাবে কারও উপকার করতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। 'জানি না ওঁদের এই ঋণ কীভাবে শোধ করব,' বিড়বিড় করছে। 'টিসা ফিনলেও আমাকে কম ঋণী করছেন না।'

সবচেয়ে বড় সুখবর, দায়ানের বিপদ কেটে গেছে। তবে এখনও খুব দুর্বল। আশা করা যায় ওর উপস্থিতি আরও দ্রুত সুস্থ করে তুলবে তাকে।

পেশি ঢিল করে দিয়ে শুয়ে আছে, তারপরেও অস্বস্তিকর একটা ভয় ঘিরে রেখেছে ওকে। বিপদের আশঙ্কাটা মন থেকে কোনওমতে তাড়ানো যাচ্ছে না।

কিন্তু কোথায়, কীসের ভয়? নিজেকে অভয় দেওয়া চেষ্টা করল অলিভা। টোবি ব্রাদারদের সুপার-হিউম্যান মনে করবার কোনও কারণ নেই।

ওদের কথা মনে পড়তেই অস্থির হয়ে উঠল অলিভা। বিছানা ছেড়ে অন্ধকার মেঝেতে পা রাখল, টিসার দেওয়া একটা শাল জড়াল গায়ে, তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল কাঁচ লাগানো জানালার সামনে। পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল।

এটা তিনতলার একটা কামরা। এতটা উঁচু থেকে বাড়ির সামনেটা অনেক দূর দেখা যায়, লম্বা ঘাসে ঢাকা। তারপর বিরাট জায়গা জুড়ে কমলার বাগান। গোধূলির ম্লান আলোয় সোনালি ফলগুলো দেখা যাচ্ছে।

জানালার সরাসরি নীচে চওড়া টেরেস, একজন গার্ডকে সেখানে পায়চারি করতে দেখছে অলিভা, বগলের তলায়

রাইফেল। টেরেস থেকে নামার ধাপ আছে। ধাপের পর বেড়া দিয়ে ঘেরা বড়সড় লন, বেড়ার ওপারে ঘাস।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে শিউরে উঠল অলিভা। অন্ধকারে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল টিসা। 'ও, তোমার ঘুম ভেঙেছে?' ওকে জানালার সামনে দেখে বলল। 'আলো জ্বালব, নাকি অন্ধকারই ভাল লাগছে?'

'প্লিজ, জ্বালবেন না,' বলল অলিভা, চোখ দুটো এখনও কী যেন খুঁজছে বাইরে।

'কোনও কারণে ভয় পাচ্ছ তুমি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল টিসা, হেঁটে ওর পাশে চলে এল ।

'বাইরে ভয়ানক একটা বিপদ ওত পেতে আছে,' ফিসফিস করল অলিভা, এখনও স্ট্যাচুর মত অটল।

'ফেদেরাকে ডাকব?' জিজ্ঞেস করল টিসা, হঠাৎ করে সচকিত হয়ে উঠেছে। 'ওকে বলব বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে আসুক...' অলিভা ওর হাত চেপে ধরতে থেমে গেল।

'দেখুন!' বলে উঠল অলিভা, একটু একটু কাঁপছে। 'দেখতে পাননি? ওই যে, ওই গাছগুলোর পাশে।'

অন্ধকারে চোখ জ্বালবার চেষ্টা করছে টিসা। কিছুই নড়তে দেখছে না ও, কিছু শুনতেও পাচ্ছে না। এমনকী বাতাস পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে। 'কই, আমি তো কিছু দেখছি না। তুমি বরং নীচে চলো,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও। 'তোমার ভাল লাগবে।'

'ওখানে ওরা লুকিয়ে আছে... টোবিরা...আমি জানি ওরা ওখানে ওত পেতে আছে!' কাঁপছে অলিভার কণ্ঠস্বর।

'রা...ফেদেরাকে বলছি আমি,' যতটা পারা যায় শান্ত সুরে বলল টিসা। 'তুমি কাপড় পরো, অলিভা। আমার ড্রেসগুলো নিয়ে এসে রেখেছি, যেটা খুশি পছন্দ করো। তাড়াতাড়ি, কেমন?' দরজা খুলে করিডরে বেরুল টিসা, হন হন করে হেঁটে সিঁড়ির

মাথায় পৌঁছাল। 'ফেদেরা!' গলা চড়িয়ে ডাকল ও।

দোতলার একটা কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছাল রানা, মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল, টিসাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডাকছ?'

'হ্যাঁ। অলিভা বলছে টোবিরা এসেছে,' টিসার গলা একটু কেঁপে গেল।

প্রতিবার দুটো করে ধাপ টপকে তিনতলায় উঠে এল রানা। 'এ-কথা কেন ওর মনে হলো?'

'বলছে ওদেরকে দেখেছে। জানি না সত্যি দেখেছে কি না। আমি তো কিছু দেখলাম না...তবে খুব ভয় পেয়েছে ও।'

'তুমি ওর সঙ্গে থাকো...'

বাধা দিল টিসা, 'রানা, আরেকটা কথা। তোমাকে কথাটা বলা হয়নি...'

'কী কথা?'

'গার্ডদের জন্যে একটা বিশেষ খাবার তৈরি করার জন্যে নীচের কিচেনে গিয়েছিলাম আমি,' বলল টিসা। 'হাতে মোবাইল ফোনটা ছিল, টেবিলে রেখে কাজ করছিলাম—একটু পর দেখি ওখানে ওটা নেই।'

'কী বলছ? কে ঢুকেছিল কিচেনে তখন?'

'ওটাই তো রহস্য। তিনজন গার্ডই বলছে, ওরা কেউ কিচেনে ঢোকেনি।'

'তোমার হয়তো মনে নেই, হতে পারে, অন্য কোথাও রেখেছ,' বলল রানা।

'ওরা আরেকটা কথা বলছে, কিচেন থেকে ওদের কিছু খাবারও নাকি চুরি গেছে...'

'সুসান ছাড়া আর কেউ...'

কথা না বলে দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টিসা। তারপর বলল, 'আমি অলিভার সন্দেহটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি, রানা।'

'ঠিক আছে, গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি আমি। তুমি ওকে দোতলার সিটিং রুমে নিয়ে এসো,' কথাগুলো দ্রুত বলে লেফটেন্যান্ট শন মিচেলের সঙ্গে কথা বলবার জন্য একতলায় নেমে যাচ্ছে রানা। ভাবছে, আমারটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, টিসারটা গেছে হারিয়ে—লক্ষণ সুবিধের নয়।

গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে বাডি আর ফ্রিম্যান প্রকাণ্ড একজোড়া কালো বাদুড়ের মত। ওদের পা থেকে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না।

মিচেলকে নীচতলার কিচেনে পেল রানা।

এইমাত্র সাপার শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে, মুখে তৃপ্তির ছাপ, গল্প করছে বাড়ির মেইড সুসানার সঙ্গে।

মিচেলের সঙ্গে গল্প করতে গিয়েই সাপার বানাতে আজ দেরি করে ফেলছে সুসানা, তবে এই মুহূর্তে হাত চালিয়ে দ্রুত কাজ করছে সে।

দরজা খুলে কিচেনে রানাকে ঢুকতে দেখে অবাক হলো মিচেল। চেয়ারে নড়েচড়ে, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল। 'আমাকে আপানার দরকার, মিস্টার ফেদেরা?' সিধে হয়ে বসাটা সম্মান দেখানোর জন্য যথেষ্ট মনে না হওয়ায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, মাথাটা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখাল। ওর পিছু নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল মিচেল। 'তোমার সঙ্গীরা যে যার পজিশনে ঠিকমত ডিউটি দিচ্ছে তো?'

'শিয়োর,' জবাব দিল মিচেল। 'কেন, স্যর, কিছু হয়েছে?'

'কিছু হবে বলে সন্দেহ করছি,' বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে চারদিকটা একবার ঘুরে দেখব। এসো।'

'একটু পর যাই, স্যর, এই আধঘণ্টা পর?'

রানা ধরে নিল, শুনতে ভুল করছে ও। 'কী বললে?'

'আমি এইমাত্র সাপার খেয়েছি, স্যর। তা ছাড়া, কাকে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন? টোবিরা আছে নাকি? ওগুলো কাল্পনিক চরিত্র, স্যর। ছেলে ভুলানো কাহিনি।'

'মিচেল, এখানকার ডিউটি তুমি সিরিয়াসলি না নিলে আমি তোমাকে থানায় ফেরত পাঠিয়ে দেব,' বলল রানা, হঠাৎ করে রেগে গেছে।

চেহারা লাল হয়ে উঠল মিচেলের। 'একটা কথা, স্যর, আপনি একজন সাংবাদিক হয়ে আমাকে এভাবে অর্ডার করতে পারেন না,' অভিমানের সুরে বলল। 'আমি শেরিফের সঙ্গে কথা বলছি।' রানাকে পাশ কাটিয়ে করিডরের দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনের দিকে এগোল।

অপেক্ষা করছে রানা, থানা থেকে কী বলা হয় ওরও শোনার খুব আগ্রহ। নঈম মাহমুদের মেসেজটাকে এফবিআই কি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল? ওদের স্যাটেলাইট থেকে মনিটর করেছে শেরিফের ভাড়া করা কপ্টার দুটোর গতিবিধি?

ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে মিচেল ইতস্তত করছে, বোকা বোকা লাগছে ওকে। তারপর ক্রেডলে ওটা রেখে দিয়ে বলল, 'টেলিফোন ডেড, স্যর। বলুন, টোবিরা লাইন কেটে দিয়েছে!'

'অসম্ভব নয়,' বলল রানা, অকস্মাৎ প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল স্নায়ুতে। চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এল পিস্তলটা। 'নীচের কিচেন থেকে মিসেস টিসার মোবাইল ফোন আর কিছু খাবার চুরি গেছে, জানো তো?'

মাথা চুলকাল মিচেল। 'ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরি...'

'মিসেস টিসা এইমাত্র লনের কাছে দুজন লোককে দেখেছেন,' বলল রানা। 'খুব ভয় পেয়েছেন তিনি। হতে পারে ওরা টোবি ব্রাদার্স নয়, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখতে হবে কারা

ওরা। এসো, আমাকে তুমি কাভার দেবে।'

'কথাটা আগে বলবেন তো, স্যর,' সুর নরম করে বলল মিচেল। 'আশপাশে কেউ ঘুর ঘুর করলে আমি তাকে এখনই ভাগিয়ে দিচ্ছি।' একমুহূর্ত ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল মিচেল, 'আপনার ধারণা, ফোনের তার সত্যি কাটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, মিচেলকে পিছনে নিয়ে টেরেসে বেরিয়ে এল।

নিঃসঙ্গ গার্ড, বেনসন, মেঝেতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে, হাতের ভাঁজে রাইফেলটা আলগাভাবে ধরা। 'এই যে, শন!' মিচেলকে দেখে বলল ও, তাড়াতাড়ি দাঁড়াচ্ছে। 'বলতে পার, সাপারের জন্যে কখন ডাকা হবে আমাকে?'

'আগে কাজের কথা,' বলল মিচেল। 'আশপাশে কাউকে দেখেছ?'

'মানে কাল্পনিক টোবি ব্রাদারদের?' হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল বেনসন। 'আরে, ধ্যাৎ, ওরা থাকলে তো দেখব!'

'বাড়ির মিসেস বলছেন, সামনের দিকে দুজন লোককে দেখা গেছে,' বলল মিচেল। 'চোখ-কান খোলা রাখো।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে এদিকে কেউ আসেনি। মিসেস হয়তো ভুল দেখেছেন।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল মিচেল, রানার দিকে ফিরল। 'আপনি সন্তুষ্ট, স্যর ?'

'না,' বলল রানা। 'তোমার লোক তো বসে বসে ডিউটি দিচ্ছিল, তা-ও চোখে ঘুম নিয়ে। আবার বলছি, বাইরে দুজন লোককে দেখা গেছে।' বেনসনের বুকে টোকা মারল ও। 'চোখ খোলা রাখো, বুঝলে, ডাইনামাইট নিয়ে খেলছ তুমি! এখনই সতর্ক না হলে মারা পড়বে।'

'মিস্টার ফেদেরার ধারণা,' ব্যাখ্যা করল মিচেল, 'আজ রাতে কিছু একটা হবে।'

সেই মুহূর্তে বাড়ির পিছনদিকে সত্যিই কিছু একটা হচ্ছে।

ছাব্বিশ

টোবি ব্রাদাররা পিছনের টেরেসের কাছাকাছি চলে এসেছে। বাডির হাতে লম্বা, সরু স্টিলের একটা রড, ওটার মাথায় আলগা খানিকটা পিয়ানোর তার—লূপের আকৃতি নিয়ে ঝুলছে।

তরুণ এক কনেস্টবল বাড়ির পিছনদিকটা পাহারা দিচ্ছে। টেরেসের রেইলিঙে বসে পা দোলাচ্ছে ও, রাইফেলটাকে নামিয়ে রেখেছে মেঝেতে, তাকিয়ে আছে বেড়ার ওপারের জঙ্গল আর লেকের দিকে। গুন গুন করছে, মাঝে-মধ্যে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে চোখ বুলাচ্ছে হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে। বিকেলের নাস্তা না পেয়ে সে-ও খুব বিরক্ত।

ফ্রিম্যানের হাতটা একবার ছুঁলো বাডি। দুজনেরই জানা আছে ঠিক কী করতে হবে। স্থির হয়ে থাকল ফ্রিম্যান, হাতে তৈরি হয়ে আছে .৪৫ পিস্তল। শিকারি বিড়ালের মত সামনে এগোল বাডি, রাবারের সোল লাগানো জুতো কোনও শব্দই করছে না ধাপের উপর। রডটা এমনভাবে ধরে আছে ও, যেন মিছিলে অংশ নেওয়া কোনও লোক একটা পতাকা উঁচু করে রেখেছে।

গার্ডের কয়েক গজের মধ্যে পৌঁছে থামল বাডি।

পিয়ানোর তার দিয়ে বানানো বৃত্তটা আরও উঁচু হলো, তারপর এতটুকু শব্দ না করে ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে। তারের প্রান্ত বাডির হাতে, সেটা সাবধানে নাড়াচাড়া করছে ও, বৃত্তটাকে এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করছে ওটা যাতে কোথাও বাধা না পেয়ে গার্ডের টুপি গলে নীচে নামে।

বৃত্তটাকে গার্ডের গলায় পরিয়েই হ্যাঁচকা টান দিল বাডি। সেই একই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে টেরেস থেকে ছোঁ দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল ফ্রিম্যান।

গার্ড কোনও শব্দ করছে না। বৃত্ত যত ছোট হচ্ছে, ওর গলার মাংস কেটে ততই ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে পিয়ানোর তার। রেইলের মাথা থেকে ভারী বস্তার মত নীচের মেঝেতে পড়ল শরীরটা, তারপরেও পা দুটো ছুঁড়ছে সে, গলায় ঢুকে যাওয়া তারের ভিতর আঙুল ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মাত্র দুই মিনিট, তারপরেই স্থির হয়ে গেল গার্ড।

তারে ঢিল দিল বাডি, গার্ডের গলা থেকে লূপটা খুলে নিল ফ্রিম্যান। সময় নষ্ট না করে স্টিলের রডের মাথায় চাপ দিল বাডি, আকারে ছোট হয়ে দু'ফুটে দাঁড়াল ওটা, তারপর ফ্রিম্যানের সঙ্গে হাত লাগিয়ে লাশটাকে টেনে আনল টেরেস থেকে অন্ধকার বাগানে।

এর আগে এই রডের সাহায্যে কিচেন থেকে কিছু খাবার আর একটা মোবাইল সেট চুরি করেছে মাইকেল টেরেলের এক লোক। পায়ের আওয়াজ পেয়ে আঁধারে মিশে গেল দুই ভাই।

এক মুহূর্ত পরেই মিচেলকে নিয়ে টেরেসে বেরিয়ে এল রানা। 'কই তোমার গার্ড? দেখছি না কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আছে কোথাও আশপাশে,' বলল মিচেল। 'আমার অনুমতি ছাড়া এই পোস্ট ছেড়ে কোথাও যাবে না ও।' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'বার্নি! ও হে, বার্নি! দূর ছাই, কোথায় গেলে তুমি?'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। কোথাও কোনও শব্দ নেই, সাড়া নেই বার্নির।

তবে বাডি আর ফ্রিম্যান নিজেদের কাজ করে চলেছে। ছায়ার ভিতর দিয়ে এরইমধ্যে বাড়ির সামনের দিকে পৌঁছে গেছে ওরা। এই মুহূর্তে এগোচ্ছে বেনসনকে লক্ষ্য করে।

আরেকটা সিগারেট ধরাবার জন্য এইমাত্র হাতের রাইফেলটা

মেঝেতে নামিয়ে রাখল বেনসন।

'বা-র্নি! এই বা-র্নি!' এবার মিচেলের নিজের কানেই বেসুরো আর ভাঙা ভাঙা লাগছে গলাটা। 'হয়তো সাপার খেতে কিচেনে গিয়ে বসে আছে,' বিড় বিড় করল ও, তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

বাডি আর ফ্রিম্যান কোনও রকমে বেনসনের লাশটাই শুধু সরাবার সময় পেল। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করবার সময় ওর রাইফেল আর হ্যাট যেখানে পড়েছে সেখানেই রয়ে গেল।

'এবার বেনসনও কেটে পড়েছে,' সিগারেটের আগুন দেখতে না পেয়ে বলল রানা। তারপর গলা চড়াল, 'ও হে, বেনসন, কোথায় গেলে?'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল মিচেল। বেল্ট থেকে শক্তিশালী একটা টর্চ টেনে নিয়ে টেরেসের সামনের দিকে আলো ফেলল ও।

পরমুহূর্তে দুজনেই ওরা জমে গেল। টেরেসের মেঝেতে বেনসনের রাইফেল আর হ্যাট পড়ে রয়েছে।

'বেনসন!' মিচেলের গলায় আতঙ্ক।

'আলোটা নেভাও!' ছোঁ দিয়ে বেনসনের রাইফেলটা তুলে নিল রানা। 'চলে এসো—জলদি!'

তাগাদা দেওয়ার দরকার ছিল না, লাফ দিয়ে টেরেস থেকে করিডরে ঢুকল মিচেল। সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা বন্ধ করে বোল্ট লাগিয়ে দিল রানা।

'কী হয়েছে ওদের, স্যর?' ফিসফিস করল মিচেল, কাঁপ ধরে গেছে ওর শরীরে।

'কাল্পনিক টোবিরা নিয়ে গেছে,' সংক্ষেপে বলল রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে কিচেনে গিয়ে ঢুকল। ভিতরে সুসান ছাড়া কেউ নেই। 'এই-যে সুসান, সব কাজ পড়ে থাক, দৌড়ে তিনতলায় উঠে যাও তুমি। মিসেস টিসাকে বলো আমি পাঠিয়েছি তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্যে।'

কাজ ফেলে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল আতঙ্কিত সুসান।

কিচেনের পিছনের দরজা বন্ধ করে বোল্ট লাগাল রানা, তারপর ফিরে এল হলে। 'এখান থেকে নড়বে না,' মিচেলকে নির্দেশ দিল। 'ডিফেন্সের প্রথম লাইন তুমি। সাবধান, তোমাকে যেন ওরা কাবু করতে না পারে।' ভীত-সন্ত্রস্ত মিচেলকে ওখানে রেখে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল।

দোতলায়, সিঁড়ির মাথায় দেখা হলো টিসার সঙ্গে। রানার চেহারা দেখে ওর একটা বাহু খামচে ধরল ও। 'কী হয়েছে, রানা?'

'অলিভা ভুল দেখেনি,' গলা খাদে নামিয়ে বলল রানা। 'আমাদের দুজন গার্ডকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। তোমাদের গান র‍্যাকে পুরানো একটা টমি গান দেখেছি, ওটা আমার চাই। প্রচুর অ্যামিউনিশনও দরকার হবে।'

'আছে,' ফিসফিস করল টিসা। 'তুমি, আমি, দুজন গার্ড, মিচেল—আমরা পাঁচজন লড়তে পারব...'

'তোমার গার্ড দুজনকে এই হিসেবে ধোরো না,' বলল রানা। 'ওরা দুজন তিনতলায়, দায়ান আর অলিভার কামরায় থাকবে। ওদের সঙ্গে থাকবে সুসান আর নার্স কার্লাও।' একটু থেমে বলল, 'ওরা ফোন লাইন কেটে দিয়েছে। তোমার মোবাইলটাও চুরি করে নিয়ে গেছে। আর আমারটা তো আগেই...'

মনে পড়তে ট্রাউজারের অক্ষত পকেটটায় হাত ভরল রানা। ছোট্ট একটা ডিভাইস বের করে দেখাল টিসাকে। 'এই ব্লিপার অন করলে রানা এজেন্সির মডেস্টো শাখা বুঝে নেবে আমি বিপদে পড়েছি। আশপাশের সব এজেন্সিকে রিপোর্ট করবে ওরা। যত দ্রুত সম্ভব এখানে পৌঁছে যাবে অপারেটররা।'

'তার কি কোনও দরকার আছে?'

'না, এখনই তার দরকার নেই,' বলল রানা। 'তবে ওদেরকে অ্যালার্ট করে দিই, তৈরি হয়ে থাকুক।' বোতাম টিপে ডিভাইসটা

অ্যাকটিভেট করল ও।

কিন্তু যে লাল আলোটা মিটমিট করার কথা সেটা জ্বললই না।

'কী ব্যাপার?' ম্লান মুখে জিজ্ঞেস করল টিসা।

'কাজ করছে না,' ডিভাইসটা বারকয়েক ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'সরি।' চোখ-মুখ থমথম করছে ওর, 'যা করার করতে হবে আমাদেরকেই।' অন করা ডিভাইসটা পকেটে রেখে দিল।

'আমি যাই, প্ল্যানটেশনে খবর দিই,' চাপা গলায় বলল টিসা। 'গার্ড আর লেবার মিলে দুশো লোক ওরা...'

'এখন আর তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না,' বলল রানা। 'কারণটা হলো, ওদের স্ট্র্যাটেজিই বলে দিচ্ছে গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছে ওরা, কাউকে বেরুতে দেখলেই খুন করবে, নয়তো জিম্মি করবে।'

মাথা নাড়ল টিসা। 'তোমার নৌকাটা লেক থেকে তুলতে পারব আমি, ওরা টেরও পাবে না...'

'না, টিসা, একা তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না,' বলল রানা। 'অলিভার কাছে থাকা দরকার তোমার। কোথায় ও?'

'দায়ানের কাছে,' বলল টিসা।

'ঠিক আছে। আমরাও সবাই দায়ানের কাছাকাছিই থাকব। ওকেই চায় ওরা, তারপর চায় অলিভা আর আমাকে—কারণ আমরা তিনজনই ওদের খুনের সাক্ষী। বাড়িতে ঢুকতে পারলে দায়ানের কামরাকেই টার্গেট করবে ওরা সবার আগে।'

'আপনি এখানে আমাকে একা ফেলে রাখবেন, স্যর?' সিঁড়ির গোড়া থেকে নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল মিচেল।

'থাকো না, সমস্যা কী!' বলল রানা। 'টোবি ভাই তো স্রেফ ছেলে ভুলানো গল্প। কাল্পনিক চরিত্র কী ক্ষতি করবে তোমার? ওখান থেকে এক পা-ও নড়বে না তুমি।'

'টমি গান,' ফিসফিস করে বলল টিসা, রানার হাত ধরে দোতলার একটা কামরার ভিতর নিয়ে এল।

পাঁচ-সাত মিনিট পর তিনতলায় উঠে এসে দায়ানের ঘরে ঢুকল ওরা দুজন, রানার হাতে টমি গান, কোমরে জড়ানো এক্সট্রা ক্লিপ। ক্লিপ ভরা বাক্সটা করিডরের একধারে রেখে এসেছে ও। টিসার হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল।

টিসার একটা লিনেনের ড্রেস পরেছে অলিভা, দারুণ মানিয়েছে ওকে, বিছানার কিনারায় বসে দায়ানের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। জানালার কাছাকাছি বসে উল বুনছে নার্স কার্লা, হেডড্রেসের বাইরে ক'গাছি কাঁচা-পাকা চুল বেরিয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে ওর হাতের কাজ দেখছে সুসানা।

গার্ড দুজন আরেক জানালার দু'পাশে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে রাইফেল।

'কি হে, দায়ান,' বলল রানা। 'বান্ধবীকে পেয়ে খুশি তো?'

ম্লান একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল দায়ান।

'যে কারণেই হোক, বুলেটটা বেশি ভেতরে ঢোকেনি, তাই খুব সহজে বের করা গেছে,' বলল রানা। 'তুমি আসলে মারা যাচ্ছিলে রক্তক্ষরণে। এখন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'প্লিজ, স্যর,' জানালার কাছ থেকে বলল নার্স। 'আমার পেশেন্টকে বেশি কথা বলাবেন না। খুব দুর্বল ও।'

'আচ্ছা, বেশ,' বলে অলিভার উদ্দেশে ইঙ্গিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওর পিছু নিয়ে করিডরে চলে এল অলিভা।

'শোনো, অলিভা,' বলল রানা। 'তুমি ভুল দেখোনি। টোবিরা পৌঁছে গেছে। তবে ভয় পেয়ো না। কীভাবে কী করতে হবে আমি জানি। একটাই কাজ তোমার, সারাক্ষণ দায়ানের পাশে থাকা। যতই গোলাগুলি হোক, ঘর ছেড়ে কেউ তোমরা বেরুবে না। আর শুধু আমার গলা শুনলে দরজা খুলবে। ঠিক আছে?'

'জী, ঠিক আছে,' বলল অলিভা, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। হঠাৎ রানার একটা হাত ধরল, অপর হাতটা তুলে দিল ওর

কাঁধে। 'আপনি কে জানি না, আরেক জন্মে আপনি হয়তো আমার আপন ভাই ছিলেন...কিংবা সন্তান। তবে আমি এটুকু জানি যে, চোখ বন্ধ করে আপনার ওপর ভরসা রাখা যায়। আমি বিশ্বাস করি, আপনি যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন, আমার স্বপ্নের ভালবাসা অটুট থাকবে, কেউ ওটার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না—কেউ না!' রানাকে একবার আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিল ওর ছোট বোন অলিভা।

বিরাট বাড়িটা নীরব হয়ে আছে। অলিভাকে দায়ানের সঙ্গে একা থাকতে দিয়ে সবাইকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেছে টিসা। তবে দুই ঘরের মাঝখানের দরজাটা খোলা, সেদিকে নজর রাখছে গার্ড দুজন।

এক আর তিনতলার মাঝখানে, সিঁড়ির মাথায় বসে রয়েছে রানা, দুই হাঁটুর ফাঁকে টমি গানটা বসানো। হল, সিঁড়ি, ল্যান্ডিং উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। বিরাট দেয়ালঘড়িতে এগারোটা বেজে দশ মিনিট।

নীচতলার সিঁড়ির ধাপে বসে আছে মিচেল, কিন্তু অস্থির লাগায় দাঁড়িয়ে পড়ল, আড়মোড়া ভাঙছে। এত বড় হলে একা থাকতে ভয় করছে ওর।

কোনও রকম উচ্চবাচ্য না করে, এমন সুষ্ঠু-সাবলীল ভঙ্গিতে গায়েব হয়ে গেছে দুই কনেস্টবল, সত্যি কথা বলতে কী, ওর আত্মা একেবারে খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। সম্ভব নয়, অথচ ওর মন বলছে হলের যে-কোনও একটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে টৌবিরা।

ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে হাত। রাইফেলটা এত জোরে চেপে ধরেছে, পেশিগুলো টনটন করছে ব্যথায়। চোখের দৃষ্টি দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

দোতলার করিডরে রানার নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছে মিচেল। 'স্যর! ও, স্যর!' খানিক পর পর ডাকছে ওকে।

বিরক্ত রানা কোনও সাড়া দিচ্ছে না।

তালা খুলে নীচতলার সিটিং রুমে ঢুকে পড়েছে বাডি। সামান্য খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে মিচেলকে দেখতে পাচ্ছে ও, মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

প্যাসেজটা অন্ধকারে ডুবে আছে, দেয়াল ঘেঁষে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে মিচেলের দিকে এগোচ্ছে ফ্রিম্যান।

বাতাসে বিপদের গন্ধ পেল মিচেল। ওর চারপাশের পরিবেশে যেন বিষম একটা টান পড়ছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল ও, ভয়ে কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটা।

সামান্য একটু আওয়াজ হলো, ইঁদুর ছুটে গেলে এরকম শব্দ হতে পারে, শুনে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে প্যাসেজ বরাবর তাকাল মিচেল।

ফিউজ বক্সের কাছে পৌঁছেছে ফ্রিম্যান, টান দিয়ে নীচে নামানোর সময় ঘটাং করে উঠল লিভারটা।

'কে ওখানে?' প্রায় বুজে আসা গলায় বলল মিচেল, এক পা সামনে এগোল।

ঠিক তখনই গোটা বাড়ি ডুবে গেল অন্ধকারে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল রানা। 'মিচেল?' গলা চড়িয়ে ডাকল ও। 'তোমার কিছু হয়েছে?'

'কেউ একজন আমার খুব কাছে চলে এসেছে, স্যর,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল মিচেল। 'তাড়াতাড়ি নেমে আসুন...আপনি আমাকে বাঁচান...'

'তুমি নড়ো না,' বলল রানা। 'এত ভয় পাবার কিছু নেই, আমি আসছি...'

টর্চ জ্বালাটা বোকামি হয়ে যেতে পারে, ভারী টমি গানটা বাগিয়ে ধরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। কিন্তু

পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে।

অকস্মাৎ আঁৎকে ওঠার মত দম আটকানোর আওয়াজ বেরিয়ে এল কারও গলা থেকে—নিশ্চয় মিচেলেরই হবে। রানা উপলব্ধি করল, ওর আর কোনও সাহায্য দরকার নেই। কারণ তারপরেই শোনা গেল গলা টিপে খুন করবার পরিচিত শব্দ।

এখানে কী হচ্ছে টিসাকে জানাবার কথা ভাবল রানা, কিন্তু সিঁড়িটার দোতলার ল্যান্ডিং ছেড়ে নড়বার সাহস পাচ্ছে না। দায়ানকে খুন করতে হলে এই সিঁড়ির ধাপ বেয়েই উপরে উঠতে হবে টোবিদের, কাজেই মুহূর্তের জন্যও এই জায়গা ছেড়ে কোথাও ওর যাওয়া চলে না।

নীচতলায়, সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছাল বাডি আর ফ্রিম্যান। রাইফেলের বাঁট দিয়ে কাঠের ধাপে সামান্য আওয়াজ করল একজন।

সিঁড়ির মাথা থেকে, রেইলিঙে ব্যারেল ঠেকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নীচের অন্ধকারে এক পশলা গুলি করল রানা।

ওরা দুজনও নীচ থেকে পাল্টা গুলি করল। গুলি আর পাল্টা গুলি, গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেমে থেমে চলল কিছুক্ষণ।

'ওরে বাপরে!' অবশেষে টান দিয়ে ফ্রিম্যানকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে বলল বাডি। 'সাবেক সোলযারদের গান র‍্যাক ব্যবহার করছে সাংবাদিক ফেদেরা। আমি হলপ করে বলতে পারি, একটা টমি গান থেকে ব্রাশ ফায়ার করা হচ্ছে।'

'এখন উপায়?' জানতে চাইল ফ্রিম্যান। 'ওপরে উঠব কীভাবে?'

'আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও,' নরম সুরে বিড়বিড় করল বাডি। দশ সেকেন্ড সময় নিল ও। 'পেয়েছি।'

'কী?'

'ওই পজিশন থেকে ফেদেরাকে সরানো যাবে না। টেরেল বাহিনীর সাহায্য নেব আমরা। ওদের আটজন বাদে আর সবাই

আসবাবপত্রের আড়াল থেকে গুলি করে ব্যস্ত রাখবে ফেদেরাকে, ঠিক আছে?'

'গুড। তারপর?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিম্যান। 'চোদ্দোজন থাকছে এখানে, বাকি আটজনের কী কাজ?

'আমার সঙ্গে থাকবে চারজন, আর তোমার সঙ্গে থাকবে চারজন,' বলল বাডি। 'আমার দল নিয়ে পানির পাইপ বেয়ে ছাদে চলে যাব আমি, ছাদের দরজা ভেঙে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামব ফেদেরাকে শেষ করার জন্যে।'

'ভেরি গুড।'

'তুমিও তোমার চারজনকে নিয়ে পশ্চিম পাশের ওয়েইস্ট-ওয়াটার পাইপ বেয়ে তিনতলা পর্যন্ত উঠবে, তারপর জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দায়ানকে শেষ করবে। কোনও প্রশ্ন আছে?'

'প্রশ্ন করে কী লাভ, তারচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলি চলো,' বলল ফ্রিম্যান। 'তবে এটাই কিন্তু আমার শেষ কাজ, বাডি।'

বাডি কিছু বলল না।

সাতাশ

পাঁচজন রাইফেলধারী আর আটজন পিস্তলধারী নীচতলার আসবাবপত্রের আড়াল থেকে অনবরত গুলি করছে, চেষ্টা করছে ধাপ বেয়ে উপরে উঠে আসবার, একা ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। কারণ, উল্টানো টেবিল, মিটসেফ, আলমারি ইত্যাদি ঠেলে জায়গা বদল করছে ওরা।

অনেকক্ষণ ধরেই আশা করছে ও, তিনতলা থেকে নেমে এসে ওকে সাহায্য করবে টিসা, কিন্তু ওদিক থেকে ওদের কারও সাড়া-শব্দই পাচ্ছে না।

অগত্যা টিসার নাম ধরে বার কয়েক ডাকল রানা। কিন্তু তারপরেও কোনও সাড়া নেই।

সিঁড়ির নীচ থেকে খুনিরা এখন থেমে থেমে গুলি করছে। রানাও ওর টমি গানের অ্যামিউনিশন খুব একটা অপব্যয় করছে না। দু'তিনজন একসঙ্গে উপরে ওঠার চেষ্টা করলে ব্রাশ-ফায়ার করে ফেলে দিচ্ছে সিঁড়ির গোড়ায়।

সন্দেহ জাগল রানার মনে: ওকে এখানে ব্যস্ত রেখে টোবিরা অন্য কোনও দিক থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে না তো?

'টিসা!' আবার ডাকল রানা। এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনতলায় ওঠার সিঁড়িতে আওয়াজ হলো। 'কখন থেকে ডাকছি, আসতে এত দেরি করলে কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'তোমাদের ওখানে সব ঠিকঠাক আছে তো?'

টিসা সাড়া দিচ্ছে না দেখে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল উপর দিকে। তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি ফাঁকা দেখল ও, কেউ নেই ওখানে।

কেউ না থাকলেও, কিছু আছে। রানা দেখল কার্পেট বিছানো ধাপ বেয়ে, ঢপ ঢপ শব্দে ড্রপ খেয়ে ওর দিকে নেমে আসছে কালো একটা বল। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল রানা, তবে উল্টোদিকে নয়।

তিনতলায়, সিঁড়ির মাথায়, বাডিকে দেখতে পেয়েছে ও। ছোঁ দিয়ে তুলে সেদিকেই ছুঁড়ে দিল গ্রেনেডটা।

অপ্রত্যাশিত বলেই, খপ্ করে সেটা লুফে নিল বাডি, তা না হলে ওর বুকের ঠিক মাঝখানে আঘাত করত। যেই লুফেছে, অমনি ফাটল বোমাটা—চোখের নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বাডি, টোবি ব্রাদারদের একজন।

টর্চ নিভে যেতে আবার অন্ধকার হয়ে গেল দোতলার সিঁড়ি আর করিডর।

বাড়ির পিছনে মজা দেখতে জড়ো হওয়া বাকি চারজনের কারও অবস্থাই ওর চেয়ে ভাল নয়। শ্র্যাপনেলের আঘাতে একই সঙ্গে মারা পড়েছে টেরেলের তিন স্যাঙাৎ, বাকিজন অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে কাঠের মেঝেতে।

এই সময় রাইফেল গর্জে ওঠার আওয়াজ পেল রানা তেতলায়। তারপর শুনতে পেল অলিভার আর্তনাদ।

কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়বার উপায় নেই রানার, কারণ টমি গান নীরব থাকলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসবে প্রতিপক্ষ।

নিজের টিম নিয়ে দুটো পাইপ বেয়ে উপরে উঠছে ফ্রিম্যান। তিনতলার বিশেষ একটা কামরার দুটো জানালার কাছে পৌঁছাল ওরা। কাউকে টার্গেট করার ঝামেলায় গেল না, প্রথমে অন্ধকার ঘরের ভিতর এলোপাতাড়ি গুলি করল কিছুক্ষণ, কে মরল কে বাঁচল দেখবার দরকার নেই।

একজন গার্ড মারা গেল প্রথম গুলিতেই, আহত হলো নার্স কার্লা, অপর গার্ড ও সুসানা।

দায়ান ও অলিভা রয়েছে পাশের ঘরে। গুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিসার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিৎকার করে উঠেছে অলিভা।

কামরার বাইরে করিডরে রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে টিসা, জানালা দিয়ে গুলি শুরু হতে দরজার পাশে আড়াল নিয়ে, জানালার দিকে পাল্টা ফায়ার করল ও।

টিমের লিডার হওয়া সত্ত্বেও ফ্রিম্যান প্রথমে জানালা গলে ভিতরে ঢোকাচ্ছে অন্যদের, সবার শেষে নিজে ঢুকবে। তাদের দুজনের খুলি উড়িয়ে দিল টিসা, তৃতীয় লোকটা জানলার গোবরাট থেকে খসে নীচে পড়ে গেল।

কিন্তু চতুর্থ লোকটা টিসার মাজল ফ্ল্যাশ দেখে মাত্র এক গুলিতেই কাজ সেরে ফেলল—বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল টিসা, মেঝেতে মাথাটা ঠুকে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

তাড়াহুড়ো করে গুলি করতে গিয়ে কাঁধের হাড়ে রাইফেলের কুঁদোর বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল নীচে। আর কোনও গুলি হচ্ছে না। ঘরের ভিতর কেউ নড়ছেও না, শুধু আহত তিনজনের নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আর হালকা গোঙানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভাঙা জানালা গলে ভিতরে ঢুকল ফ্রিম্যান। টর্চ জ্বেলে লাশগুলো দেখল ও। এখানে দায়ানও নেই, অলিভাও নেই। অতএব, এখানে ওর কোনও কাজও নেই।

পাশের ঘরে আলো ফেলেই বিজয়ীর হাসি ফুটল ফ্রিম্যানের ঠোঁটে। লম্বা একটা সোফায় বসে রয়েছে অলিভা, ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে দায়ান। টর্চের আলো পড়তেই চমকে দরজার দিকে তাকাল অলিভা, তারপর দায়ানের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে অমানুষিক শক্তি খাটিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল সোফাটা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল শত্রুর মোকাবিলা করবে বলে।

ফ্রিম্যানের হাসি গিয়ে ঠেকল এ-কান ও-কান। ঘরে ঢুকে ওদের দিকে এগোল ফ্রিম্যান। এক সেকেন্ডের জন্য নেভাল টর্চ। অলিভা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে ফেলে দিল ওকে মেঝেতে। তারপর টর্চটা মেঝেতে রেখে কোমরের বেল্টে আটকানো খাপ থেকে ওর প্রিয় ছোরাটা টেনে বের করল। চট্ করে সোফা ঘুরে দায়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দুই হাতে ছোরাটা ধরে মাথার উপর তুলল—এক্ষুনি নামিয়ে আনবে ওটা দায়ানের বুকে।

'তুমি শালা অনেক ভুগিয়েছ,' হাসছে ফ্রিম্যান। 'এইবার...'

'না!' অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠে মেঝে থেকে লাফ দিল অলিভা। সোফা ডিঙিয়ে চলে এসেছে এপাশে, দুই হাত সামনে বাড়ানো।

ফ্রিম্যান ওকে বাধা দিতে পারল না। ওর আঙুলগুলোই শুধু

লম্বা নয়, নখগুলোও যথেষ্ট লম্বা আর ধারালো। ঘ্যাঁচ করে ঢুকল দুটো নখ ফ্রিম্যানের অক্ষিকোটরের গভীরে; একেবারে নিখুঁত ভাবে বের করে আনল ওর চোখ দুটো। তারপর এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল ওকে সোফার কাছ থেকে।

টর্চের আলো কোনও কাজে আসছে না ফ্রিম্যানের। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে ও। প্রচণ্ড ব্যথায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে পিস্তল বের করে আন্দাজে গুলি করতে শুরু করল—যদি কাউকে লাগাতে পারে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে টিসা বুঝতে পারল ওর আঘাত মারাত্মক কিছু নয়, গুলিটা ওর কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। উঠে বসল ও, টর্চের আলোয় আগেই দেখে নিয়েছে ঘরের পরিস্থিতি।

দায়ানকে সোফা থেকে তুলে একপাশে সরিয়ে নিচ্ছে অলিভা। ওকে সাহায্য করার আগে ফ্রিম্যানের পিস্তল ধরা হাতটা অকেজো করে দিল টিসা এক গুলিতে।

ছিটকে চলে গেল পিস্তল ঘরের এক কোণে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে পালাবার পথ খুঁজছে ফ্রিম্যান। একটা দরজা পেল, হাতল ঘুরিয়ে কবাট খুলে বেরিয়ে গেল করিডরে।

সিঁড়ির দিকে হাঁটছে ফ্রিম্যান। ওর দু'চোখ থেকে রক্ত ঝরছে, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে টলতে টলতে এগোচ্ছে, মুখে অশ্রাব্য গালি: 'বাডি, বেজন্মা কুত্তা, কোথায় গেলি তুই? দেখ, হারামজাদী আমার কী অবস্থা করেছে! কোথায় তুই, শালার শালা বাডি, আমি তোর চোদ্দো গুষ্টির...'

এখনও নিজের পজিশন ধরে রেখেছে রানা। টেরেল বাহিনীর তেরো সদস্যের মধ্যে বেঁচে আছে আর মাত্র পাঁচজন। তার মধ্য থেকে, শেষ চেষ্টা হিসাবে, তিনজন একসঙ্গে দৌড়ে উঠে এসে রানাকে কাবু করার চেষ্টা করতে গিয়ে টমি গানের ব্রাশ ফায়ারে পটল তুলল।

যে দুজন বেঁচে আছে, তারা সরে গেছে দূরে, থেমে থেমে গুলি করছে, সেই সঙ্গে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। ওদের একটা গুলিও রানার ধারে-কাছে আসছে না।

এই সময় কপ্টারের আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। মনে হলো একটা নয়, কয়েকটা। তবে এখনও বেশ কিছুটা দূরে। তারপর শুনল ভারী মোটরসাইকেলের ডিপডিপ, সেই সঙ্গে কয়েকটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

কী ব্যাপার পরিষ্কার নয় রানার কাছে। ওরা কি আরও লোক ডেকে এনেছে? একটু আড়াল নিয়ে তৈরি থাকল ও। এমনি সময় শুনতে পেল, কে যেন হাঁক ছাড়ছে, 'বাডি, বেজন্মা কুত্তা, আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলি তুই? দেখ, হারামজাদী...

তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। লাশগুলোকে টপকে ওর দিকে নেমে আসছে ফ্রিম্যান, খালি কোটর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। নীচের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইল রানা, ফ্রিম্যান কাছাকাছি আসতেই পিছন দিকে এক লাথি মেরে ওকে নীচে পাঠিয়ে দিল। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কেউ নেমে আসছে টের পেয়ে বাকি কাজটুকু সেরে দিল নীচের দু'জন—গুলি করে উড়িয়ে দিল ফ্রিম্যানের খুলি।

হঠাৎ মনে পড়তে পকেট হাতড়ে ছোট্ট ডিভাইসটা বের করল রানা। দেখল ওটার গায়ের খুদে লাল আলোটা জ্বলছে। কী হয়েছে বুঝতে পারল এতক্ষণে। ওটার কোনও তার আলগা হয়ে গিয়েছিল, নড়াচড়ার ফলে আপনাআপনি জোড়া লেগে নিজে থেকেই অ্যাকটিভেট হয়েছে ওটা, কারণ সুইচটা অন করা ছিল।

হোমিং ডিভাইসের সাহায্য নিয়ে চারদিক থেকে ছুটে আসতে শুরু করেছে রানা এজেন্সির অপারেটররা—কেউ কপ্টারে করে, কেউ মটরসাইকেলে, কেউ আবার গাড়ি নিয়ে।

বাড়ির চারদিক থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল একসঙ্গে বহু লোকের হইচই, চিৎকার-

চেঁচামেচি। আওয়াজ শুনে বুঝল ও, এদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে শাবল, কুড়াল, বল্লম, দা, লাঠি, বন্দুক যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তা-ই নিয়ে চলে এসেছে টিসাদের প্ল্যানটেশনের লোকজন।

গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যেতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এলাকাটা। দোতলার জানালা দিয়ে রানা দেখল, বাড়ির উঠান লোকে লোকারণ্য। সবার চেয়ে একমাথা উঁচু রানা এজেন্সির মডেস্টো শাখার প্রধান, নঈম মাহমুদকে চেনা গেল সহজেই।

রানার ডাক শুনে লাশগুলো ডিঙিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে এল নঈম মাহমুদ; রিপোর্ট করল: 'আপনি ব্লিপার অ্যাকটিভেট করার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়েছি আমরা, মাসুদ ভাই।'

'গুড,' বলল রানা। 'কজন তোমরা?'

'প্রায় একশো। সাতটা শহর থেকে আসছি,' বলল মাহমুদ। 'দুইজন ক্রিমিনাল মারা গেছে। আমাদের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। আটক করতে পারিনি কাউকেই।'

'কেউ নেই আর আটক করবার,' বলল রানা। মাহমুদের পিঠ চাপড়ে দিল রানা, 'ওয়েল ডান, নঈম। তোমরা সবাই এসে পড়ায় এদেশী পুলিশ আর এফবিআইকে বোঝানো সহজ হবে।' তারপর জানতে চাইল, 'এফবিআইকে সতর্ক করেছিলে তো?'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলল মাহমুদ, মাসুদ ভাইয়ের প্রশংসা পেয়ে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'অ্যাকশন নিতে দেরি করেনি ওরা। কী রেজাল্ট হয়েছে তা-ও আমাকে জানিয়েছে।'

'বলো।'

দীর্ঘ রিপোর্ট, সংক্ষেপে সারল মাহমুদ।

এফবিআই-এর স্যাটেলাইট থেকে নজর রাখা হচ্ছিল মডেস্টো আর মার্সেড শহরের আশপাশের এলাকায়। বাইশ নম্বর লগিং ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা কপ্টারকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে

ওরা। ওই কপ্টার থেকে দুজন লোক রেডিওর সাহায্যে মাফিয়া ডন মারকাসের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ কথা বলেছে। তাদের একজন মডেস্টোর শেরিফ ডেভিড কুপার, অপরজন গিলবার্ট নামে একজন স্নাইপার। শেরিফকে নির্দেশ দিয়েছে মারকাস: অলিভাকে খুন করতেই হবে, কোনও অবস্থাতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

ওদের কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কপ্টার থেকেও এক লোক সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার ও ডন মারকাসের সঙ্গে আলাপ করেছে। ওরা ওই লোককে নির্দেশ দিয়েছে, সাংবাদিক রডরিক ফেদেরাকে খুন করো।

দু'দিন পর। রানা এজেন্সির মডেস্টো শাখা, ডিরেক্টর মাসুদ রানার চেম্বার।

সচরাচর এরকম হতে দেখা যায় না। নিরস্ত্র অবস্থায়, কোনও দেহরক্ষী না নিয়ে, রানার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে মাফিয়া ডন মারকাস। সঙ্গে সলিসিটর হাওয়ার্ড ব্লেচার।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এসেছে ওরা। যেভাবেই হোক জেনেছে, রডরিক ফেদেরা আসলে মাসুদ রানা। পৌঁছানোর পর রানা এজেন্সির অপারেটররা সার্চ করেছে দুজনকে। কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি।

চেম্বারে ঢুকে বসবার পর, একটাও কথা না বলে, ব্রিফকেস থেকে বের করে রানার দিকে কিছু কাগজ বাড়িয়ে ধরল ব্লেচার।

'কী এ-সব?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্লেচারের বাড়ানো হাত থেকে নিল ওগুলো। চোখ বুলাচ্ছে।

প্রথমটা অলিভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার বই। আজই, মাত্র কিছুক্ষণ আগে, নগদ দুই মিলিয়ন ডলার জমা করা হয়েছে অলিভার অ্যাকাউন্টে।

দ্বিতীয়টা ওই একই অ্যাকাউন্টের চেক বই।

বাকি দুটো ট্রাস্টি বোর্ড থেকে ওদের দুজনের পদত্যাগ-পত্র।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল রানা। নিজের কদর্য চেহারা যথাসম্ভব করুণ করে ডন মারকাস বলল, 'এগুলো আপনি গ্রহণ করলে অলিভার ক্ষতি করার কোনও ক্ষমতা আমাদের আর থাকবে না। দুই মিলিয়ন ডলার সরিয়েছিলাম, পুরোটা ফিরিয়ে দিয়েছি। আমরা যেহেতু আর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নই, ওই অ্যাকাউন্ট থেকে আর কোনও টাকা তুলতে পারব না।'

কিছু না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

'আমাদের যা করার ছিল আমরা তা করেছি,' বলল মারকাস। 'এবার, মিস্টার রানা, আপনি এগুলো গ্রহণ করে আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচান।'

এই প্রথম মনে মনে একটু হাসল রানা। 'বেশ তো, গ্রহণ করছি। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বাঁচাবার কে?' বলল ও। 'আপনারা শেরিফকে কিনে নিয়েছিলেন, এখন হয়তো ডেপুটি শেরিফকেও কিনে নেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এফবিআই তো সবই জানে। এটা এখন ফেডারেল কোর্টের জালিয়াতি ও মার্ডার কেস।'

'হ্যাঁ,' বলল ব্লেচার, 'আমরা জানি, শাস্তি আমাদের হবেই। আমরা এসেছি টাকা ফেরত দিয়ে ও ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে শাস্তির মাত্রাটা কিছুটা কমাবার আশায়।'

'আর মার্ডার?'

'ওটা আমরা অনেক করেছি, মিস্টার রানা। ভবিষ্যতে আরও করব। ওই অভিযোগ থেকে বাঁচার অনেক উপায় আমাদের জানা আছে।'

'সেটা আপনাদের ব্যাপার,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। কফি দিতে বলি?'

'না। কফি খাওয়াতে চাওয়া এবং আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনিই যে রডরিক ফেদেরা, একথা আগে জানলে আমরা হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি করবার সাহস পেতাম না। আশাকরি ভবিষ্যতে দেখা হবে আবার।' এই বলে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে চেয়ার ছাড়ল মারকাস, দেখাদেখি ব্লেচারও।

আটাশ

এক হপ্তা পর।

রেডিও ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে সব কথা শুনে বিসিআই চিফ রাহাত খান রানাকে প্রশ্ন করলেন, 'ডক্টর মুনতাসির মাহতাবকে চেনো?'

'জী-না, স্যর,' বলল রানা।

'উনি এখন ক্যালিফোর্নিয়াতেই কোথাও আছেন। অলিভাকে তুমি ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

'স্যর! ভদ্রলোক...'

'নিউরো সার্জারিতে তুলনাহীন...বয়স বেশি না, কিন্তু জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যেই,' বললেন বিসিআই চিফ।

দুদিন পর।

লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা প্রাইভেট হাসপাতাল।

অলিভার ফ্ল্যাটের স্টুডিও থেকে রানার সব কটা ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে ওর ডায়েরিটা। শুধু স্যানাটোরিয়ামে আঁকা রানার ছবিটা রয়ে গেছে ওখানে। থাক

ওটা। ওই ছবিতে রানার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

অলিভার বাইশতলার ফ্ল্যাটটা লোক দিয়ে গোছগাছ করিয়ে রেখে দেখা করতে এসেছে রানা দায়ান ও অলিভার সঙ্গে ওদের ক্লিনিকে।

প্রাইভেট একটা হাসপাতালের কেবিনে বেডে শুয়ে আছে দায়ান। বেডের পাশে চেয়ারে বসে ছোট একটা ক্যানভাসে ছবি আঁকছে অলিভা। বারবার চোখ তুলে দায়ানকে দেখে নিচ্ছে ও।

রডরিক ফেদেরা ওরফে মাসুদ রানাকে নিয়ে টুকটাক আলাপ করছে ওরা গত কদিন ধরেই। দুজনেই একমত হয়েছে—আজ ভদ্রলোককে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে।

দায়ান এখন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ। গত কদিন ধরে ওর যে সেবা-শুশ্রূষা করেছে অলিভা তার বুঝি কোনও তুলনা হয় না।

এই সময় নক করে ভিতরে ঢুকল রানা। হাতের তাজা ফুলগুলো ফ্লাওয়ার ভাসে রেখে বেডের পাশে খালি চেয়ারটায় বসল, তারপর দুজনকে দেখে নিয়ে জানতে চাইল, 'সব ভাল তো?'

'জী, মাসুদ ভাই,' মাহমুদের দেখাদেখি দায়ানও ওকে এভাবে সম্বোধন করছে। 'আপনি ভাল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বলল, 'তোমাদের চোখে কীসের যেন কৌতূহল দেখতে পাচ্ছি আমি। কী ব্যাপার?'

দুজনেই হেসে ফেলল। তারপর দায়ান বলল, 'জী, মাসুদ ভাই। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে।'

অলিভা বলল, 'আপনি আমাদের দুজনের জন্যে এত কিছু করলেন ... কী কারণ, মাসুদ ভাই? আপনি আসলে কে?'

'তোমার একমাত্র ভাই লিয়ন কারমেন কিছুদিন আগে মারা গেছে, জেনেছ তুমি ইতিমধ্যেই, তা-ই না? আমি ওর বন্ধু,' বলল রানা, এক মুহূর্ত থেমে সিদ্ধান্ত নিল ঠিক কতটুকু বলবে। 'একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টের পর তুমি আসলে সব ভুলে গেছ।'

'কিন্তু শুধু ভাইয়ের বন্ধু হলে এতটা কেউ করে না,' বলল অলিভা। 'তা ছাড়া, আপনি একা শুধু আমার জন্যে নয়, দায়ানের জন্যেও নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছেন...'

'মারা যাবার আগে লিয়নকে আমি কথা দিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'তোমার ভাল-মন্দ সবকিছু দেখার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে ও। এমনকী, তোমার বিয়ের ব্যাপারটাও।'

চট করে দৃষ্টি বিনিময় করল অলিভা আর দায়ান।

'ও, আচ্ছা,' ধীরে ধীরে বলল অলিভা, 'সেজন্যেই আপনাকে আমার এতটা চেনা চেনা লাগছে।'

'তা ছাড়া, আমি তোমার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যও।'

'এই ট্রাস্টি বোর্ডটা কেন করা হয়েছিল?' জানতে চাইল দায়ান।

'করা হয়েছিল অলিভা এখনও নাবালিকা বলে,' জবাব দিল রানা। 'তা ছাড়া, সে-সময় অলিভার মধ্যে সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীনতাও দেখা দিয়েছিল। তবে বেশ কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে ওর পাগলামি সেরে গেছে বলে মনে হয়।'

হেসে উঠল দায়ান, ওর সঙ্গে অলিভাও।

'আমি তো এখন আর ওর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না,' বলল দায়ান।

'আমিও না। তবু আমি একবার খুব বড় একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাই ওকে,' বলল রানা। 'তোমাদের আপত্তি না থাকলে আজই।'

'না, আপত্তি কী!' একযোগে বলে উঠল ওরা।

নিউরো সার্জেন ডক্টর মুনতাসির মাহতাব ওই সময় লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা ক্লিনিকেই রোগী দেখছেন। ওদেরকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেই রেখেছিল রানা।

পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সিটি স্ক্যান সহ জরুরি কয়েকটা টেস্ট

করা হলো অলিভার। নিজের চেম্বারে বসে রোগিণীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন ডক্টর মুনতাসির মাহতাব।

ইতিমধ্যে টেস্ট রিপোর্টগুলো চলে এল। সেগুলো দেখলেন ডাক্তার। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওঁর মুখ। বললেন, 'অলিভার ভুল চিকিৎসা হয়েছে এতদিন। তবে ব্রেনে ছোট একটা সমস্যা সত্যিই আছে—ব্লক। মাইনর একটা অপারেশন করলেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে ও।'

'ব্রেন অপারেশন?' শুনে আঁতকে উঠল অলিভা।

অভয় দিয়ে হাসলেন ডাক্তার। 'ছোট্ট একটা অপারেশন, আধ ঘণ্টা লাগবে বড়জোর। এমনকী পুরোপুরি অজ্ঞানও করতে হবে না। দু'ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে তুমি।'

'কোনও সাইড এফেক্ট, ডাক্তার সাহেব?' জানতে চাইল রানা।

'নিকট অতীত ছাড়া বাকি সব ভুলে যাবে।'

ডাক্তার আরও বললেন, সব কিছু আবার নতুন করে শিখতে হবে অলিভাকে, কারণ সবই তো ভুলে গেছে। তবে যেহেতু সব একবার শেখা আছে, আর ব্রেনটাও খুব ভাল, নতুন করে শিখতে সময় লাগবে খুব কম—তাঁর ধারণা, আঠারো বছরের শিক্ষা ফিরে পেতে মাত্র আঠারো হপ্তা সময় লাগবে অলিভার।

আধ ঘণ্টাই লাগল। সাকসেসফুল অপারেশন।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে অলিভার কেবিনে ঢুকল দায়ান, ওর পিছু নিয়ে রানাও।

অল্প সময়ের আলাপেই পরিষ্কার হয়ে গেল, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে অলিভা।

নিউরো সার্জেন ডক্টর মুনতাসির মাহতাবের কথাই সত্যি হলো। নিকট অতীত ছাড়া আর কিছু স্মরণ করতে পারছে না অলিভা। তবে একা শুধু দায়ানকে চিনতে পারল ও। রানাকে

নয়।

রানার দিকে বার কয়েক তাকাল ও। তারপর দায়ানকে জিজ্ঞেস করল, ‘এই ভদ্রলোক কে? আমাদের কে হন?’

দায়ান বলল, ‘মাসুদ রানা, আমাদের বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী—তোমার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান।’

তারপর নিজের কথা জানতে চাইল অলিভা—কী হয়েছিল ওর, আত্মীয়-স্বজন কে কে আছে ইত্যাদি।

বাইরে এখন গোধূলি, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার মুহূর্তটিতে সবকিছু বড় বেশি ম্লান, একটু শুধু রাঙা হয়ে আছে পশ্চিম আকাশে ভেসে থাকা বিচ্ছিন্ন কিছু মেঘ।

ওদের দুজনকে নিভৃতে থাকতে দিয়ে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল রানা। রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকাল। একটা-দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। সাঁঝ নামলেই কী এক অজানা কারণে বিষণ্ন হয়ে যায় ওর মনটা। সেই বিষণ্নতা যেমন প্রাচীন, তেমনি গভীর। মানে খোঁজে জীবনের, পায় না।

বহুদূরে তাকিয়ে আছে রানা।

বিড়বিড় করে বলল, ‘কী রে, লিয়ন। খুশি হয়েছিস, দোস্ত?’

***